ভিয়েতনামে কিছুদিন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দীপায়নী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভিয়েতনামের সংগ্রামী বন্ধুদের

১

যাচ্ছি হানয়। প্লেন ছাড়বে রাত দুটোর পর।

অনেকে ভয় দেখিয়েছিল, প্রাণ নিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারবে তো? আমার ভয়, দমদম পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে পৌঁছুতে পারব তো?

ভয় পাওয়ার কারণ ছিল। কলকাতার রাস্তা তখন একটুও নিরাপদ নয়। সন্ধ্যের পর বেলেঘাটা, উল্টোডাঙার কখন কী চেহারা হবে কেউ বলতে পারে না।

তার চেয়ে হানয়ে পৌঁছুনো ঢের সহজ। বিশেষ করে, এরোফ্লোটের মস্কো-কলকাতা-হানয় রুট চালু হওয়ার পর।

আগে যেতে হত অনেক ঘুরে। শেষের ধাপটা পার হতে হত আই-সি-সি'র (ইন্টারন্যাশনাল কনট্রোল কমিশন) প্লেনে।

এরোফ্লোট এ যাবৎ তেমন কোনো বিপদের মুখে পড়ে নি। তাছাড়া সময়ও লাগে অনেক কম। কোথাও না থেমে সোজাসুজি গেলে কলকাতা থেকে হানয় পৌঁছুতে পুরো তিন ঘণ্টাও লাগে না। এ যেন মেল ট্রেনে হাওড়া থেকে আসানসোল যাওয়া। তমলুক থেকে পুব বরাবর সোজা লাইন টানলে পাওয়া যাবে হানয়। সটান উড়ে যেতে পারলে দূরত্বটা কিছুই নয়।

মাঝরাত্রে দমদম পাড়ি দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয় বলে ডনি আর তুলসীর গাড়িতে আমরা একটু আগে আগে এরোড্রামে পৌঁছে গেলাম। আমরা বলতে আমি আর বান্নেভাই। সাজ্জাদ জহির। ভারতে প্রগতি লেখক আন্দোলনের একজন প্রতিষ্ঠাতা। দেশে ফিরে যৌবনের শুরুতে ব্যারিস্টারি ছেড়ে স্বদেশীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশভাগের পর হন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক। পরে ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসীর আসামী হয়ে দীর্ঘদিন জেলে কাটিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। এখন দিল্লীর বাসিন্দা।

কলকাতা থেকে আমরা যাত্রী মাত্র দুজন। আমি আর বান্নেভাই। বিমান বন্দরে যারা সঙ্গে এসেছিল তাদের সবাইকে আমরা তাড়া দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। রাত হয়েছে। তার ওপর রাস্তা ভাল নয়। ওদের জন্যে আমাদের বেশ ভাবনা হচ্ছিল।

গীতা যাবার সময় বলল এই প্রথম আমার বিদেশ যাত্রায় ওর হিংসে হচ্ছে। তার কারণ, ভিয়েতনাম সত্যিই আমাদের সকলেরই স্বপ্নের দেশ। গীতা অনেক দেশ ঘুরেছে। ওর এখন একটাই মোহ—ভিয়েতনাম দেখার।

আমিই কি ভেবেছিলাম কোনদিন ভিয়েতনামে যেতে পারব?

এরোপ্লেন না ছাড়া পর্যন্ত যাচ্ছি বলে আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। চোখ ঘুমে এঁটে আসছে।

একে একে সেই বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ছে, কেউ একশো, কেউ পঞ্চাশ, কেউ দু-তিন টাকা দিয়ে যারা আমার ভিয়েতনাম যাওয়া সম্ভব করেছে। আমি মরে গেলেও তাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।

জানলার বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হাতের কাজগুলো সেরে আসার জন্যে পর পর কয়েকটা রাত জাগতে হয়েছে। শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে ক্লান্তিতে।

চোখ বেশিক্ষণ বন্ধ করা গেল না। দেখতে দেখতে আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। প্লেন ছেড়েছে দুটোর পর। এত তাড়াতাড়ি কী করে সকাল হয়? ঘড়ি দেখলাম। ঘড়ি চলছে। তাহলে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমরা যাচ্ছি পুবের দিকে। তাই যতই এগোচ্ছি ততই বেলা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। আগে কখনও পুবদেশে যাই নি বলে এমন যে হবে সেটা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

এত আলোর মধ্যে একেবারেই আর ঘুমোনো সম্ভব হল না। জানলা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-প্রকৃতি একেবারেই অন্য রকমের। যেদিকে তাকাই গ্রীষ্মবলয়ের ঘন সবুজ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

প্লেন আস্তে আস্তে নিচু হয়ে ভিয়েনতিয়ানে এসে থামল।

দোতলার ট্রানজিট লাউঞ্জের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্যপট দেখছিলাম। বিদেশে এসেছি বলে মনে হয় না। বিমান বন্দরের পেছন দিকে তালগাছ আর নারকোল গাছ।

সামনে শান বাঁধানো চত্বরে বিমানের পর বিমান। বেশির ভাগ সামরিক জঙ্গী বিমান। মুহুর্মুহু উড়ে উড়ে যাচ্ছে হেলিকপটার আর মোনোপ্লেন। সারা বিমানঘাঁটি জুড়ে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। বেশ বোঝা যায়, কোথাও খুব বড় রকমের কিছু ঘটছে।

ট্রানজিট লাউঞ্জে আমরা দুজন ছাড়া বাকি সবাই সোভিয়েত দেশের। ভিয়েনতিয়ান থেকে নতুন এসে যাঁরা উঠলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সুইডিশ মহিলা। লিলি। পরে তাঁর সঙ্গে হানয়ে আলাপ হয়েছিল। বাকি যাত্রীরা ছিলেন চীনা কূটনীতিক।

ভিয়েনতিয়ান থেকে তারপর এক লাফে উত্তর ভিয়েতনামের জ্য লাম এয়ার পোর্ট। প্লেন মাটি ছুঁতেই সারা শরীরে যেন শিহরণ বয়ে গেল।

সেকেলে ধরনের ছোট্ট বিমান বন্দর। আমাদের গৌহাটি কিংবা আগরতলার মত। একেবারেই কোনো চাকচিক্য নেই।

হানয়ে পৌঁছুবার এই শেষ লাফটাতে মনে মনে একটু দুর্গা দুর্গা বলতে হয়েছিল। কেন না একজন মার্কিন সাংবাদিকের লেখা বইতে পড়েছিলাম যে, মার্কিন বোমারুর দল এই আকাশ পথটাতে আই-সি-সি'র অনেক প্লেনকেও নাকি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বোধ হয় ফাঁড়া কাটাবার জন্তেই এরোপ্লেনটা খুব উঁচু দিয়ে উড়েছে।

অতিথি বলে আমরা আলাদা খাতির পেলাম। কাস্টমস্-এর বেড়ায় ঠেকতে হল না। সোজা চলে এলাম লাউঞ্জে। সেখানে একঘর লোক আমাদের অপেক্ষায়। আমাদের কন্সাল জেনারেল ডক্টর কৃষ্ণ শেলভাঙ্কর এসেছিলেন তাঁর বন্ধু সাজ্জাদ জহিরের আসবার খবর পেয়ে। এককালে ডক্টর শেলভাঙ্করের বই পড়েছিলাম। বিলেত-প্রবাসী মার্ক্সবাদী পণ্ডিত হিসেবে আমাদের ছাত্রজীবনে তাঁর খুব নামডাক ছিল। তিনি যে অনাড়ম্বর নিরভিমান মানুষ প্রথম দর্শনেই তা বুঝতে পারলাম।

বিরাট এক লেখকদল নিয়ে আসর জমিয়ে বসেছিলেন তো-হোয়াই। মাস পাঁচ-ছয় আগে দিল্লীতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের সময় তো-হোয়াইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কদিনের মধ্যেই সে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। কালো চুলে মাথায় প্রকাণ্ড টাক, মুখে সব সময় হাসি। ছুটে এসে তো-হোয়াই আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। আর এসেছিলেন কালিদাসের কাব্যের অনুবাদক নুয়েন স্যান-সান্হ্, ঔপন্যাসিক কাও হুই দিন্হ্ এবং আরও অনেকে। প্রত্যেকেই খুব সাদাসিধে। পায়ে কম দামী হয় কাবলি নয় চপ্পল। পাসপোর্ট ফেরত পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করার সময়টুকু ভরে উঠল গেলাসের পর গেলাস ভিয়েতনামী বীয়ারে আর একটার পর একটা 'থুদো' সিগারেটে।

আমাদের দুজনের জন্যে দুটো আলাদা গাড়ি। দুটোই সোভিয়েতের তৈরি। ভেতরে জায়গাবহুল 'ভল্গা'।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের শেষাশেষি। এখনও বেশ ঠাণ্ডা। আকাশে একটু মেঘলা ভাব। এরোড্রামের এলাকা পেরোবার মুখে দেখি কলাগাছ আর পেঁপেগাছ। কুলগাছ আর আমগাছ। ওদের আম মিষ্টি নয়। টক। ইংরেজিতে যার নাম ম্যাঙ্গোস্টেন।

রাস্তা মেরামত হচ্ছে। কাজ করছে বেশির ভাগ মেয়ে। প্রত্যেকের হাতে দস্তানা। মেয়েদের মাথায় খড়ের টোকা। ভারি মিষ্টি দেখতে। পুরুষদের মাথায় শোলার টুপি।

বাঁক নেবার মুখে সামনে রাস্তা পেরিয়ে একটা একতলা ইঁটের বাড়ি। ঠিক আমাদের মফস্বলের বাড়িগুলোর মত। লতাগুল্মের বেড়া।

যেতে যেতে এসে গেল হানয়ের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া হং-হা। লাল নদী। নদীর ব্রিজ। দু দুবার বোমায় ভেঙেও খাড়া রয়েছে। ব্রিজের একপাশ দিয়ে যাচ্ছে শহরতলীর লোকভর্তি ট্রেন। কারো পোশাকপরিচ্ছদ নোংরা বা ছেঁড়া নয়। কারো মুখে লেশমাত্র দুশ্চিন্তা বা বিষণ্ণতা নেই। যেতে যেতে হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ পড়ে যাওয়ায় হাতগুলো পতাকার মত নাড়তে থাকল। ব্রিজের ওপর বাঁদিকে পায়ে চলার রাস্তা। কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেছে কত যে লোক। কেউ চলেছে মালপত্র চাপানো সাইকেলে। মাঝে মাঝে দুটো একটা সাইকেল রিক্সা। সওয়ারী সামনে, চালক পেছনে। মোটর গাড়ি খুবই কম, বেশির ভাগই হয় মাল নিয়ে নয় সৈন্য নিয়ে ট্রাক কিংবা লরী। আগে ছিল, আমাদের মত ইংরেজের নয়, ফরাসীদের উপনিবেশ। ট্রাফিক তাই বাঁ ঘেঁষে নয়, ডানদিক ঘেঁষে চলে। ব্রিজ পেরিয়ে চোখে পড়ল ইস্কুল। খেলার মাঠ। আমরা এখন শহরে। দু পাশে ঘরবাড়ি। পাকা দালান। অল্পস্বল্প দোকান। দেয়ালে কতদিন যে চুনকাম হয় নি, তার ঠিক নেই। বাড়িগুলোর দৈন্যদশা। রংগুলো কালচে হয়ে এসেছে। মলিন নিরানন্দ ভাব। হঠাৎ তার ভেতর থেকে যেন চারদিক আলো করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল একদল ফুটফুটে বাচ্চা। পরনে ঝকঝকে তকতকে পোশাক। শরীরে ঝিলিক দিচ্ছে স্বাস্থ্য। চোখে না দেখলে গল্প বলে মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ এক আশ্চর্য নতুন দেশ। ঘর নয়, বাড়ি নয়—এখানকার সব চেয়ে বড় সম্পদ হল মানুষ। এখানে সত্যিকার নয়নের মণি হল শিশুর দল।

শহরের ভেতরে যেতে যেতে বড় বড় ইমারত। কিন্তু একটাও নতুন নয়। সমস্তই ফরাসীদের আমলের। খুব উঁচু বাড়ি একটাও নেই।

গাড়ি এসে থামল একটা হোটেলের সামনে। 'থং নাং' অর্থাৎ 'পুনরেকীকরণ'। শহরে বিরাট পার্ক। তারও ঐ নাম। উত্তর-দক্ষিণে দু ভাগ হওয়া দেশের প্রাণের আকূতি—এক হওয়ার। হোটেলের কোনো ঘটাপটা কিংবা বাহারচালি নেই। এখন ব্যবহারিক মূল্যের বেশি এক পয়সাও নয়।

ঘুরন্ত দরজা পেরিয়ে ডানদিকে কাউন্টার। সামনে সিঁড়ি। সিঁড়ির ঠিক পাশে লিফ্‌ট। সেকালের উঁচু উঁচু তলা। বাঁদিকে সোফা-পাতা লাউঞ্জ। এক কোণে 'বার' আর কেনাকাটার ছোট্ট দোকান। বাঁদিকে লাউঞ্জ পেরিয়ে নেমে গেলে রেস্তোরাঁ। রাত ন'টা নাগাদ রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ অবধি খোলা থাকবে 'বার'। ডিনার ফসকাবার ভয় থাকলে আগে থেকে বলে রাখলে রাত্তিরে ঘরে রেখে দেবে বিস্কুট, কলা আর পেঁপে।

দোতলায় উঠে বাঁদিকে প্রথম ঘরে বান্নেভাই। পরের ঘরটা আমার।

পর পর দুটো খাট ফেলা, টেবিল চেয়ার ওয়ার্ডরোবে জোড়া সাবেকী বিরাট ঘর। দুটো খাটের মাঝখানে দড়ির গালচে আর ছোট ছোট ড্রয়ার লাগানো ডেস্কে দুটো টেবিল-আলো। খাটের মাথার দিকে পর্দা টেনে গোটানো মশারি আড়াল করার ব্যবস্থা। দুটো গদির সোফার সামনে কাঁচ লাগানো খাটো টেবিলের ওপর ছোট আকারের চারটি পেয়ালা পিরিচ, টি-পট। রঙিন চীনে মাটির পাত্রে ঢাকা প্যাকেটে মোড়া গ্রীন টি—সবুজ চা। চিনির কিউব। 'থুদো' সিগারেটের নতুন প্যাকেট। মেঝের ওপর ঢাউস ফ্লাস্কে অষ্টপ্রহর গরম জল। ড্রয়ার-লাগানো লেখার টেবিলে টেলিফোন আর টেবিল-আলো। বাথরুমে জল গরমের ব্যবস্থা। ফরাসী বিদো। পুরনো হয়েও হালফ্যাশানের।

ঘরের মাঝখানে পুরনো বিশাল ফ্যানের তলায় আলোর বাল্‌ব লাগানো। কাঠ বসানো মেঝে। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি—বাগানে আপেল তোলার কাজে ব্যস্ত দুই রমণী।

ঢুকবার দরজার ঋজু ঋজু পেছনে উঠোনের দিকে পর্দা-ঢাকা জানলা। উঠোনের মধ্যিখানে একটা একতলা রিসেপশন হল। চারপাশে বাগান। এককোণে বিমান হানার সময়কার আশ্রয়স্থল। দুটো বড় সেগুন গাছ। পাঁচিলে রকমারি ঝুমকো লতা। টবে ফুলগাছ আর ক্যাক্টাস। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর লাগছিল।

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেড়টায় লাঞ্চের জন্যে নিচের রেস্তোরাঁয় গেলাম। বান্নেভাই ফরাসী জানেন। কাজেই খাবার বাছতে কোনো অসুবিধে হল না। চীনে ধরনের স্বাদু খাবার। সঙ্গে কলা আর কমলালেবু। এক বুড়ো বয় এসে 'নমস্তে' বলল। গত মহাযুদ্ধের সময় আসা ভারতীয় সেপাইদের কাছ থেকে 'নমস্তে' কথাটা শিখেছিল। কাছাকাছি রাস্তায় একা একা একটু হেঁটে এলাম। বাঁদিকের মোড়ে বইয়ের দোকান। এখানে একমাত্র বইয়ের দোকানই অনেক রাত অবধি খোলা থাকে। বাঁদিকে খান কয়েক বাড়ি পেরোলে 'নানদান' দৈনিক কাগজের আপিস। ডান দিকে সোজা গেলে দোকানপট্টি পেরিয়ে 'তরবারি সরোবর'। শো-কেসে জামাকাপড়, চীনেমাটির বাসনপত্র, বড় বড় ফ্লাস্ক। এখানে জ্বালানী বাঁচাবার জন্যে বড় বড় ফ্লাস্কের খুব চলন।, রাস্তায় রাস্তায় ফুটন্ত গরম জল কিনতে পাওয়া যায়। শো-কেসে স্কুলের ব্যাগ, রং-তুলি, কলম। শস্তা খাওয়ার জায়গা। বীয়ার পানশালা। ফুটপাথে চায়ের দোকান। ভুট্টা পোড়া। একটু এগোতেই ট্রাম লাইন। লম্বা টানা রাস্তায় চলে। আসল যানবাহন বলতে সাইকেল। রাস্তাগুলো যেন সাইকেলের অরণ্য।

হোটেলের সামনে দিয়ে যে বড় রাস্তা, সেটা ধরে এগোলে ডানদিকের একটা মোড়ে 'হোয়া বিন' হোটেল। আই-সি-সি'তে যে ভারতীয়েরা আছেন, তাঁদের আস্তানা।

ডানদিকে চলে গেলে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে বাঁদিকে গেটওয়ালা দোতালা বাড়ি। ডক্টর শেলভাঙ্করের বাসভবন। ছিমছাম সাদামাটা বাড়ি। তাঁর স্ত্রী মেরী খুব মিশুক মানুষ। রাস্তার ভিড়ে একা একা হেঁটে বেড়াতে আমারই মত তিনি ভালবাসেন।

ওদের রাঁধুনী ভিয়েতনামী। বেশ বয়স হয়েছে। অথচ মুখ দেখে বোঝা যায় না। তার শৈশব কেটেছে চীন রাজত্বে। তারপর ফরাসী। গোড়ায় পড়েছেন চীনে ইস্কুলে। তারপর একটু বড় হয়ে ফরাসী ইস্কুলে। এক ফরাসী সাহেবের বাড়িতে করতেন রান্নার কাজ। ফরাসীরা যখন চলে যায়, তখন সেই সাহেবের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন সিউলে। কিছুদিন পরে আবার স্বাধীন ভিয়েতনামে ফিরে আসেন। বরাবর সাহেবসুবোদের কাছে যারা কাজ করে, তাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা সাধারণত যে ধরনের হয় এঁরও অনেকটা তাই। নতুন জীবনের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা এসব লোকের পক্ষে এ বয়সে শক্ত

হয়। ফলে, ভালো দিকের চেয়ে তারা অপছন্দের দিকটা বাড়িয়ে দেখে। থাকতে হয় একটা বোমা-পড়া চারতলা বাড়িতে। বউকে রাস্তার কল থেকে জল টেনে তুলতে হয়। কষ্টের জীবন। যা মাইনে পান তা থেকে ট্যাক্স দিতে হয়। শুধু তাঁকে নয়, যারা বাড়ির কাজে লোক রাখে তাদেরও ট্যাক্স দেওয়া নিয়ম। কিন্তু এদের মুশকিল এই যে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে এরা নিজেদের একটু আলাদা করে রাখতে ভালবাসে। এক কথায়, এরা হারানো দিনের হুতুশে সম্প্রদায়ের লোক।

রাত ন'টায় বি-বি-সি'র খবরে খুব নতুন কিছু নেই। ডক্টর শেলভাস্কর আর মেরী হাঁটতে হাঁটতে এলেন হোটেল অবধি। কাল সুইডিশ দূতাবাসের যে মহিলা আমাদের সঙ্গে এক প্লেনে ভিয়েনতিয়ান থেকে এসেছিলেন, তাঁর প্রথম নাম লিলি। আলাপ হল। হাঙ্গেরির বাণিজ্যিক উপদেষ্টা সস্ত্রীক ইস্তভান হাজ। হাঙ্গেরি বিরাট পোলট্রি করে গোটা হানয়কে ডিম যোগাচ্ছে। সুইডিশরা সাহায্য করছে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে। হাঙ্গেরির আরও দুজন। তার মধ্যে একজন খবরের কাগজের খর্বকায় ফুর্তিবাজ অল্পবয়সী সংবাদদাতা। জমিয়ে আড্ডা হল। ফলে বেশ রাত হল শুতে। সিঁড়ির মুখে আলাপ হল প্রাভদা আর ইজভেস্তিয়ার দুই সাংবাদিকের সঙ্গে।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সকালে। জানলায় দাঁড়িয়ে উঠোনের দিকে চোখ পড়তেই খুব অবাক হয়ে গেলাম। হোটেলে যাঁরা কাজ করেন, সবাই লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছেন। শুধু আজ নয়। রোজ। শুধু এ শহরে নয়, সারা দেশ জুড়ে শহরে গ্রামে সর্বত্র ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই এমনিভাবে ভোরে উঠে খালি হাতে শরীরচর্চা করে। যাতে শরীরে জড়তা না আসে।

প্রথম দিন হানয় দেখে আমার মানসপটে আঁকা উত্তর ভিয়েতনামের ছবি অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি মানুষের মুখগুলো দেখেছি, আশ্চর্য রকমের হাসিখুশি আর নির্ভয়। দেখে দুঃখ হওয়ার মত আদৌ নয়।

কাল একটু বেশি রাত্তিরে দেখেছি লম্বা লম্বা ডাণ্ডা লাগানো ঝাঁটা নিয়ে বেশি বয়সের মেয়েরা বেরিয়েছে রাস্তা ঝাঁট দিতে। ছেঁড়া কাগজ, এঁটো পাতা, বাড়ির জঞ্জাল রাস্তায় কোথাও পড়ে থাকতে দেখি নি। রাস্তা পরিষ্কার বলতে গাছের ঝরা পাতা আর ধুলোবালি ঝাটানো, ব্যস।

আরও একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হলাম। এ পর্যন্ত এমন একজনও চোখে পড়ে নি যার পেটে ভু ড়ি কিংবা গায়ে চর্বি আছে। যাকে মোটা বলা যায়। তেমনি আবার একজনকেও হাড় জিরজিরে কিংবা রুগ্নকায় দেখি নি। আমি এ বলতে পারব না যে, তেমন লোক একেবারেই নেই। কিন্তু কাল কিংবা আজ তেমন একজন লোকও আমার চোখে পড়ে নি। রাস্তায় বেশির ভাগ সময় আমি ঘুরেছি একা একা পায়ে হেঁটে।

লাঞ্চের পর মেরীর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম তরবারি সরোবর আর রেশম সড়ক এলাকায়। বেরিয়েই ট্রাম রাস্তার মোড়ের ওপর ইস্কুল। ইস্কুলে তিনবেলা পালা করে ছোট মাঝারি বড়দের ক্লাস হয়।

ট্রাম রাস্তা সোজা চলে গেছে তরবারি হ্রদের পাশ দিয়ে বাজার এলাকায়। ইস্কুলের একটু তফাতে ফেরিওয়ালা মেয়েরা ফুটপাথে বসে বেচছে কুল, টকমিষ্টি লাল লাল ফল আর ভুট্টাপোড়া।

রাস্তার তুপাশে দোকান দেখতে দেখতে এগোই। দোকানগুলোর না বাহার, না চটক। কোনোটাতে সাইকেলের পার্টস। কোথাও বা লেদ বসিয়ে ছোট্ট কর্মশালা। মেয়েরাই মেশিন চালাচ্ছে। রাস্তার ওপর কাবলী বা চপ্পল ধরনের টায়ার, সিন্থেটিক কিংবা কাঠের জুতো। সাইকেলের পেছনে বাচ্চাদের বসাবার বেতের চেয়ার।

হানয়ে হ্রদ আছে অনেক। তার মধ্যে কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে এই তরবারি সরোবর। সরোবরের উত্তর প্রান্তে ট্রামের গুমটি। পুবে পশ্চিমে হ্রদের মধ্যে সুপ্রাচীন এক প্যাগোডা। কোনো এক পুরনো রাজার বানানো। প্যাগোডার সামনের চত্বরে চমৎকার হাওয়া খাওয়ার জায়গা। প্যাগোডার প্রবেশপথের একটু কোণাকুণি তু-রাস্তার মোড়ের ওপর ভিয়েতনামের যুদ্ধ এলাকার মানচিত্র আঁকা এক বিরাট হোর্ডিং। এ রকম ম্যাপ আছে শহরের প্রায় প্রত্যেকটা ভিড়বহুল জায়গায়। যখনই নতুন কিছু ঘটে, পোস্টার প্রচারকেরা গিয়ে হাতে লম্বা একটা পয়েণ্টার নিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে রাস্তার লোকদের বুঝিয়ে দেয় কোথায় কিভাবে কী ঘটছে এবং তার কী তাৎপর্য।

ফলে শহরের সবাই দস্তুরমত জানে কখন লড়াইয়ের কী গতি প্রকৃতি। এমন কি কখন কী বিপদের আশঙ্কা আছে তাও তারা জানে।

হ্রদ পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে বেরিয়েছে 'রেশম সড়ক'। পুরনো আমলে ছিল সওদা করার নামজাদা রাস্তা। এরই একাংশে শহরের বড় বাজার। সাবেকী অপ্রশস্ত রাস্তা। অনেকটা আমাদের চিৎপুরের মত। গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি দোকান। দেশী বিদেশী রকমারি বাদ্যযন্ত্র। নকল চুল। কাঠের স্যুটকেস। চিরুনি আয়না। প্ল্যাস্টিকের টুকিটাকি খেলনা। শস্তার জুতো। জামাকাপড়। ছবি। বিয়ার পানশালা। রুটির দোকান। রাস্তার জায়গায় জায়গায় দড়ি দিয়ে ঘেরা সাইকেল রাখার কুপন ব্যবস্থা। এখানে সব সাইকেলেই লাইসেন্সের নম্বর। রাস্তায় গিজ গিজ করছে লোক। একজন ফুটপাথে বসে দামী পাথর বিক্রি করছিল। পুলিশ আসতে দেখেই চম্পট দিল। লোকে পুলিশকে ঘৃণা কিংবা ভয় করে বলে মনে হল না। আসলে পুলিশটা যাচ্ছিল অন্য কোনো কাজে। মেয়েটিকে অন্য দিকে চলে যেতে দেখে ব্যাপারটা বুঝে সে একটু হাসল।

রাস্তায় যারা এইভাবে দামী পাথর বা পুরনো দামী জিনিস বেচে, তারা পুরনো দিনের অভিজাত পরিবারের মানুষ। সমাজতন্ত্র হয়ে তাদের অবস্থা পড়ে যাওয়ায় তার এইভাবে পারিবারিক লুকানো জিনিসপত্র বিদেশী দেখলে কম দামে বেচার চেষ্টা করে।

আমাকে দেখে নয়, মেরীকে দেখে রাস্তায় ভিড় জমে গেল। তার কারণ, মেরী ইংরেজ। আমাকে অবশ্য পোশাক বদলে দিলে রং ময়লা ভিয়েতনামী বলে অনায়াসে চালানো যায়। কেন না ভিয়েতনামীদের আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের অনেকখানি মিল। কেউ কেউ আছে হুবহু বাঙালীদের মত দেখতে।

দিল্লীতে তো-হোয়াইয়ের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তো-হোয়াই দুঃখ করে বলেছিলেন, 'যতদিনই লাগুক, যুদ্ধে আমরা জিতবই। আমরা তখন ভাঙা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলব। কিন্তু মার্কিনরা আমাদের যেসব পুরনো মঠ মন্দির আর স্থাপত্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, সেসব হবে আমাদের চিরদিনের লোকসান। সে ক্ষতি কোনোদিনই আর পূরণ হবে না। আর জানো, তার অনেকগুলোতেই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ।'

উত্তর ভিয়েতনামের চেয়েও এই ছাপ বেশি করে পড়েছিল দক্ষিণ আর

মধ্য ভিয়েতনামে। কেন না এইসব অঞ্চলেই ছিল হিন্দুভাবাপন্ন সেকালের চম্পা, ফুনান আর চেন লা রাজ্যের জায়গাজমি। উত্তর ভিয়েতনাম আজও বুক দিয়ে আগলে রেখেছে পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি। যেসব মঠ-মন্দিরে মার্কিনরা বোমা ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেসব সম্ভবমত সারানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আর মধ্য ভিয়েতনামে? অতীতকে মুছে ফেলতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সেখানে হাত মিলিয়েছে দেশের তিনকাল-খোয়ানো পা-চাটা দালালের দল।

ভারতের এই ছাপ পড়েছিল তিনভাবে : এক, প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগের ভেতর দিয়ে। দুই, চীনা সংস্কৃতির অন্তর্গত বৌদ্ধধর্মের অনুবর্তনের ভেতর দিয়ে। তিন, চাম সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে পরোক্ষে।

ভারতীয় সংস্কৃতির হাওয়া এদেশে প্রথম এসে লাগে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যখন সরাসরি ভারত থেকে সমুদ্রপথে বৌদ্ধধর্ম বাইরে ছড়াতে শুরু করে। তাছাড়া চীনা আধিপত্যের আমলেও ভারতীয় শ্রমণেরা সমানে এসে এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ভিয়েতনামী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ত্রয়োদশ আর চতুর্দশ শতকের পুঁথিপত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : 'হান রাজাদের আমলে উত্তর থেকে অনেক বৌদ্ধ শ্রমণ সমুদ্র-পথে আর স্থলপথে আমাদের দেশে তাঁদের ধর্ম প্রচারের জন্যে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মার জীবক, কাং সেং হুই আর মৌ-পো।' চীনা ইতিহাসেও 'হু' নামে একদল বর্বর, অর্থাৎ পশ্চিমের বাসিন্দাদের (মধ্য এশীয় অথবা ভারতীয়) উল্লেখ আছে, যাদের সমুদ্রপথে ভিয়েতনামে আসা ভারতীয় বলে অনুমান করা হয়।

ভিয়েতনামী বৌদ্ধ ভিক্ষু থং বিয়েমের জীবনীতে ভিক্ষু তান-তিয়েনের জীবনকথা থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার মধ্যে ভারতাগত একজন শ্রমণ কল্যাণরুচির নাম পাওয়া যায়।

মার জীবক ভিয়েতনামে আসেন তৃতীয় শতকে। ভিয়েতনামী বৌদ্ধ পুঁথি 'ফাপ-ভু থুক-লুক' গ্রন্থে ঐ সময়ে বা আরও আগে কাশ্মীর থেকে আসা পণ্ডিতের নামের উল্লেখ আছে। তাঁর নাম 'ক্ষুদ্র'।

দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ছিল ভিয়েতনামে বৌদ্ধধর্মের সবে সূচনাকাল। তখন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে, তার প্রায় সবটাই ভারত থেকে সরাসরিভাবে হয়েছে।

তখনও পর্যন্ত চীন থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্র আমদানি করার কথা ওঠে নি। এরপর সপ্তম থেকে দশম শতক পর্যন্ত চীনা বৌদ্ধবাদ ভিয়েতনামে প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনও ভারত থেকে বৌদ্ধ শ্রবণদের আসা বন্ধ হয়ে যায় নি। ষষ্ঠ শতকের শেষাশেষি এসেছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রবণ বিনীতরুচি। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ। যৌবনে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে তিনি পশ্চিম ভারতে যান। পরে তিনি এক চীনা গোষ্ঠীপতিকে অনুসরণ করে ভিয়েতনামে এসে হক্ ডং প্রদেশের 'ফাপ-ভান' প্যাগোডায় পাকাপাকিভাবে থেকে যান। এখানে তিনি 'ধ্যান' নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভিয়েতনামী কিছু কিছু শব্দেও নাকি ভারতীয় ছাপ থেকে গেছে। যেমন, সংস্কৃত 'হীন' আর ভিয়েতনামী 'হেন্'। 'রূপ' আর 'জাপ' (জ=Z)। 'শুচি' আর 'সাচ্ সে'। 'দ্বি' বা 'দ্বয়' আর 'বয়'। 'বুদ্ধ' আর 'বিয়েৎ' বা 'বুৎ'। 'পূর্ণ' আর 'নৌ'।

পরে যেসব চীনা ভিক্ষু বুদ্ধের পূণ্যভূমি দেখার জন্য ভারতে তীর্থযাত্রা করতেন, তাঁরা যেতেন 'জ্যও-চাউ' হয়ে। ক্যান্টন থেকে ভারতীয় উপকূলে পৌঁছুবার পক্ষে এই রাস্তাটাই ছিল সবচেয়ে সুবিধের। ভারতযাত্রী ভিক্ষু ভান্-কি, মোক্ষদেব আর খুই-সুং—এরা সবাই ছিলেন জ্যও-চাউয়ের বাসিন্দা। দ্বাদশ শতকে যে ভিয়েতনামী পর্যটক ভারতে যান, তাঁর নাম তু দাও হান্।

সকালে যখন আমরা লেখক সঙ্ঘের আপিসে গিয়েছিলাম, সেখানেও তাঁরা ভারত-ভিয়েতনামের এই বহুকালের সম্পর্কের কথা বার বার উল্লেখ করলেন। ওঁদের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, ভিয়েতনামের লড়াই শুধু আজ আর আগামীকালের জন্যেই নয়, অতীতের হারানো সূত্রগুলো ফিরে পাওয়ার জন্যেও সে লড়ছে।

একটা ছোট তিনতলা বাড়িতে লেখক সঙ্ঘের আপিস। নিচের তলায় তিনটি ঘর। ঢুকতেই বাঁদিকে আপিস ঘর। সার সার অনেকগুলো ড্রয়ার। প্রত্যেকটি ড্রয়ারের গায়ে একজন লেখকের নাম লেখা। তাঁদের অনুপস্থিতিতে সমস্ত চিঠি সেইসব ড্রয়ারে জমা পড়ে।

ভিয়েতনামের লেখকেরা দেশের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম। তাঁরা হানয়ে খুব কমই থাকেন। কেউ কোনো খামারে বা সমবায়ে, কোনো খনিতে বা কারখানায় কিংবা লড়াইয়ের জায়গায় চলে গিয়ে মাসের পর মাস কাটান।

যেখানে যখন থাকেন একটা কোনো কাজ নেন। একই জীবনের অংশীদার হয়ে চারপাশের মানুষকে তাঁরা দেখেন। এইভাবে সাক্ষাৎ জীবন থেকে জুটিয়ে নেন তাঁদের লেখার মালমশলা। তাঁদের ভরণ-পোষণের ভার নেয় লেখক সঙ্ঘ। তাঁদের স্ত্রীরাও কোথাও না কোথাও কাজ করেন। জীবন-যাত্রার মানের দিক দিয়ে লেখকে আর শ্রমিকে কোনো তফাত নেই। লেখকেরা টাকার জন্যে লেখেন না; তাঁরা লেখেন জনমানসকে মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। তাঁরা লেখেন কারো ফতোয়া মেনে নয়, প্রত্যেকের অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে।

ভিয়েতনামের লেখকেরা প্রত্যেকেই খুব সাদাসিধে। শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে নয়, ভাবভঙ্গি কথাবার্তাতেও তাঁরা সহজ সরল। অথচ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁরা অনেকেই দেশজোড়া পাঠকদের খুব প্রিয় লেখক এবং কেউ কেউ রীতিমত বিশ্ববিখ্যাত। দেখে বুঝবার জো নেই। প্রায় প্রত্যেকেই ফরাসী জানেন। কেউ কেউ তার ওপর জানেন জার্মান বা রুশ বা চীনা ভাষা। একজন বেশ কিছুটা হিন্দীও জানেন। কিন্তু তা নিয়ে কোন রকম বড়াই নেই কিংবা কথাবার্তায় বিদেশী শব্দ ব্যবহারের কোন রকম ঝোঁক নেই।

কথায় কথায় জিগ্যেস করেছিলাম লেখার মান বজায় থাকছে কিনা। ওঁদের একজন অকপটে বললেন, সব সময়ে থাকছে না। তার কারণ আমাদের অক্ষমতা নয়। আসলে ধীরেসুস্থে বসে মেঝে-ঘষে লেখার সময় নেই। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের লেখক কম। ফলে, লেখার খাঁই মেটাতে একেক জনকে দশ হাতে লিখতে হচ্ছে। কিভাবে লিখলে ভাল হয় আমরা জানি। কিন্তু অত গোছগাছ করে লেখার ফুরসত কোথায়? চারদিকে এত কিছু ঘটছে, এত রকমের সব আশ্চর্য মানুষ—এখুনি সে সব তাড়াতাড়ি লিপিবদ্ধ করতে হবে। দেশে যখন সুসময় আসবে, তখন এ থেকে আমাদের উত্তরাধিকারীরা মহৎ সাহিত্য রচনার খোরাক পাবে।

একজন বললেন, তুলনায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চলের সাহিত্যে ঢের বেশি মুন্সিয়ানা দেখা যাচ্ছে। ওদের লিখতে হচ্ছে ট্রেঞ্চে বসে, প্রাণ হাতে করে। আগুনের হল্‌কায় ওদের লেখা অনেক বেশি নিখাদ হতে পারছে।

উত্তর ভিয়েতনামী লেখকেরা যা বললেন, তার মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে ছিল

খানি বিনয়। গদ্য সম্বন্ধে বলতে পারব না, কিন্তু পরে তাঁদের কবিতা সেটা বুঝেছি।

লেখক সঙ্ঘের একতলায় একটি ঘরে আছে চেয়ারে আরাম করে বসে আড্ডা দেবার ব্যবস্থা। মাঝখানে বাঁশের এক রকমের হুঁকো। তাতে কি ভাবে জল দিয়ে, তারপর তামাক ধরিয়ে টানতে হয় হাতে হাতে পরখ করে নেওয়া গেল। পরে লেখক সঙ্ঘ থেকে এই রকমের এবং এর চেয়েও ভাল একটা হুঁকো আমি উপহার পেয়েছিলাম।

উত্তর ভিয়েতনাম লেখক সঙ্ঘ দুটি বহুলপ্রচারিত পত্রিকা বার করে। যে ঘরে পত্রিকা দুটির আপিস, তার দেয়ালে কয়েকটা গ্রুপ ফটো। তার মধ্যে চিনতে পারলাম গ্রামজীবনের কথাশিল্পী ঙুয়েন সুয়ান সান্, কবি তে-হান আর ঔপন্যাসিক তো-হোয়াইকে। সব ছবিই অনেকদিন আগে তোলা। একটিতে ফরাসী-বিরোধী সংগ্রাম পর্বে গ্রামাঞ্চলে বন্দুক হাতে তো-হোয়াই। সেই ফটোতে আর যেসব লেখক ছিলেন, তাঁরা কেউই আর বেঁচে নেই। দোতলায় যে বড় ঘরে আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল, সেটা লেখকদের সভাকক্ষ। তিনতলায় লেখক সঙ্ঘের লাইব্রেরি ঘর। তার পাশে এক চিলতে ছাদ। ছাদের একটা অংশে টবে লাগানো ফুলের গাছ। নিচে পাঁচিলের পাশে কুলগাছ, লিচুগাছ।

দুপুরে মেরীদের রাঁধুনি উপজাতি অঞ্চলের একটা প্রথার কথা বলছিলেন। কেউ মারা গেলে একটা গাছের খোলের মধ্যে ধড়টা ভরে তার মধ্যে খাবার-দাবার আর জামাকাপড় হিসেবে কাগজপত্র পুরে, শুধু মুণ্ডুটা বাইরে বার করে, এক জায়গায় খাড়া করে রাখা হয়। আস্তে আস্তে সেই মৃতদেহ পচতে গলতে থাকে। তার সামনে পুজো দেওয়া হয় আর পঙক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গেরিলা যোদ্ধারা এই জায়গাগুলোতে পালিয়ে থাকত। জাপানীরা জানতে পারলেও দুর্গন্ধের চোটে সেসব জায়গায় ঘেঁষতে পারত না।

বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের যে কমিটি, তার দপ্তরে গেলাম বিকেলে। গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে সারবাঁধা একতলা ঘর। তার একটাতে ডকুমেন্টারি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা।

মাঝখানের বড় বাড়িতে দপ্তর। কমিটির সহ-সভাপতি ভু কোয়াক

উই আমাদের অভ্যর্থনা করে ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। অভ্যর্থনাকক্ষটি সুন্দর সাজানো।

হানয়ে এসে আতিথেয়তার একটা বিশেষ রীতি চোখে পড়ছে। দুদিকে চেয়ার কিংবা সোফার সামনে নিচু ধরনের টানা টেবিল। তার ওপর সিগারেট আর দেশলাই।

চীনেমাটির পাত্রে টফি। চিনির চৌকো ডেলা। চোখ জুড়ানো চায়ের কাপ আর টি-পটে গরম সবুজ চা। এদেশে চিনি ছাড়াই চা খাওয়ার রেওয়াজ।

কমরেড উই আমাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, এদেশে যখন তোমরা সব কিছু দেখবে, তিনটে জিনিস মনে রেখো। মনে রেখো, আমাদের দেশ হো চি মিনের চিন্তাধারায় পরিচালিত। মনে রেখো, আমাদের শক্তির মূলে এদেশের সাধারণ মানুষ। আর আমাদের পেছনে আছে আন্তর্জাতিক সমর্থন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আমরা কিভাবে নিজেদের করে নিয়েছি, সেটাও তোমরা দেখবে।

কমরেড উই হেঁটে হোটেল পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

ক্রমশ একটা জিনিসে ধাতস্থ হয়ে আসছি। সেটা এদের শান্ত ধীরস্থির কথা বলার ধরন। গলা একবারও উঁচু পর্দায় ওঠে না। ক্রোধ আর ঘৃণার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। হাত-পা ছোঁড়া নেই। এক অমোঘ ইতিহাসে আস্থা যেন সবাইকে স্থিতধী করেছে।

সাপারের পর রাস্তায় বেরিয়েছিলাম একটু হাঁটতে। মোড়ে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। রক্ষীবাহিনী কুচকাওয়াজে বেরিয়েছে। তাতে রয়েছে নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি অংশের মানুষ। প্রত্যেকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত। পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যাবে। যেন এক অফুরন্ত মিছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পা ব্যথা হয়ে গেল, তখন হোটেলে ফিরে এলাম।

৩

ভোরবেলায় তরবারি হ্রদ এলাকায় একা একা অনেকখানি হেঁটে এলাম। সকাল হতে না হতেই বইতে শুরু করেছে সাইকেলের স্রোত। কাউকে দেখে মনে হল না দেহে মনে কোনো অবসাদের ভাব আছে। হাঁটছে গট গট করে, সাইকেল চালাচ্ছে ফুর্তিতে।

হ্রদের এক কোণে একটা ফুলের দোকান। যা ফুল আসে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। তাই দিনের আর কোনো সময়ে ফুলের দোকানটা চোখে পড়ে না।

হ্রদের পাশ দিয়ে দিয়ে বেড়াবার জায়গা। দেখলাম আমার বয়সী অনেকেই খোলা হাওয়ায় হাঁটছে। বাচ্চা বাচ্চা কয়েকটা ছেলে হাতে সুতো জড়িয়ে বঁড়শিতে মাছ ধরার চেষ্টা করছে।

একটু বেলা হলে ব্রেকফাস্টের পর গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শহর দেখাতে। যত যাই তত বুঝতে পারি যে, হানয় শহরকে যত ছোট বলে মনে হয়েছিল তত ছোট তো নয়। এ শহরে অনেকগুলো বড় হ্রদ। ছোট বড় প্যাগোডাও অনেক। দেশে ধর্মপ্রাণ মানুষের সংখ্যা এখনও কম নয়। পুজো দিতে প্রার্থনা করতে অনেকেই আসে।

একটি প্যাগোডায় হো চি মিনের ভারত সফরের সময় উপহার পাওয়া একটি বটগাছের চারা এখন প্রায় মহীরুহ হয়ে উঠেছে।

জোড়া হ্রদের ঠিক মাঝখানে যে বেড়াবার রাস্তা, তার ঠিক ধারে বেশ পুরনো একটি প্যাগোডা। আমাদের দোভাষী আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন হ্রদের কোন্ কোন্ জায়গায় মার্কিন বিমান ঘায়েল হয়ে সলিল সমাধি পেয়েছে। প্যাগোডার কাছেই খোলা আকাশের নিচে রেস্তোরাঁ। দেখলাম সেখানে অনেকেই এসেছে দিনের ছুটি কাটাতে। হ্রদের ধারে অনেক বেঞ্চিতে ছেলে-মেয়েরা প্রেমালাপের ভঙ্গিতে বসে।

কিন্তু শহরের সবচেয়ে কাছে এবং বেড়াবার জায়গা হল 'থং নাৎ' বা 'পুনরেকীকরণ' পার্ক। পার্কের মধ্যে বেশ বড় একটি লেক আছে। আছে রকমারি গাছের বাগান। সেই সঙ্গে রেস্তোরাঁ আর বীয়ার পানশালা। এই

পার্ক তৈরি হয়েছে ভিয়েতনাম স্বাধীন হওয়ার পর। সাইগন, হুয়ে আর হানয় —দক্ষিণ, মধ্য আর উত্তর ভিয়েতনাম—এই তিনে মিলে একদিন এক হবে, এই বাসনা নিয়ে পার্কের নাম দেওয়া হয়েছে 'থং নাৎ'।

ফেরবার পথে গেলাম রেশম সড়কের বাজার দেখতে। প্রকাণ্ড বাজার। ক্রেতার ভিড়ে সব সময় সরগরম। পাওয়া যায় যাবতীয় জিনিষ।

ঘর গেরস্থালির তৈজসপত্র থেকে শুরু করে তৈরি খাবার। সব কিছু। ঘায়েল হওয়া মার্কিন এরোপ্লেনের ধাতু দিয়ে তৈরি কত যে জিনিস তার ইয়ত্তা নেই। হাড়ি-কুড়ি, হাতা-খুন্তি, ডেকচি-সসপ্যান। টিনের কেটলি। তেলবাতি। চুড়ি।

রকমারি বেতের জিনিস। বাক্সপ্যাঁটরা, ব্যাগ, ফ্লাস্ক বসানোর খাপ। ল্যাম্পশেড। চিত্রবিচিত্র ছবি আঁকা বাঁশের চিক। দেয়াল ছবি। টোকা। টুপি। ইলেকট্রিক ফ্যান, টেবিল ল্যাম্প, বাল্ব। ব্যাটারি ফ্যান। কাঠের রকমারি জিনিস। গালা আর চীনেমাটির পুতুল। টি-পট, কাপডিশ, ফুলদানি। কাঁচের মাছপুষি।

রকমারি ফুল। চাঁপা, রজনীগন্ধা।

নানা রকম পাখি। খরগোশ। রাজহাঁস। মুরগি।

চিংড়ি মাছ। রুই, শোল, ল্যাটা, সিঙি, মাগুর, কই, বেলে, ফ্যাঁসা, পাবদা।

ব্যাং। শামুক, গুগলি। কাঁকড়া, কাছিম।

কলা, পেঁপে, কমলা, আমলকি, রিঠে, তেঁতুল।

কোয়াশ, বিন্‌স্‌, গাজর, শশা, বরবটি, লঙ্কা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কুমড়ো, আদা, কচু, টমেটো, সালাড পাতা, রাঙা আলু। আমার চেনা প্রায় সব রকমেরই ফলমূল।

বাজারের মধ্যে খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া কিনতে পাওয়া যায় আঠা-আঠা ভাতের মণ্ড।

বাজার দেখে ভেতো আর মেছো বাঙালী হিসেবে মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। এ পর্যন্ত পশ্চিমে যত দেখেছি তার কোনো জায়গাতেই থাকতে রুচি হলেও বেশিদিন খেতে রুচি হয় না। সেদিক থেকে ভিয়েতনামে ভাত মাছ খেয়ে আমি হয়ত মাসের পর মাস মহানন্দে কাটিয়ে দিতে পারি।

আসলে কিন্তু ভারতীয় আর ভিয়েতনামী পাকপ্রণালীতে বিস্তর

তফাত। সেদিক থেকে চীনা রান্না আর ভিয়েতনামী রান্নায় অনেক বেশি মিল।

একজন ভিয়েতনামী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের আর চীনাদের কি একই রকমের খাবারদাবার? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন— না। পার্থক্য বোঝাতে তিনি বলেছিলেন যে, চীনাদের খাবারে তরিতরকারির চেয়ে মাংসের ভাগ বেশি থাকে। আর ভিয়েতনামীরা বেশি খায় শাকসব্জি।

চীনাদের মত ভিয়েতনামীরাও চপষ্টিক বা দো-কাঠিতে খায়। শুয়োরের মাংসের দিকে টান একটু বেশি। দুধের রেওয়াজ আগে একেবারেই ছিল না। বলতে গেলে, দুধের প্রবর্তক এদেশে ভারতীয়েরা। তারাই প্রথম ডেয়ারির ব্যবসা শুরু করে। বড়রা এখনও দুধ খায় না। মাখন আর দই এখন শহরাঞ্চলে কিছুটা চলছে। আগে যে ভারতীয়রা ছিল, তারা হয় দেশে ফিরে গেছে নয় উঠে চলে গেছে সায়গনে। কিংবা এদেশেই বিয়ে-থা করে তাদের উত্তরপুরুষেরা বেমালুম ভিয়েতনামী বনে গেছে।

একমাস ভিয়েতনামে থাকলেও হোটেলে কিংবা সরকারি অতিথিশালায় ছাড়া স্থানীয় কারো বাড়িতে খাওয়ার সুযোগ হয় নি। তার কারণ, সারা ভিয়েতনামে রেশন প্রথার এত কড়াকড়ি যে, বাড়তি কাউকে বাড়িতে খেতে বলা সম্ভবই নয়। কাজেই গেরস্থবাড়িতে লোকে কি ধরনের খাবার খায় বলতে পারব না। তবে পরিমাণে আর গুণে সে খাবার যে প্রাণধারণের অনুপযোগী নয় ভিয়েতনামী স্ত্রী-পুরুষদের কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা থেকেই তা আন্দাজ করা যায়।

তাছাড়া অধিকাংশ দেশেই অঞ্চলে অঞ্চলে আর গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে খাদ্য রীতির তফাত হয়। এই পার্থক্য নির্ভর করে কোথায় কি পাওয়া যায় এবং কার পক্ষে কি নিষিদ্ধ তার ওপর। কিন্তু আন্তর্জাতিক চলাচল আদান-প্রদান আর মেলামেশার ভিতর দিয়ে পোশাকের মত খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও একটা আন্তর্জাতিক ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাবার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে—এটা এখনও কষ্টকল্পনা। কিন্তু পার্থক্য যে কমছে, তাতে সন্দেহ নেই। একই দেশের মধ্যে, অন্তত শহরগুলোতে, আঞ্চলিক ব্যবধান কমে আসছে, এতো আমাদের দেখা ঘটনা। তেমনি দেশে দেশে ব্যবধান যে কমছে, তার আভাষও দিনে দিনে পাওয়া যাচ্ছে।

সত্যি বলতে কি, ভবিষ্যতের দুনিয়া যে কী চেহারা নেবে, ভাষার ব্যবধান কমতে কমতে সবার এক ভাষা হবে কি হবে না কিংবা হতে কতদিন লাগবে—এসব স্থির নিশ্চিতভাবে না জানলেও আজ চলবে। কিন্তু যে যেখানেই থাক, মানুষ যে এক—এ বিশ্বাস আজ একান্তভাবে জরুরি।

বিকেলে কবি তে-হান্‌কে দেখে সে কথা আরেকবার মনে পড়ে গেল। বয়সে আমার চেয়ে দু বছরের ছোট। একটা চুলও পাকে নি। মুখে কোনো ভারিক্কে ভাব নেই। কিন্তু আছে একটা চাপা বেদনার ছাপ। উত্তর ভিয়েত-নাম লেখক সঙ্ঘের বৈদেশিক দপ্তরের তিনি সভাপতি। তে-হান বলছিলেন :

'আমার বাড়ি দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোয়াং ঙ্য়াই প্রদেশে—যেখান থেকে এসেছেন উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান ডং। হানয় থেকে আট শো কিলোমিটার দক্ষিণে আর সায়গন থেকে আট শো কিলোমিটার উত্তরে এই জায়গা। বিপ্লবী আন্দোলনে সারা দেশে বরাবর এই প্রদেশের ছিল নামডাক। আমি থাকতাম সমুদ্রের ধারের একটি গ্রামে। আমার বেশির ভাগ কবিতাই সমুদ্র নিয়ে লেখা। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমি গ্রামে পড়াশুনো করেছি। তারপর মধ্য ভিয়েতনামের হুয়ে শহরে গিয়ে মাধ্যমিক ইস্কুলে পড়ি। আমার জন্ম ১৯২১ সালে। ১৯৩৬ সালে আমি গিয়ে ভর্তি হই হুয়ে শহরের ফরাসী ইস্কুলে।

'ফরাসী ইস্কুলে পড়তে পড়তে সাহিত্যের দিকে আমি ঝুঁকে পড়ি। বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে আমার আগ্রহ জাগে। ভের্লেন, র‍্যাঁবো, শেলী, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথ পড়ি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি পড়েছি আঁদ্রে জিদের করা ফরাসী অনুবাদে। আমার মনকে সব চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বোধ হয় আমাদের মনের গড়নের সঙ্গে কোথাও একটা মিল ছিল বলে।

'প্রায় তিরিশটি কবিতার একটি গুচ্ছের জন্যে ১৯৪০ সালে হানয়ে এক প্রতিযোগিতায় আমি পুরস্কার পাই। ১৯৪৫ সালে 'বয়ঃসন্ধি' নাম দিয়ে আমার একটি কবিতার বই বেরোয়। ১৯৪৫ সালে জাপানীদের ক্ষমতা দখল আর সেই সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের যে ঢেউ ওঠে, সেই সময় আমি বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিই। দক্ষিণ ফ্রণ্টে ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে আমি লড়াই করি। ফরাসী বিরোধী সংগ্রামের যুগে আমার দুটি কবিতার বই ছাপা হয়। জেনেভা চুক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত আমি আরও ছটি বই লিখেছি। ১৯৬১ সালে

আমি বার্লিনে লেখক সম্মেলনে গিয়েছিলাম। গত কয়েক বছর ধরে আমার লেখার মূল সুর হল দক্ষিণ আর উত্তর ভিয়েতনামের পুনর্মিলন। আমি দক্ষিণে থাকার সময় ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হই।

'শুধু কবিতা লিখে পেট চালানো সম্ভব নয়। জীবিকার জন্যে অন্য কাজ করতে হয়। ভিয়েতনামী ভাষায় একেক সংস্করণে উপন্যাস ছাপা হয় দশ হাজার কপি। কবিতার বই পাঁচ হাজার কপি।'

তে-হান বলছিলেন ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে।

ইংরিজির চেয়ে ফরাসীতে তাঁর দখল অনেক বেশি। ফলে কথাবার্তাগুলো খুবই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হল।

শেষকালে তে-হান তাঁর দুটি কবিতা শোনালেন। তারপর ইংরিজিতে লেন ফক্সের করা অনুবাদ পড়লেন।

আক্ষরিক বাংলায় প্রথমটি এই রকম :

'তোমার মুখ দর্পণ, তাতে আমি দেখি আমার জন্মভূমি।
তোমার চোখ নির্মল স্বচ্ছ নদী।
তোমার ললাট মনে পড়িয়ে দেয় আমার দেশের
অচঞ্চল দৃশ্য।
তোমার স্মিত হাসি, যেন ভকতকে বাগানে ঝকঝকে রোদ্দুর।
তোমার নিশ্বাস মনে পড়িয়ে দেয় আমার দেশের
সুমধুর বাতাস।
আর শত্রুর জন্যে সঞ্চিত আমাদের ঘৃণায়
তুমি বন্ধ করে রেখেছ
তোমার ওষ্ঠাধর।
কোন্ দুঃখ তোমার দু চোখ জলে ভরে দিয়েছে!
হে আমার প্রিয়তম, হে আমার পরম প্রিয় দেশ।
দশ বছরের বিচ্ছেদ,
এই তোমার মুখচ্ছবি, হে দক্ষিণ
ভিয়েতনাম, আমার জন্মের মাটি।'

দ্বিতীয়টি,

'স্বপ্ন ভেঙে যায়
তখন খেয়াল হয় তুমি অনেক দূরে।

দেয়ালে ঠিকরে পড়ে রোদ্দুর
তখন জানতে পারি নিশি অবসান।
আমি দিনের বেলায় মগ্ন থাকি আমার কাজে
রাত্তিরগুলো রাখি তোমার ভাবনায়।
দিনমানে আমি থাকি উত্তরে
রাত্তিরে বাস করি দক্ষিণে।
তুমি আর আমি যেখানেই থাকি
আমরা সব সময় পরস্পরের কাছে।
আজকের দিনটা ঝলমল করছে গত রাত্রির স্বপ্নে।'

সন্ধ্যেবেলা হোয়া বিন হোটেলে আই-সি-সি'র সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা ঘুরে ঘুরে তিনমাস হানয়ে, তিন মাস সায়গনে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন বাঙালী।

একজন ছিলেন উত্তর প্রদেশবাসী ডাক্তার। তিনি বললেন:

'জানেন, আমার চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় হয়েছে। এবার আমি ঠিক করেছি দেশে ফিরে গিয়ে একটা বই লিখব—এ টেল্ অব টু সিটিজ। সায়গন আর হানয়—এই দুই শহরের গল্প।

'আপনি সায়গনে গেছেন? —যান নি। গেলে বুঝতে পারতেন দুই শহরে কোথায় তফাত। হানয়ের রাস্তায় সাইকেল দেখেছেন তো। সায়গনে ঠিক তেমনি দেখবেন স্কুটার আর মোটর বাইক। তার ওপর আছে হর্ন-দেওয়া মোটরগাড়ি। ঘরে বসে থাকলেও আওয়াজে আওয়াজে কান ঝালাপালা। সন্ধ্যের পরও কামাই নেই।

'হয়ত ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, নিচে দেখলেন একটি মিনি-সজ্জিত তরুণী উর্ধ্বশ্বাসে মোটর বাইকে করে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে যেতেই মেয়েটি জল থেকে উঠে পড়ে এক মুখ হেসে বলল—এই দেখ আমার ঠোঁটের লিপস্টিক, যেমন তেমনি আছে। এ লিপস্টিক হল অমুক কোম্পানির।

'সারা শহরে শুধু বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। বার আর নাইটক্লাব। সিনেমায় নোংরা নোংরা ছবি। মদ আর নেশাভাঙ। সায়গনের প্রত্যেকটা লোক ঘুরছে ফুর্তি আর টাকার ধান্ধায়। হোটেলগুলোতে গিজ গিজ করছে মার্কিন জি-আই। লড়াইতে মোটা টাকার ঠিকে নিয়ে তারা আসে। তারা

কেবল দিন গোনে কতদিনে মেয়াদ শেষ হবে। বউকে টাকা পাঠায়। চিঠিতে লেখে অমুক কারবারে টাকা লাগাও, ফিরে গিয়েও বাকি দিনগুলো হেসেখেলে কাটানো যাবে। অনেকেরই ফিরে যাওয়া আর হয় না। ভিয়েতনামেই তাদের জন্যে সাড়ে তিন হাত জমির ব্যবস্থা হয়। তাদের শুধু চিন্তা কিভাবে এখানকার মেয়াদটা শেষ করা যায়। সায়গনে এলেই মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে তারা নিজেদের ভুলে থাকতে চায়।

'আর সে তুলনায় হানয়ে দেখুন কী শান্তি। এখানে প্রত্যেকটা মানুষের বেঁচে থাকার একটা লক্ষ্য আছে। কি রকম সব উজ্জ্বল চোখমুখ। সন্ধ্যেবেলা এখানে আমাদের কিছুই করবার থাকে না। তবু অসম্ভব ভাল লাগে। রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বেড়াই। ঘরে ফিরে এসে বই পড়ি। হানয়ে থাকার এই তিনটে মাস আমার একার নয়, আমাদের সকলেরই খুব আনন্দে কাটে। কত কথা মনে আসে। কত কী ভাবতে পারি। নিজেকে মানুষ বলে মনে হয়।...'

৪

থং নাৎ হোটেলের একতলায় আলোচনাকক্ষ এবং বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা আছে। সেটা জানলাম যখন সকালে ন্থয়েন হং আমাদের কাছে ভিয়েতনামী লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ছোট্ট সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

বিদেশীদের নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল করাবার এ রকম ব্যবস্থা আর কোথাও আমি দেখি নি। বক্তারা ভিয়েতনামী ভাষাতেই বলেন। দোভাষীরা সেটা বিদেশী অতিথিদের কাছে তর্জমা করে বলে দেন।

একটা কথা গোড়াতেই বলা দরকার। ভিয়েতনামী ভাষা আর তার উচ্চারণ পদ্ধতি আমাদের থেকে এত আলাদা যে, কানে শুনে সঠিকভাবে নিজেদের হরফে লেখা খুবই দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময় দোভাষীকে দিয়ে নামগুলো রোমান হরফে লিখিয়ে নিয়েছি। সে ক্ষেত্রেও সব সময় উচ্চারণ ঠিক থাকে নি। তার কারণ, হরফের উচ্চারণে হেরফের আছে।

যাই হোক, ন্থয়েন হং যা বললেন তা সংক্ষেপে এই :

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে লোকসাহিত্য আর লোকশিল্পের দিক থেকে ভিয়েতনামের অনেক মিল আছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে ভিয়েতনামে। দশ হাজার বছর আগেকার এই যন্ত্রটি পাথরের তৈরি। ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাঁধা পাথরের এগারোটি ফালি দিয়ে জলতরঙ্গের মত এই বাদ্যযন্ত্র বানানো হয়েছিল। ফরাসীরা বরাবর বলে এসেছে ভিয়েতনামের নিজস্ব সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। আরেকবার তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হল। এটি তামার তৈরি একটি ডঙ্কা। প্রাচীনকালে বন্যা এলে মানুষকে সাবধান করার জন্যে কিংবা বাইরের শত্রুরা আক্রমণ করলে সবাইকে একসঙ্গে হওয়ার জন্যে উপজাতীয়দের মধ্যে এই ডঙ্কা বাজানোর রেওয়াজ ছিল। হুং রাজাদের আমলে তৈরি এই ডঙ্কা চার হাজার বছরের পুরনো। এসব যে মনগড়া ফাঁকা বড়াই নয়, তার প্রমাণ হাতেনাতে ধরা রয়েছে।

এক ভিয়েতনামেই সংখ্যালঘু জাতি, উপজাতি আছে সাঁইত্রিশটি। উত্তরপ্রান্তে আছে মুং, ত্যয়, মেও, জাও। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে থাই, মা। এই বহুবৈচিত্র্য নিয়ে ভিয়েতনামেরও একত্ব। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবহমান-কালের যেসব প্রচলিত লোককথা আছে, সেইসব লোককথা ভিয়েতনামের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। থাইদের বাঁশীর ধরনের এক রকম বাদ্যযন্ত্র আছে। আর আছে নানা লোকগাথা, লোকসঙ্গীত আর প্রণয়কাহিনী নিয়ে নানা পালাগান।

থাইদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাচগান আর কবিতা। পালপার্বণে, নববর্ষের দিনে, গ্রামসভায়, বিবাহানুষ্ঠানে, গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ছেলেমেয়েরা তো বটেই, এমন কি বুড়োবুড়িরাও নাচে গায়। শুকনোর সময় থাই উপজাতির একটি পরব হয়। সেখানে মুখে মুখে গান কবিতা বাঁধার প্রতিযোগিতা চলে। মেয়েরা ছেলেদের ডাকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে। এদের লোকগীতির সঙ্গে আসামের অহোমদের গানের কিছুটা মিল আছে।

উপজাতীয়দের লোকসঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য তরুণ-তরুণীর ভালবাসা আর দেশের শ্রীসৌন্দর্য। শাসকশ্রেণীর সভাকবিদের রচনার মত তাতে অন্ধ বিধিবিধান আর দৈবে বিশ্বাসের স্থান নেই। তাতে দৈবানুগ্রহ বা রাজানুগ্রহের নান্দীপাঠ থাকে না; তার বদলে বলা হয়, 'দশের অনুগ্রহে, গ্রামবাসীর সহায়তায়'।

ম্যঙদের সঙ্গে ভিয়েৎদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ম্যঙদের বলা যায় ভিয়েৎদের পূর্বপুরুষ। হানয় থেকে এক শো মাইল দূরে হোয়া বিন প্রদেশে তাদের বাস। এদের মধ্যে একটি দীর্ঘ কাব্য আজও প্রচলিত আছে। তার নাম 'স্থল জলের জন্মকথা'।

আরও দক্ষিণে গেলে চাংসান পাহাড়। এই পাহাড় বহু লোককথার উৎসস্থল। ত্যয় নুইন মানে পশ্চিমের মালভূমি। এখান থেকে উঠেছে মহাকাব্য। ত্যয়েরা ধনুর্ধর বীর যোদ্ধা। খুব দেশভক্ত। তাদের একটি লোককথায় আছে যে, কিন (প্রাচীন ভিয়েৎ) অধিজাতি আর ত্যয়েরা অভিন্ন। চাম আর জাভাদেরও লোককথায় আছে, ওরা এককালে মাথার ওপরকার একই চালের নিচে থাকত। পরে ওরা আলাদা হয়ে গেছে। ত্যয়দের 'তরুং' হল প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্রের আধুনিক সংস্করণ। ওদের মহাকাব্যের নাম 'জাম সান'; গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রকৃতি এই মহাকাব্যে ফুটেছে—পাহাড় পর্বত, নির্মল আকাশ, হাতির পাল।

প্রাচীন ভিয়েৎদের অর্বাচীন নাম 'কিন'। কিনরা ছিল সভ্যতার উচ্চতর স্তরে। তারা থাকত শহরে। দশম শতকে ভিয়েৎরা শহর তৈরি করে তার নাম দেয় 'কিন বাক'। পরে এই শহরের নাম হয় হানয়। শহরের পুরনো নাম থেকে পাহাড়বাসীদের কাছে ভিয়েৎরা 'কিন' নামে পরিচিত হয়। অন্যান্য জাতিসত্তাকে মিলিয়ে কিনরা একটা বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে।

'ডং বাও' উপকথায় আছে; অধিপতি ল্যাক লং কুয়ান ও-কোকে বিয়ে করে। ও-কোর একশো ছেলে হয়। একদিন ল্যাক লং তার স্ত্রীকে বলে, 'আমি ড্রাগন, তুমি পরী। আমাদের একসঙ্গে থাকা চলবে না।' এই বলে সে তার পঞ্চাশজন ছেলেকে নিয়ে সমতলে আর উপকূল অঞ্চলে চলে যায়। বাকি পঞ্চাশজন ছেলে মার সঙ্গে পাহাড়ে চলে যায়। ল্যাক লঙের এক ছেলে থেকে হয় হুং রাজ বংশের উদ্ভব।

শেষ হুং রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। দুজন হল তার পাণিপ্রার্থী। একজন পর্বতদেবতা, আরেকজন জলদেবতা। রাজা বললেন, উপযুক্ত যৌতুক নিয়ে যে আগে আসবে তাকেই আমি মেয়ে দেব। পর্বতদেবতা যৌতুক নিয়ে আগে আসায় রাজকন্যাকে সে বিয়ে করে পাহাড়ে নিয়ে চলে গেল। জলদেবতা রেগে গিয়ে জলোচ্ছ্বাস তুলে পর্বতদেবতাকে আক্রমণ করল। কিন্তু জলদেবতা পর্বতদেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারল না।

এইসব উপকথার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় ভিয়েতনামের মানুষের বহুত্বের মধ্যে একাত্মবোধ আর বন্যার বিরুদ্ধে সেদেশের সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। এইভাবেই ভিয়েতনামে গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সংগঠন আর স্বাজাত্যবোধ।

একটি উপকথায় আছে বহিঃশত্রুকে প্রতিরোধের কথা। ফু জঙ্গ ছিল তিন বছরের শিশু। হঠাৎ সে প্রকাণ্ড পুরুষ হয়ে উত্তর (তার মানে চীন) থেকে আসা 'আন' নামে এক শত্রুর আক্রমণ রুখতে চলে গেল। জঙ্গকে লড়তে হয়েছিল খালি হাতে। তাই জঙ্গল থেকে একটা বাঁশ সে উপড়ে নিল শত্রুকে আঘাত করার জন্যে। সে সওয়ার হল এমন এক ইস্পাতের ঘোড়ায়, যার মুখ দিয়ে আগুন ছিটকে পড়ে। সেই আগুনে শত্রুরা জ্বলে গেল। জঙ্গ তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে ফেলল। বিভিন্ন উপজাতির দলপতিরা আর অধিজাতিগুলো জঙ্গের সঙ্গে এক হয়ে লড়েছিল। শত্রুদের পরাস্ত করে জঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেল। ঘোড়ার পায়ের দাগ বরাবর জমির ওপর তৈরি হল ডোবা পুকুর আর বড় বড় সায়র। জঙ্গ তারপর পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে কিনরা ফু জঙ্গের নামের সঙ্গে জুড়ে দিল 'থিউ ভোং' অর্থাৎ স্বর্গাধিরাজ পদবী।

ঐতিহাসিক আমলেরও অনেক কিংবদন্তী আছে। যেমন 'দুই বোন চুং' আর 'কুমারী চিউ', এরা লড়েছিলেন চীনা সামন্তশ্রেণীর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে।

তাছাড়া ফরাসী আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেসব বীর বীরাঙ্গনারা অসমসাহসে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের নিয়েও অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে।

বীরদের নিয়ে মহাকাব্য রচনা করা ভিয়েতনামের লোকচরিত্রের বরাবরের এক বৈশিষ্ট্য।

ভিয়েতনামের এইসব কিংবদন্তীর ভেতর পুরনো ইতিহাসের অনেক হারানো খেই খুঁজে পাওয়া যায়। আর শুধু জাতির ইতিহাস নয়, সামাজিক লোকাচার আর লোকরহস্যেরও অনেক হদিশ মেলে অজস্র রূপকথায়, প্রবাদ প্রবচনে, ধাঁধা প্রহেলিকায়, হাস্যকৌতুকে।

যাত্রা, অপেরা, থিয়েটার আছে। পুকুরের মাঝখানে ভাসমান মঞ্চে হয় পুতুল নাচ। 'চেও' সুরে হয় গীতিনাট্য। তাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর হাস্যকৌতুকের প্রাধান্য। দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক ধরনের লোকনাট্য খুব

জনপ্রিয়। তার নাম 'তুয়ং'। তাতে করুণ আর বীররসের প্রাধান্য। পুরনো অনেক অপেরাকে এখন আধুনিক নাট্যাভিনয়ের রূপ দেওয়া হয়েছে। তাকে বলে 'কাই ল্যুয়ং'। নাচের ধরন আর পোষাক কথাকলির মত।

পুরনো সংস্কৃতি ধারাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে তাকে মেজেঘষে এ যুগের উপযোগী করে। প্রাচীন ঐতিহ্য জাদুঘরের নিদর্শন হয়ে থাকে নি, তা এখানকার মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন উপজাতির বহু বিচিত্র সংস্কৃতিকে আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতির রূপ দেওয়া হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিদেশী সংস্কৃতিরও গ্রহণযোগ্য দিকগুলো জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা হয়েছে। কিন্তু সবকিছুর ভিত্তিভূমি হয়েছে দেশের লোকসংস্কৃতি।

নুয়েন হঙের এই বক্তব্য যে কত ঠিক পরে গ্রামাঞ্চল সফরে গিয়ে দেখে শুনে তা অনেকখানি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

লোকগীতির শুধু পুরনো কথা নয়, পুরনো সুরও সাধারণ মানুষের মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাধারণ মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে।

ভিয়েতনামের কমিউনিস্টরা অক্ষরে অক্ষরে এটা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা শুধু এ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল সর্বজনীন মতবাদের পোষক নন, সেই সঙ্গে তাঁরা ভিয়েতনামের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যেরও ধারক বাহক।

অনেকের কাছে শুনেছি, এমন কি দক্ষিণ ভিয়েতনামের যে পুতুল বাহিনীর সাধারণ সৈন্যেরা সায়গনে থাকে, তাদেরও মনের ক্ষুধা মেটাতে মুক্তাঞ্চলের শরণাপন্ন হতে হয়। কেন না তারাও তো সবাই প্রায় গ্রামের মানুষ। সায়গনের বিজাতীয় আমোদপ্রমোদ, গানবাজনা, বার, নাইটক্লাব, সিনেমা-টেলিভিশনের যৌনতাসর্বস্ব ছবি তাদের তৃপ্ত করতে পারে না। কাজেই সায়গনের কাছাকাছি যে মুক্তাঞ্চল, যেখানে জলাভূমিতে নৌকো জোড়া দেওয়া মঞ্চে গ্রাম্য যাত্রা তুয়ং অভিনয় হয়, সেখানে হাঁটু জলে দাঁড়ানো বিপুল গ্রাম্য দর্শকের পাশে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে যাত্রার পালা শোনে সায়গন থেকে আসা পুতুল বাহিনীর উর্দি-পরা পল্টনের দল। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছে যে লোকসংস্কৃতি আর জাতীয়সংস্কৃতি শৃঙ্খল-মোচনের কত বড় অস্ত্র হতে পারে।

উত্তর ভিয়েতনামের নানা জায়গায় গিয়ে আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে

যে আমাদের গণসংস্কৃতির আন্দোলন লোকসংস্কৃতি আর জাতীয়সংস্কৃতির মূলধারাকে আজকের খাতে ঠিকভাবে কি বইয়ে দিতে পেরেছে? এই আন্দোলন কি একটু বেশিমাত্রায় শহুরে নয়? জঙ্গী কথা আর জঙ্গী সুরকে আজও কি আমরা আমাদের আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকায় রেখে দিই নি?

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এই ত্রুটি তো খুবই জাজ্বল্যমান। এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শহুরে সুরে রচনা করা কোনো গান কি গ্রামবাসীর হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে? আজও কি দেশের ডাক গানের আকারে একেবারে তলায়, একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশের মানুষের হৃদয় মন আলোড়িত করে ছড়িয়ে পড়তে পারছে?

এটা মনে রাখা দরকার, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির সুসম্পর্ক তখনই গড়ে উঠতে পারবে, যখন শুধু দেওয়া নয় নেওয়ার কথাটাও আমরা মনে রাখব।

বিকেলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের হালফিল অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কাছে বললেন সাংবাদিক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক এবং আফ্রো-এশীয় সংহতি আর বিশ্ব শান্তি সংসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য লু কুই কি।

তিনি বললেন, 'আমি শান্তি আন্দোলনের লোক, অথচ এমনি কপাল, আমাকে বলতে হচ্ছে যুদ্ধের কথা। ভিয়েতনামের মানুষের লড়াইয়ের কথা দুনিয়ার লোক জানে। কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমরা লড়াই করতে ভালবাসি। আমরা লড়ছি ঠেকায় পড়ে। না লড়ে উপায় নেই বলেই আমরা ছেলে-বুড়োয় মেয়ে-পুরুষে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছি। নইলে আমরা ভিয়েত-নামীরা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। ইতিহাসে এমন কখনও হয় নি যে, আমরা কারও ওপর চড়াও হয়েছি। বরং আড়াই হাজার বছর ধরে বিদেশী আক্রমণকারীরা একের পর এক এসেছে আমাদের পরাধীন করতে।

'আধুনিককালে আমাদের স্বাধীনতার এ লড়াই তৃতীয় পর্যায়ের। প্রথমে সামন্ততান্ত্রিক চীন। তারপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ জাপানী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৪ ফরাসী দখলদারদের বিরুদ্ধে এবং তারপর ১৯৫৪ থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে—তৃতীয় পর্বে এই তিন দশকের ওপর আমরা সমানে লড়ে চলেছি। তোমাদের চারপাশে আজ যাদের দেখছ, তারা সবাই এই যুদ্ধে লড়েছে। আমরা কখনও বিশ্বাস হারাই নি, আমাদের হৃদয় কখনও শুকিয়ে যায় নি, আমাদের মানবিক অনুভূতি

কখনও মরে নি। আমাদের বিশ্বাস অটুট আছে, কারণ আমরা লড়াই ছাড়ি নি। এবার আমি তোমাদের বলব ঠিক আজ কী ঘটছে। ভাইকে ভাই যে ভাবে বলে। অন্তর থেকে বলব।

'শত্রু বিমানের হানা দেওয়ার সংখ্যা দিনে হাজার বার। কখনও কখনও হয় তার তিন গুণেরও বেশি। এই সব হানায় বোমা পড়ে ন' হাজার টন। মার্কিনদের পঞ্চাশটি যুদ্ধ-জাহাজ আর তিনটি বিমানবাহী পোত সমুদ্রে মোতায়েন। দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে বোমার ওজন ছিল পঞ্চাশ কেজি। এখন সেখানে মার্কিনরা দেড় শো গুণ বেশি ওজনের (সাড়ে সাত টন) বোমা ফেলছে। এখন তারা যে ধরনের বোমা ফেলছে, সে বোমা পাহাড়ের মাথায় পড়লে গোটা পাহাড় মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ফরাসীদের যা সৈন্য ছিল তার দ্বিগুণ মার্কিন সৈন্য এখন ভিয়েতনামের মাটিতে। সামরিক সাজসরঞ্জাম দশ থেকে বিশ গুণ বেশি। মার্কিনরা বলে তারা খুব সংযত হয়ে চলেছে। এই তাদের সংযমের নমুনা। ঠিক এই মুহূর্তে ভিয়েতনাম থেকে লাওস—একশো মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গন। একদিনের মধ্যে সীমান্ত থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে বান্‌ডুং আর তার পরের পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে শিপোন, পৌঁছে যাবে বলে গত ৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিনরা যে যুদ্ধাভিযান শুরু করে, তাতে ছিল মোট আমদানীকৃত মার্কিন সৈন্যের সিকি ভাগ, আটশো প্লেন, পনেরো শো স্থলযান, তার মধ্যে আটশো ট্যাঙ্ক, দুশো বড় কামান। বিমানবহরের মধ্যে অনেকগুলো ছিল বি-৩২ বিমান। এ সত্ত্বেও বান্‌ডুং পৌঁছুতে তাদের চারগুণ সময় লেগে গেল। তাও ওখানেই তাদের থেমে যেতে হল। আর এগোবার মুরোদ হয় নি। এরপর উত্তর আর দক্ষিণ থেকে লাওসের মুক্তিবাহিনী ১৫ মার্চ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরো একটা ডিভিশনকে খতম করে দেয়। মার্কিন সৈন্যরা তখন পিছু হটার চেষ্টা করে। কিন্তু লাওসের মুক্তিবাহিনী চারদিক থেকে বান্‌ডুং ঘিরে ফেলে। বান্‌ডুং-এ তখন শত্রুপক্ষের দুটি ব্রিগেড (সামরিক, ছত্রী সেনা, গোলন্দাজ মিলিয়ে শত্রুপক্ষের মোট পাঁচ হাজার সৈন্য)। ১২ মার্চ বান্‌ডুং পুরোপুরিভাবে মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। শত্রুপক্ষের সমস্ত ট্যাঙ্ক আর দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য খোয়া যায়।

'এরপর ২০ মার্চ (আমরা হানয়ে পৌঁছুবার পরের দিন) লাওসের মুক্তিবাহিনীর হাতে ব্রাউনে দেড় হাজার শত্রুসৈন্য মারা পড়ে। বাকি সৈন্যরা

লাওসের সীমান্ত ছেড়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে পালিয়ে যায়। নিক্সন এখন ঘাঁটি গেড়েছে খে-শানে। শত্রুসৈন্যরা চেষ্টা করছে খে-শানে পালাতে। কিন্তু পালাবার পথও এখন তাদের বন্ধ।

'১৯ মার্চ পর্যন্ত আমরা শত্রুপক্ষের চোদ্দ হাজার সৈন্যকে ঘায়েল করেছি—তার মধ্যে মার্কিন সৈন্য দু হাজার। শেষ অবধি নিহত সৈন্যদের সংখ্যা কুড়ি হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। ওরা পালাবার রাস্তা পাবে না। আট শো ট্যাঙ্ক আর স্থলযান ওদের হাতছাড়া। সাড়ে পাঁচ শো বিমানের মধ্যে পাঁচ শো পঁচিশটি হেলিকপ্টার সাবাড় হয়ে গেছে।

'ফরাসীদের তুলনায় মার্কিনদের লোকসানের পরিমাণ বহুগুণ বেশি। এই অভিযানে ওদের চারটি ডিভিশন (একেক ডিভিশনে প্রায় দশ হাজার সৈন্য) খতম ; প্রত্যেক ডিভিশনের দুই-তৃতীয়াংশ মারা পড়েছে। মোট নিহত আর আহতের সংখ্যা কুড়ি হাজারের কম নয়।

'এবারকার যুদ্ধাভিযানে মার্কিনদের মতলব ছিল লাওসে ঝাঁপিয়ে পড়া, বাইরের সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা।

'মার্কিনদের নয়া ঔপনিবেশিক নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ভিয়েতনামীদের দিয়ে ভিয়েতনামীদের ঠাণ্ডা করা যায় নি। পেটোয়া বাহিনী, মার্কিন বিমানবহর, মন্ত্রণাদাতা, কলাকৌশল, ডলার—কিছুতেই কিছু হয় নি। অগত্যা এসেছে আরও দশ হাজার মার্কিন সৈন্য। পেটোয়া বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত। মার্কিন বিমানগুলো পাকা ফলের মত ঝুপঝাপ মাটিতে পড়েছে। মন্ত্রণাদাতার দল ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। ওদের কলকৌশল আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। আর সেইসঙ্গে হয়েছে ডলারের শ্রাদ্ধ।

'আমাদের আছে সঠিক নেতৃত্ব, বীর জনবাহিনী, বৈপ্লবিক মনোবল আর যতটুকু নইলে নয় ততটুকু অস্ত্রশস্ত্র, যার সবটাই খুব আধুনিক নয়। এই দিয়ে আমরা ওদের সব হিসেব বানচাল করে দিয়েছি।

'আমরা জিতব ঠিকই। কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা জল্পনাকল্পনা করি না। 'লুক' পত্রিকার সম্পাদক আর্থার আমাকে ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, আমরা গণৎকার সন্ন্যাসী নয়। যার বুদ্ধিবিবেচনা আছে, সে রকম মানুষ কী করবে আমরা বলতে পারি। কিন্তু নিক্সন কী করবে তা বলা শক্ত। তবে নিক্সন যদি উত্তর ভিয়েতনামে বোমা ফেলে, আমরা

তাতে ভীত নই। আমাদের কথা হল, শত্রু যে ভাবেই আসুক তার মোকাবিলা করার জন্যে আমরা তৈরি।

'আমরা বসে নেই। সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ আমরা সমানে করে চলেছি। আমাদের প্রথম কাজ মার্কিনদের পরাস্ত করা। যুদ্ধক্ষেত্রে বা দেশের মধ্যে যা যা দরকার আমরা চেষ্টা করছি যোগাতে। আমাদের দেশবাসীর সব প্রয়োজন তাতে মিটছে না। কিন্তু তোমরা নিজের চোখেই দেখতে পাবে তারা কেউ না খেয়ে নেই। মাসে মাথাপিছু চালের বরাদ্দ গড়ে ষোল কেজি থেকে বাড়িয়ে সাতাশ কেজি করা হয়েছে। খনির মজুর পায় সাতাশ কেজি। ছাত্ররা আঠারো কেজি। লোহা-মজুর আর রাসায়নিক কারখানার মজুর পায় চব্বিশ কেজি। ছোটরা বয়স অনুপাতে পায় ছয় থেকে বারো কেজি। তাছাড়া পায় মুরগির মাংস, শুয়োরের মাংস আর মাছ। আমরা শুয়োরের মাংস রপ্তানিও করি। নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের দর ১৯৫৭ থেকে আজ পর্যন্ত যা ছিল তাই আছে। চাল এক কেজি আমাদের পয়সায় ন' আনার মত। দেশী সাইকেল তিন শো সাড়ে তিন শো টাকার মত। রাস্তায় দুর্ঘটনা একেবারেই বিরল। স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ। তারা মোট জনসংখ্যার সিকি ভাগ। স্কুলের মাইনে এক টাকা কুড়ি পয়সার মত। দু প্যাকেট সিগারেট এক টাকা ন' আনারও কম। সামাজিক নিরাপত্তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা আছে। রাত দুটোর সময়ও তুমি একা একা গ্রামের দিকে যেতে পারো। রাহাজানির কোনো ভয় নেই। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা তো নেই-ই, বরং যত কাজ আছে তত লোক পাওয়াই মুশকিল। আমাদের মোট লোকসংখ্যা দু কোটিরও কম। তার মধ্যে কাজ করতে সমর্থ লোকের সংখ্যা এক কোটি।'

কমরেড লু কুই কি'র বলবার ধরনটা বড় সুন্দর।

উত্তর ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা বলতে গিয়ে বললেন :

'আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি মাইনে পান আমাদের প্রেসিডেন্ট। মাসে পঞ্চাশ ডলারের মত (ভারতীয় মুদ্রায় তিন শো নব্বই টাকা)।

'একবার এক মার্কিন সাংবাদিক এসেছিলেন কমরেড হো চি মিনের সঙ্গে দেখা করতে। নানা কথাবার্তার মধ্যে তিনি হো চি মিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আপনি তো এক সময় মার্কিন দেশে ছিলেন আর এখন আছেন

ভিয়েতনামে। এই দু জায়গায় আপনার থাকার মধ্যে কোন্ জায়গায় মিল আর কোথায় অমিল ?

'হো চি মিন তার উত্তরে বলেছিলেন : মার্কিন মুলুকে আমি ছিলাম ডকের মজুর। আর এখানে এখন প্রেসিডেণ্ট। তফাৎ এই। আর মিল এইখানে যে, মার্কিন দেশে আমার রোজগার ছিল মাসে পঞ্চাশ ডলার, এখানেও সেই একই মাইনে।

'এরপর কমরেড হো চি মিন মার্কিন সাংবাদিকটির কাছে তাঁর দেশের প্রেসিডেণ্টের মাইনে কত জানতে চাইলেন।

'মার্কিন সাংবাদিকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন : দয়া করে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে বাধ্য করবেন না। কেন না প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আপনি আর প্রেসিডেণ্ট জনসন (তখনকার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট)—দুজনের মধ্যে বিলকুল তফাৎ।

'কমরেড হো চি মিন বলেছিলেন : তবু আমার হাতে পয়সা থেকে যায়। মাইনের সব টাকা আমি খরচ করে উঠতে পারি না। আর প্রেসিডেণ্ট জনসন যা মাইনে পান তাতে তাঁর কুলোয় না।

'মার্কিন সাংবাদিকটি বলেছিলেন : তার কারণ, তুমি থাকো সাধারণ মানুষের মত। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জনসনের জীবনযাত্রা অন্য রকমের।'

কমরেড লু কুই কি বলতে লাগলেন—

'আমাদের দেশে প্রেসিডেণ্টের মাইনে দু শো চল্লিশ ডং (সাড়ে চার ডঙে এক ডলার)। আর একজন ঝাড়ুদার পায় ন্যূনতম মজুরি। মাসে চল্লিশ ডং। সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে কমের মধ্যে পার্থক্য হল ছ' গুণ। একজন খনির মজুর পায় এক শো থেকে এক শো কুড়ি ডং। গড়পড়তা মজুরি হল আশী থেকে নব্বই ডং। সাধারণ মজুরদের মাইনে মাসে ষাট ডং। তার ওপর আছে ওভারটাইম। ওভারটাইমের দাম বাবদ দেওয়া হয় বাড়তি রেশন—টাকা নয়।

'খনিতে স্বামী-স্ত্রী মিলে রোজগার করে দু শো ডঙের বেশি। তারা ওভারটাইম খেটে দেশের একজন মন্ত্রীর মাইনের দেড়গুণ রোজগার করতে পারে। আমাদের দেশে একজন মন্ত্রীর মাইনে মাসে দু শো ডং। যে মন্ত্রীর সন্তান সংখ্যা বেশি আর যে মজুরের সন্তান সংখ্যা কম—দুজনের রোজগারের তুলনা করলে দেখা যাবে মন্ত্রীর অবস্থার চেয়ে সেই মজুরের অবস্থা বরং ভালো।

'মজুরির সঙ্গে যোগ হয় শতকরা দশ শতাংশ। বাড়িভাড়া চুয়াল্লিশ স্থ (এক শো স্থতে এক ডং)। রোজগারের মাত্র এক শতাংশ বাড়িভাড়া (কলের জল আর ইলেকট্রিসিটি সমেত)। অর্থাৎ, কারো মাইনে এক শো টাকা হলে জল আর ইলেকট্রিসিটি সুদ্ধ তার বাড়িভাড়া মাত্র এক টাকা। কারো রোজগার এক শো ডঙের বেশি হলে তাকে দিতে হবে মাইনের শতকরা তিন ভাগ। যার রোজগার মাসে এক শো ষাট ডঙের বেশি তাকে দিতে হবে মাইনের শতকরা পাঁচ ভাগ।

'খাওয়া বাবদ মাথাপিছু খরচ মাসে আঠারো ডং। পনেরো ডঙেও চালিয়ে নেওয়া যায়। বিনামূল্যে চিকিৎসা। ডাক্তার ডাকতে কিংবা ডাক্তারকে দেখাতে ভিজিটের টাকা দিতে হয় না। খাওয়া-থাকা বাবদ মাথাপিছু খরচ মাসে কুড়ি ডঙেরও কম। যে টাকা বাঁচে তাই দিয়ে জামাকাপড় এবং এটা সেটা তো হয়েই যায় উপরন্তু ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে সাইকেল কেনা যায়। চুয়াল্লিশ ডঙে হয় আট ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় বাষট্টি টাকা চল্লিশ পয়সা)।'

৫

এখানে এসে অবধি ভোরে উঠছি। কিন্তু যত রাত্রেই শুই আর যত ভোরেই উঠি সামনের রাস্তা কোনো সময়ই জনশূন্য নয়। সব সময়ই কেউ না কেউ সাইকেলে করে কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। কি ছেলে কি মেয়ে। সকালবেলায় রাস্তা কেন এত ঝকমকে তকতকে থাকে, একটু বেশি রাত্তিরে হেঁটে এলে বোঝা যায়। বয়স্ক মেয়েরা বার হয় রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার কাজে।

আজ নিয়ে পাঁচ দিন আছি হানয় শহরে। রোজ সকালে উঠে একবার তরবারি হ্রদ এলাকায় হেঁটে আসি। বুড়োরা দু চারজন বেড়ায়। দু একটি ছেলে হাতে সুতো জড়িয়ে মাছ ধরে। চারপাশে বাকি সবাই চলেছে কাজে। প্রাচ্যের মানুষ বলে এখানে বেশ সুবিধে। আমাকে ভিনদেশী মনে করে কেউ তাকায় না; ফুলের দোকানের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়াই। লড়াইয়ের আগুনের মধ্যেও এদের ফুলের ওপর টান একটুও কমে নি দেখে অবাক হই।

ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট সারার পর আমরা গেলাম বিপ্লবের স্মারক-সংগ্রহশালা

দেখতে। ফরাসী রাজত্বের সময় এটা ছিল শুল্ক-ভবন। ১৯৫৯ সালে এই বাড়িতে মিউজিয়ম বসানো হয়।

মিউজিয়মের চারটি বিভাগ :

এক, বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

দুই, ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা।

তিন, ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন।

চার, মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই আর সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা।

মিউজিয়মের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য কমরেড ফান চং ফুক আমাদের চা-সিগারেট খাওয়াতে খাওয়াতে বলছিলেন কিভাবে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের মানুষ শুধু ভবিষ্যৎকেই নয় অতীতকেও মুঠোয় আনছে।

আমরা থাকতে থাকতেই বিদেশের আরও দুটি প্রতিনিধি দল এল মিউজিয়ম দেখতে। একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আরেকটি হাঙ্গেরি থেকে।

হানয়ে আসবার আগে ভিয়েতনাম সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে এসেছিলাম বাস্তবের সঙ্গে তা মিলছে না। আমি ভেবেছিলাম দেশ জুড়ে দেখব যুদ্ধের কুচকাওয়াজ আর মিলিটারি মেজাজ। থমথমে মুখ, চড়া গলা, দেওয়ালে দেওয়ালে মারমুখো পোস্টার।

এসে দেখছি সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি।

আজন্ম যারা শুধু যুদ্ধই দেখে আসছে, তাদের মুখে যে কি রকম হাসি উপছে পড়তে পারে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। রাস্তাভর্তি লোক, অথচ কোনো চেঁচামেচি হৈচৈ নেই। এ পর্যন্ত কাউকে চড়া গলায় কথা বলতে শুনি নি। কাউকে দেখি নি মুখ ভার করে থাকতে।

কদিন আগে খে-শানের যুদ্ধজয় উপলক্ষে একটু বেশি রাত্তিরে রাস্তার ওপর একটা সভা হয়ে গেল, সে সভাও দেখবার মত। মাথার ওপর টাঙানো হয়েছিল শ্লোগান লেখা কয়েকটা ব্যানার। সভা গরম করার জন্যে রাস্তা কাঁপিয়ে কোনো শ্লোগান নেই। একটি ধীরস্থির সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। তাতে কোথায় কিভাবে কী ঘটেছে তার বিবরণ আর তার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলা হল। তারপর সুপ্রাচীন স্বাধীনতা সংগ্রামের লোকগীতি গাইলেন জাতীয় পোশাকে সজ্জিত দুজন নামকরা গায়িকা। ব্যস, সভা শেষ।

আমাদের দেখাশোনার জন্যে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের একজন কমরেড তাই। কমরেড তাইয়ের মতন এমন হৃদয়বান মানুষ আমি কম দেখেছি। ইংরিজি বলেন কোন রকমে বোঝাবার মত করে। মুখে সব সময় হাসি।

কমরেড তাইয়ের স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকে গ্রামে। থান হোয়া'র দক্ষিণে গ্রামাঞ্চলে। কমরেড তাই বাড়িতে যান ন মাসে ছ মাসে।

এখন এটাই হয়ে গেছে সারা দেশে রেওয়াজ। স্বামী-স্ত্রী পিতা-পুত্র সবাই যে যার কাজে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচ্ছেদ উত্তরে আর দক্ষিণে। কবি তে-হানের কবিতায় বিচ্ছিন্ন আত্মার যে আকুতি তা সারা দেশের মর্মবাণী।

কমরেড তাইয়ের প্রথম যৌবন গেছে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এখন তাঁর কাজ বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ দপ্তরে। থাকতে হয় হানয়ে।

ন্গুয়েন বলে যে ছেলেটি আমাদের দোভাষী, তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু বয়স আন্দাজে একটু বেশি চুপচাপ। পরে বুঝেছিলাম ওর শরীরটা তত মজবুত নয়। বেশিক্ষণ কথা বললে শিরঃপীড়া গোছের কিছু হয়। নাকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়।

ন্গুয়েনের কাছে বসে ভিয়েতনামী ভাষা সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করি। আমার কাছে সব বিদেশী ভাষাই শক্ত বলে মনে হয়।

এই কদিনে লক্ষ্য করছিলাম আমার আর বান্রেভাইয়ের নামের ভিয়েতনামীকরণ ঘটেছে। আমার নাম হয়েছে সু-ফা আর কমরেড জহির হয়েছেন জা-হি।

ভিয়েতনামীতে সব বিদেশী নামেরই এই এক দশা। লেনিন হলেন লে-নিন। কালিদাস হয়েছেন কা-লি-দা-সো। মার্কস হয়েছেন মাক্। সমস্তই হয়েছে নিজেদের একস্বর ভাষার বিশেষ প্রকৃতিগুণে এবং প্রথা নিয়মে।

ন্গুয়েন কাগজের ওপর লিখে লিখে স্বর আর ব্যঞ্জনের কোন্টার কী উচ্চারণ বোঝাবার চেষ্টা করে। খানিক পরে আমি হাল ছেড়ে দিই।

রোমান হরফে লিখলেই যে উচ্চারণ সহজ হয় না, এটা প্রথম সমঝেছিলাম হাঙ্গেরিতে। সব ভাষারই উচ্চারণের নিজস্ব নানা ধরন আছে। যার ফলে,

'সি' কোথাও হয় 'ক' কোথাও হয় 'চ'। তেমনি ভিয়েতনামী ভাষায় 'ডি'-র উচ্চারণ ইংরিজি 'জেড'-এর মতন আর তার মাথা কাটা থাকলে তবে হয় 'ড'। 'এক্স'-এর উচ্চারণ ইংরিজি 'এস্'-এর মতন। সেই সঙ্গে 'জি-আই' থাকলে হবে ইংরিজি 'জেড' আর 'টি-আর' থাকলে হবে 'চ'-এর উচ্চারণ। তার মানে আসলে 'গিয়াপ' 'জ্যাপ' আর 'ত্রাণ ভান' 'চান ভান' হবে। তেমনি 'ওয়াই'-এর উচ্চারণ হবে, 'ই'। ফলে 'মাই লাই' নয় 'মি লাই'।

বুখারেস্টে গিয়ে প্রথম জানতে পারলাম রুমানিয়ার (আসলে 'রোমানিয়া') প্রধানমন্ত্রীর নাম 'চৌসেস্কু' (সিসেস্কু নয়)! না গিয়েও যে জানা যায়, তার প্রমাণ—'টাইম' পত্রিকার কৃপায় আমরা জেনেছি 'নাগি' নয় 'নজ'; এবং 'হোক্সা' নয় 'হোজা'। অথচ আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলো একটু উদ্যোগী হলেই অনায়াসে এসব ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত করতে পারে।

বিদেশী নামের ক্ষেত্রে তো বটেই, স্বদেশী নামের ক্ষেত্রেও আমরা ভারতীয় ভাষায় এতদিন একান্তভাবে ইংরিজিকে অনুসরণ করে এসেছি। স্বাধীন হওয়ার পর কিছু কিছু দেশী নামের পুনর্বাসন হলেও 'ক্যালকাটা', 'বার্ডওয়ান' থেকেই গেছে। পাশ্চাত্যের কথা আপাতত বাদ দিলেও প্রাচ্যের দেশগুলোর বেলায় আজও কেন আমরা ইংরিজি-নির্ভর থাকব? আমাদের প্রাচীন পুঁথিতে এবং প্রকৃতপক্ষে যে দেশের নাম 'কম্বোজ' তাকে ইংরিজির অনুকরণে এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে বাংলা কাগজে কেন আমরা কাম্বোডিয়া লিখব? অথবা দিল্লীতে অফিস থাকা সত্ত্বেও বাংলা কাগজে কেন সমানে লেখা হতে থাকবে 'চওহান'-এর বদলে 'চ্যবন', 'তিরুমলে'র বদলে 'থিরুমল'? দিল্লীর সংবাদ-দাতারা দেশী নামের তো বটেই বিদেশী নামেরও উচ্চারণগুলো সহজেই নানা সূত্রে জেনে নিতে এবং জানিয়ে দিতে পারেন।

আমি জানি, আমার এই লেখাতেই অনেক ভিয়েতনামী নামের ভুল উচ্চারণ আছে। তার কারণ আমার না জানা অথবা ভুল বোঝা। কিন্তু বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্র, প্রকাশক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার একযোগে চেষ্টা করলে বিদেশী নামের ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য সহজেই দূর করতে পারেন। ইংরিজির অন্ধ অনুকরণ না করে জাতীয় ঐতিহ্য এবং আমাদের ভাষা আর লিপির নিজস্ব প্রকৃতির কথা মনে রেখে এ কাজে এগোতে হবে।

ভিয়েতনামে এসে আরও একটা ব্যাপারে আমার হুঁশ হল। আমাদের

দেশে অনেকেই অনেক দিন ধরে রোমান হরফ প্রবর্তনের কথা বলে আসছেন। রোমান হরফে সুবিধে অনেক। কিন্তু এ বি সি ডির কথা না তুলে তাঁরা যদি বলতেন, রোমান বা লাতিন হরফে আমরা অ-আ-ক-খ লিখব—তাহলে কি দেশের লোকের কাছে তাঁদের প্রস্তাব ঢের বেশি গ্রহণযোগ্য হত না?

লিপি বদলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভয় কোনো একটি ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি বজায় থাকা নিয়ে। ভিয়েতনামে লাতিন হরফকে ভিত্তি করে নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতিতে যে বর্ণমালা গ্রহণ করা হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'কোয়ক্ নু'।

হরফ জিনিসটা যে চিহ্নের বেশি কিছু নয় এবং হরফ বদলালেও ভাষার উচ্চারণ হুবহু একই থাকবে—এই ভরসা দেশের লোককে দিতে পারলে রোমান হরফে লোকের খুব একটা আপত্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। এর বড় প্রমাণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের এশিয়াঞ্চল। সিরিলিক লিপি গ্রহণ করেও সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার সমস্ত ভাষাই নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ভারতীয় সংবিধানে আন্তর্জাতিক সংখ্যাচিহ্ন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অথচ দক্ষিণ ভারতে ছাড়া আর কোথাও পাঠ্যপুস্তকে তার চল নেই। আমার মনে হয়, এর কারণ, 1, 2, 3-কে আজও আমরা 'ওয়ান', 'টু', 'থ্রি' বলার অভ্যেস কাটাতে পারি নি বলে। এক-দুই-তিন বলতে পারলেই সংখ্যাগুলোকে অনায়াসে আমরা 1, 2, 3 করে ফেলতে পারি।

আসলে সমস্যাটা লিপি বা সংখ্যা নিয়ে নয়। যে উপলব্ধিটুকু থাকলে দেশের ভোল আগাগোড়া বদলে দেওয়া যায়, আমাদের মধ্যে তার নিতান্তই অভাব।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যাঁদের কাছে আমাদের অনেকেরই সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা, ভারতের সেই কমিউনিস্ট পার্টিরও এসব দিকে হুঁশ নেই বললেই চলে।

অথচ ভিয়েতনামের মানুষের জীবনের এমন একটি দিকও নেই যেখানে সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হাত লাগায় নি।

সারাদেশের মানুষ কমরেড হো চি মিনকে বলে 'বাক্ হো'। আঙ্কল্ হো। হো চাচা। কিন্তু বাংলায় 'হো খুড়ো' নয়। কেন না 'বাক্' মানে খুড়ো নয়, জ্যাঠা বা মার দাদা। শুধু নেতা নন, খুব আপনার জন।

হুয়েন আমাকে শেখাচ্ছিল ভিয়েতনামী ভাষায় আত্মীয়বর্গের কাকে কী বলে। ঠাকুর্দা—ওং, ঠাকুরমা—বা, বাবা—চা, মা—ম্যে, স্ত্রী—ভা, স্বামী—চাং, দাদা—আঞ, দিদি—চ্যে, ভাই—এম্ চায়্, বোন—এম্ গায়্, ছেলে—কন্ চায়্, মেয়ে—কন্ গায়্, ভাইপো—চাউ চায়্, ভাইঝি—চাউ গায়্, জ্যাঠা বা মা'র দাদা—বাক্, কাকা—চু, মা'র ভাই—কাউ, জ্যাঠাইমা, বাবার, বা মার বৌদি ও দিদি—বাক্ গাই, বাবার বোন—কো, মার বোন—জি, কাকিমা বা মার ভাইবৌ—মো, কমরেড—ডং চি।

বিভিন্ন জিনিস: চাল—গাও, ধান—লুয়া, ভাত—ক্যম, চা—চ্যা, সিগারেট—থুওক লা, মদ—জ্যোও, পিঠে—বাঞ্, রুটি—বাঞ্ মে, পেঁপে—ডু ডু, মিঠাই—ক্যেও, মাংস—থিৎ, সব্জী—জাও, নুন—মোয়্, কলা—চুওই্, লিচু—ভাই, নারকোল—জুয়া, লেবু—চাঞ্, কমলালেবু—কাম্, আপেল—তাও, দুধ—সুয়া, চিনি—ডুওং, জল—নুডে, টমেটো—কাচুয়া, আলু—খোয়াই, চিংড়ি—তম্ ইত্যাদি। শুনে লেখা কাজেই অনেক উচ্চারণই যথাযথ হল না। তবু দিলাম এই ভেবে যে, এ থেকে ভিয়েতনামী শব্দগুলোর হয়ত কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে।

বিকেলে গেলাম 'ভিয়েতনাম কুরিয়ার' পত্রিকা এবং 'ভিয়েতনাম স্টাডিজ'-এর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় দেখলাম একটি ভারি সুন্দর দেয়াল পত্রিকা। এ আপিসে এবং এর ছাপাখানায় যাঁরা কাজ করেন, এই দেয়াল পত্রিকা তাঁরাই চালান।

সম্পাদক নুয়েন খাক ভিয়েনকে দেখলেই মনে হয় পণ্ডিত ধরনের মানুষ। পরে নিজের কথা যেটুকু বললেন, তাতে বোঝা গেল চেহারার সঙ্গে তাঁর বৃত্তির বিলক্ষণ মিল আছে।

বললেন: 'আমার জীবনে আমি তিনটি সমাজ দেখেছি। আমার ছেলেবেলা কেটেছে জমিদার আর ম্যাণ্ডারিনদের মধ্যে! বড় হয়ে ফরাসী দেশে গিয়ে লেখাপড়া করেছি। এখন বাস করছি সমাজতান্ত্রিক সমাজে। আমার বাপ-দাদারা ছিলেন পণ্ডিত। আমার সঙ্গে বরাবর ফরাসীদেশের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ ছিল। আমাদের দু দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর। সেই সময় এদেশের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়েছিল স্বাধীনতার খোলা হাওয়া। ১৯৩৭ সালে গড়ে ওঠে

বিভিন্ন গণসংগঠন। ১৯৩৯ নাগাদ আমরা অনেকখানি ব্যক্তি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। গুপ্ত সংগঠনের পাশাপাশি তখন গড়ে ওঠে প্রকাশ্য সংগঠন। ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই তো আমরা কম করি নি। কিন্তু আমাদের পার্টি একটি দিনের জন্যেও ফরাসী দেশের জনসাধারণকে কখনও শত্রু বলে মনে করে নি।

সকালে গেলাম ইতিহাস মিউজিয়মে। পৌঁছুবার পর মনে হল, হোটেল থেকে দিব্যি হেঁটে আসা যেত। আট দশ মিনিটের বেশি লাগত না। কিন্তু অতিথি বলে আমাদের প্রায় জামাই আদরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। দু পা যেতেও দু দুটো গাড়ি।

এই মিউজিয়ম তৈরি হয় ১৯৫৮ সালে। যাঁর ওপর এই মিউজিয়মের ভার—মাদাম ভাওক্ জুং—তিনি বেশ কমবয়সী। মহা উৎসাহে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের সব দেখালেন। আগে ইতিহাস বলতে ছিল শুধু মাত্র ফরাসীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস। এখন আর তা নয়। প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ থেকে ভিয়েতনামের ইতিহাসের সুদীর্ঘ ধারা। প্রায় হাজার বছর ধরে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই।

মিউজিয়মের ঘর থেকে দেখা যায় লাল নদীর উঁচু পাড়। বিমান হানা হলে দর্শকেরা যাতে শেল্টারে যেতে পারে, তার জন্যে দেয়ালে দেয়ালে রয়েছে নিশানা।

মাদাম জুং বললেন, আমরা কিন্তু শেল্টারে যাই না। সাইরেন বাজলেই রাইফেল ঘাড়ে করে নিয়ে আমরা চলে যাব ছাদে।

অথচ তার চলায় বলায় এতটুকু জঙ্গী ভাব নেই। ভারি মিষ্টি চেহারা। গলার স্বরও খুব মিষ্টি।

বললেন, বোমা পড়ে পাছে ধ্বংস হয়ে যায় সেই ভয়ে কোনো আসল দুষ্প্রাপ্য জিনিস আমরা এখন মিউজিয়মে রাখি না। শহরের বাইরে সেসব জিনিস সযত্নে রাখা আছে। লড়াই মিটলে আনা হবে।

ছবি তোলার প্রস্তাবে মাদাম জুং তক্ষুণি রাজি। বললেন, আমার কিন্তু এক কপি চাই।

ফিরে এসে হোটেলের একতলায় উত্তর ভিয়েতনামের সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আমাদের বললেন কমরেড হুয়েন স্তুয়ান শান। কমরেড শানের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। শান কবি। লেখক সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয়দের একজন। যেমন সাদাসিধে তেমনি হৃদয়বান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এখনকার ভিয়েতনামের একজন নামকরা লেখক বু হিয়েন। খুব অভিজ্ঞতাবহুল তাঁর জীবন। শত্রু অধিকৃত গ্রামে তিনি থেকেছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি নে আন, হা তিন, কোয়াং বিন অঞ্চলগুলোতে চলে যান। এই সব এলাকায় মার্কিন বোমারু বহর সাংঘাতিক রকমের বোমাবর্ষণ করে। বু হিয়েন এইসব জায়গায় থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে একাধিক উপন্যাস, ছোট গল্প আর রিপোর্টাজ লিখেছেন।

এঁদের দুজনের কাছ থেকে উত্তর ভিয়েতনামের সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গেল :

চীনের রাজারাজরাদের পরাধীনতার হাত থেকে দশম শতাব্দীতে মুক্তি পাওয়ার পরই ভিয়েতনামের জাতীয় সাহিত্য ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। অবশ্য লোককথায় বরাবরই গান-গাথার প্রচলন ছিল। তার কালনির্ণয় খুবই কঠিন। দশম শতাব্দীতে দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত ভিয়েতনামেও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবে চীনালিপিতে সাহিত্যের বাহন ছিল প্রাচীন চীনা ভাষা। গোড়ার দিককার কবিতায় ছিল বৌদ্ধধর্মের ক্ষণবাদের প্রভাব। যেমন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা লিখেছিলেন :

> 'মানুষ শুধু ছায়া, জাতমাত্র গত,
> গাছ বসন্তে কী সবুজ, শরতে
> নগ্নকায়।
> উত্থান আর পতন, তাতে আমাদের
> কী আসে যায় ?
> মানুষ আর সাম্রাজ্যের ভবিতব্য হল
> যেন ঘাসের ওপর টলটল করা
> শিশির।'

স্বাধীনতার পর ভিয়েতনামী রাজত্ব যখন কায়েম হয়ে বসল, তখন শুরু হল

প্রকৃতি-বন্দনা। যারা প্রকৃতি পূজারী হলেন, তাঁরাই আবার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের সময় তাঁদের লেখায় ফুটিয়ে তুললেন স্বদেশপ্রেম।

মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিজয়ী রাজা চান নান তন্ লিখেছিলেন :

'কুয়াশায় গ্রামগুলো অস্পষ্ট হয়,
সূর্যাস্তে এই তারা অদৃশ্য, এই তারা
দেখা দেয়।
রাখালেরা শিঙা বাজিয়ে মোষের
পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে,
শ্বেত সারসের পাঁতি ঝুপ ঝুপ করে
নেমে আসছে মাঠে।'

চতুর্দশ শতকে চীনা লিপি থেকে উদ্ভূত নম্ লিপিতে ভিয়েতনামী ভাষাকে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। এই সময় যারা লিখতেন তাঁরা সবাই সমাজের ওপরতলার মানুষ। তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ধর্মে আর ভাববাদী দর্শনে মগ্ন। তবু কারো কারো লেখায় জনজীবনের ছবি ফুটে উঠত।

ক্রমশ নম্ লিপিতে গড়ে উঠতে থাকে ভিয়েতনামের জাতীয় সাহিত্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভিয়েতনামে কনফুসীয় ধর্ম একদিকে রাজার হাত শক্ত করে, অন্যদিকে যুক্তিবুদ্ধির বিকাশ ঘটায়। একদিকে রাজার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, অন্যদিকে সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ। রাজতন্ত্রের পতনের যুগে কনফুসীয় পণ্ডিতেরা পড়লেন উভয় সঙ্কটে। রাজাকে ছাড়লে লৌকিক জীবন থেকে সরে গিয়ে কর্তব্যভ্রষ্ট হতে হয়; আর রাজার কথামত চললে সাধারণের স্বার্থহানি করতে হয়।

এই শতাব্দীর এক বিরাট পুরুষ ছিলেন কনফুসীয় পণ্ডিত গুয়েন চাই। ধর্মের ছোট গণ্ডী দিয়ে নিজেকে তিনি বেঁধে রাখেন নি। কনফুসীয় তত্ত্বের মানবতা-বাদী ধারাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। চীনা মিং রাজাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের রণনীতিজ্ঞ হওয়া ছাড়াও তিনি কবি ছিলেন এবং ভূগোল লিখেছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর তাঁর কপাল পুড়ল। সত্যনিষ্ঠ আর ন্যায়পরায়ণ হওয়ায় আস্তে আস্তে তাঁকে রাজার বিরাগভাজন হয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে হল এবং সংসার ত্যাগ করেও শেষ পর্যন্ত রাজার পারিষদদের চক্রান্তে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

তাঁর লেখা 'যুদ্ধজয়ের ঘোষণাপত্র' ভিয়েতনামী সাহিত্যের পরম সম্পদ বলে মনে করা হয়। তাঁর একটি কবিতার নমুনা :

'সূর্য অস্ত যায় দেখে বানরেরা
বিলাপ করে,
পাহাড়ের শূন্য ঢালু গায়
বাঁশের ছায়া দীর্ঘমান হয়।
এই সব কিছুর মধ্যেই কি
রয়েছে একটি স্পন্দমান হৃদয় ?
না ভুলে গিয়ে থাকলে আমি
এর জবাব দিতে পারতাম।'

লে রাজাদের রাজত্বকালে 'তাও দান' নাম দিয়ে একটি বিদ্বৎসভা গড়ে ওঠে। কাব্য রচনায় মার্জিত শৈলী দেখা দেয়। নানা ইতিহাসগ্রন্থ লেখা হয় এবং দেশীয় উপকথা সংকলিত হয়। এই সময়কার নানা রকম আজব কাহিনীতে সামাজিক প্রথা আর শাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা আছে।

এরপর কনফুসীয় ধর্মের দিন চলে যাওয়ায় এবং বড় বড় কৃষক বিদ্রোহের ধাক্কায় কবি সাহিত্যিকেরা পুরনো সমাজের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিতে গিয়ে সাহিত্যরীতির রূপান্তর ঘটে এবং সেই সঙ্গে ভাষাও ঢের বেশি সমৃদ্ধ হয়। গল্প আর কাহিনী লেখা হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দোষত্রুটি, নারী-পুরুষের প্রেম এবং মানবপ্রেমিক ধ্যানধারণা হল এই লেখার বিষয়বস্তু।

সপ্তদশ শতকে গল্পকাহিনী লেখা শুরু হবার পর অষ্টাদশ শতকে ভিয়েতনামী সাহিত্য পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠল। লিখিত সাহিত্যের উপর লৌকিক সাহিত্যের ভাষা আর বিষয়বস্তু প্রভাব বিস্তার করল। দৈনন্দিন মুখের ভাষার অনাড়ষ্ট আর অনাড়ম্বর সারল্যে, প্রবাদ প্রবচন আর গানের বর্ণবহুল প্রকাশভঙ্গিতে এবং লোককাহিনীর ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর সরসতায় ভিয়েতনামী সাহিত্যে এক অসামান্য বিবর্তন দেখা দিল। ভাষার চলিত আর লিখিত রূপের সমন্বয় হল। সপ্তদশ শতকে কাহিনী ছিল সরল। অষ্টাদশ শতকে তার আরও বিস্তার হল ; জটিল ঘটনাবহুলতা আর চরিত্র-বিন্যাসে পদ্যবন্ধে উপন্যাস লেখা হল। রাজাদের অন্তর্বিবাদ, জনসাধারণের দুর্দশা, রাজসভার দুর্নীতি আর অন্যায়,

নায়িকাদের রূপৈশ্বর্য—সমস্ত কিছু স্থান পেল বস্তুনিষ্ঠ আর ইতিহাসনিষ্ঠ এইসব রচনায়।

উনবিংশ শতকের শেষাশেষি জাতীয় লিপি গড়ে উঠল।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর নতুন রীতিতে ছোটগল্প লেখা শুরু হল। অধ্যাপক হোয়াং নোক ফাক কয়েকটি বড় বড় উপন্যাস লেখেন। নরনারীর প্রেমকে বিষয়বস্তু করে তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অসহনীয়তা ফুটিয়ে তোলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ঔপন্যাসিক হো বিও চান জনসাধারণের শোচনীয় জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলেন। হো চি মিন তাঁর প্রথম জীবনে ফরাসী ভাষায় লেখা কয়েকটি ছোটগল্পে ফরাসী ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

এই পর্বের চারজন বিশিষ্ট লেখক হলেন ন্থুয়েন কং হোয়ান, নাম কাও, নো তাং তো আর ন্থুয়েন হং। হোয়ানকে বলা হয় ভিয়েতনামের শেখভ। ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন নাম কাও। তাঁর 'চি ফেওয়ের কাহিনী' বইটি নানা ভাষায় তর্জমা হয়েছে। বছর কয়েক আগে মারা গেছেন তাং তো; সামন্ততান্ত্রিক আমলে পল্লীজীবন নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস 'ভিয়েক লাং'। ন্থুয়েন হঙের উপন্যাসে ধরা পড়ে সমাজের নিচু তলার জীবন।

এরপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে উঠতে থাকে ভিয়েতনামের জাতীয় সাহিত্য। এই পর্বে দুটি ধারা দেখা যায়। একটি বাস্তববাদী আরেকটি কল্পনাধর্মী। শেষের ধারাটিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ধরা পড়ে।

পার্টির প্রেরণায় বহু লেখক সাধারণ মানুষকে কাছ থেকে দেখার জন্যে গ্রামে আর শিল্পাঞ্চলে চলে গেলেন। গোড়ায় গোড়ায় তাদের দুঃখদুর্দশা ছাড়া আর কিছু তাঁরা দেখতে পান নি। ক্রমশ তাদের মধ্যেকার বিপ্লবী শক্তি তাঁদের চোখে ধরা পড়ল। কোনো কোনো লেখক গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মধ্যে, কেউ কেউ চলে গেলেন শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে। নাম কাও শত্রুর হাতে ধরা পড়ে নিহত হলেন। সাবেক আমলের লেখকেরাও নতুন পথে চলতে শুরু করলেন। তো হোয়াই লিখলেন 'দক্ষিণ-পশ্চিম' নামে উপন্যাস।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে নতুন নতুন অনেক লেখক পাওয়া গেছে। যেমন, শ্রমিক লেখক ভো হুয়া তাম। শত্রু-অধিকৃত খনি

অঞ্চলে তিনি ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী। খনি মজুরদের জীবন এবং মালিকের শোষণ—এই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস 'ভূং ম' ১৯৫২-৫৩ সালে সরকারি পুরস্কার পায়। পল্টন থেকে লেখক হন হুয়েন থাই। লেখক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হুয়েন জিন থি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন অজ্ঞাতবাসে থেকে।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উত্তর ভিয়েতনামের লেখকেরা নিয়মিতভাবে ক্ষেতখামার আর কলকারখানায় যেতে শুরু করেন। তাঁরা শুধু দর্শক হিসেবে যান না; শ্রমিককৃষকের দৈনন্দিন কাজেও অংশ নেন। তার ফলে তাঁরা তাঁদের দুঃখকষ্ট আর সাধ-আহ্লাদের আঁচ অনুভব করেন। পার্টি চায় লেখকেরা যাতে তাঁদের লেখায় ফুটিয়ে তোলেন :

(১) শত্রুর বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সংগ্রামে সাধারণ মানুষের দুঃখবরণ আর সংগ্রাম;

(২) জনগণের মহিমান্বিত আর ন্যায়নিষ্ঠ ভাবধারা।

লড়াই আর উৎপাদনের ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের যে অদম্য অজেয় মনোভাব অবিরাম ফুটে উঠছে, সাহিত্যে যেন তা রূপায়িত হয়। লেখকের কাজ শুধু বীরত্বের গুণকীর্তন করা নয়, শৌর্যবীর্যের উৎস খুঁজে বার করা। এখনকার অনেক উপন্যাসে রয়েছে সেই চেষ্টা। যেমন, লোটাস পুরস্কার বিজয়ী তো হোয়াইয়ের উপন্যাস 'মিয়েন তাই'। সামরিকবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রাস্তা তৈরি আর সেতু নির্মাণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে হুয়েন থি নামে এক তরুণ সৈনিক উপন্যাস লিখেছেন—'মেঘের ভেতর দিয়ে রাস্তা'। কবি চে লান বিয়েনের স্ত্রী শ্রীমতী থুয়ং বিপ্লবের ঠিক পূর্বাহ্নের দিনগুলো নিয়ে দুটি ভাল উপন্যাস লিখেছেন—'ভগ্ন উপকূল' আর 'এসেছে তুফান'। জনগণের দুঃখদুর্দশা ছাড়াও এতে ফুটেছে তাদের বিপ্লবী চেতনা।

কমরেড শান ভিয়েতনামী সাহিত্যের আধুনিক পর্বের কথা বলবার সময় এও বললেন যে, সাহিত্যের নানা সমস্যা নিয়ে এখন তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলেছে। বিপ্লবী বীরত্ব কিভাবে দেখানো হবে? চোখে দেখা বাস্তবের মানুষ আর মনগড়া কল্পনার মানুষ, জীবনের সাক্ষাৎ প্রতিফলন, নাটকে প্রথাগত আর বাস্তব চরিত্র, সমালোচকের কর্তব্য, নতুন লেখকদের মুশকিল—এই রকম নানা বিষয় নিয়ে তাঁরা এখন আলোচনা করছেন।

এরপর কমরেড শান উত্তর ভিয়েতনাম লেখক সঙ্ঘের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন।

লেখক সঙ্ঘের গোড়াপত্তন হয় ১৯৫৭ সালে। পঁচাশি জন লেখক নিয়ে শুরু হয়; তার মধ্যে ছাব্বিশ জন ছিলেন প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের খ্যাতনামা লেখক। এখন এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক শো পঁচাশি। নতুন লেখকদের মধ্যে আছেন সৈনিক, কর্মচারী, শিক্ষক, সমবায়কর্মী—এই রকম নানা ক্ষেত্রের মানুষ। তিন চার বছর অন্তর বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। ছয় থেকে আঠারো মাসের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং কোর্স আছে। চার পর্যায়ের এই শিক্ষাক্রম যারা শেষ করেছে, তাদের বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। প্রাচীন আর আধুনিক ভিয়েতনামী সাহিত্য ছাড়াও শেক্সপীয়র, গর্কী, লু স্যুনের লেখার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। তাছাড়া তাদের হাতেকলমে ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদি লিখতে শেখানো হয়। সেই সঙ্গে ভারী ওজন নিয়ে তাদের রাস্তা হাঁটার অনুশীলন করতে হয়। নতুন লেখকদের জন্যে তিন চার বছরের একটি শিক্ষাক্রম অচিরে চালু করবার চেষ্টা হচ্ছে।

লেখক সঙ্ঘের সদস্য হতে গেলে দুটি গুণ থাকা দরকার। প্রথমত, প্রার্থীকে হতে হবে সৎ আর ন্যায়পরায়ণ, সেইসঙ্গে চাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ। দ্বিতীয়ত, পাঠকদের প্রভাবিত করেছে এমন রচনাবলী চাই। কেন্দ্রে ছাড়াও অঞ্চলে অঞ্চলে স্থানীয় লেখক সঙ্ঘ আছে।

সন্ধ্যেবেলা গেলাম 'হাং জা হোং হা' থিয়েটারে অপেরা দেখতে। অভিনয়ের ধরন অনেকটা আমাদের যাত্রার মতন।

৭

সকালে কমরেড তাই এসে সুখবর দিলেন। কাল আমরা রওনা হব থান হোয়ায়। এ কদিন শহরে আটক হয়ে থাকার কারণ ছিল। খে-শানে মার্কিন আর তাদের হাত-ধরা দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনী বেদম মার খাওয়ার পর মরীয়া হয়ে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা ফেলবে—এই রকমের একটা আশঙ্কা ছিল। ভালোয় ভালোয় একটি সপ্তাহ কেটে গেছে। সুতরাং এখন বেরিয়ে পড়া যায়।

সকালে কমরেড শান ভিয়েতনামী কবিতার ওপর বললেন।

বললেন: ভারতীয় কবিতার সঙ্গে ভিয়েতনামী কবিতার সাদৃশ্য আছে। জনগণের হৃদয় থেকে উৎসারিত। এর উৎসে গাথাকাব্য, প্রবাদ প্রবচন, শ্রমগীতি আর লোক-কবিতা। হো চি মিন বলেছেন: আমাদের মানস-প্রতিমা পদ্মফুল। সরোবরের সেরা ফুল পদ্ম। সবুজ পাতা, সাদা পাঁপড়ি, হলদে পরাগ। কাদায় আর পাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়েও তার দুর্গন্ধ নেই।

লৌকিক কাব্যধারার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ভিয়েতনামী কবিতায়। মাঝি আর পাহাড়িয়াদের গান আমাদের কাব্যরচনার সহায় হয়েছে। লৌকিক এই ধারার মধ্যে রয়েছে লোককবিদের সংগ্রামস্পৃহা আর আনন্দময় জীবনের স্বপ্ন।

তাছাড়া আছে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান কবিদের বিপুল ঐতিহ্য। এঁরা বাস করতেন গ্রামাঞ্চলে। সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। তাঁরা রচনা করেছেন উৎকৃষ্ট কাব্য। এঁদের মধ্যে একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, রণনীতিকুশল আর কবি নুয়েন চাইয়ের কথা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে।

যাঁর কবিতা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে তিনি হলেন নুয়েন জু (১৭৬৫-১৮২০)। তাঁর সওয়া তিন হাজার লাইনের যে দীর্ঘ আখ্যানকাব্যটি আজও কেউ কেউ আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারে, তার নাম 'কেও'। ভিয়েতনামী সাহিত্যে এ এক অসামান্য সৃষ্টি। লোকমুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষাকে এই কাব্যে এমন নিখুঁতভাবে মেলানো হয়েছে যে, নিরক্ষর কৃষকেরও যেমন শুনে শুনে এ কাব্যের অনেক অংশ কণ্ঠস্থ, তেমনি আবার সুপণ্ডিতেরাও এ কাব্যকে মহৎ সৃষ্টি বলে স্বীকার করেছেন। নুয়েন জু এমনভাবে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন আর সেই সঙ্গে প্রেমের বেদনা-বিধুরতা আর বিচিত্র অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন যা প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করে।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও এই কাব্য ভিয়েতনামী সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এতে ধরা পড়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন চেহারা। ম্যাণ্ডারিন পরিবারের একজন হয়েও নুয়েন জুর সৃষ্ট কোনো ম্যাণ্ডারিন চরিত্রই পাঠকের মনে এতটুকু সহানুভূতি জাগায় না। কৃষি বিদ্রোহের নেতাদের আদলে তৈরী তাঁর কাব্যের রাজদ্রোহী চরিত্রকেই বরং তিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি যে যুগে লিখেছেন সে যুগে কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো মেয়ের স্বেচ্ছামিলন সমাজের চোখে পাপ বলে গণ্য হত। নুয়েন জু

তাঁর এই কাব্যে কনফুসীয় ধর্মের সমস্ত বিধিনিষেধ চুরমার করে ভেঙেছেন। অন্তরের প্রেম আর দেহগত মিলনকে তিনি উঁচুতে তুলে ধরেছেন। হুয়েন জুর মতাদর্শের ক্ষেত্রে নানা স্ববিরোধিতা থাকলেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে মহৎ কবি। আজও ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ কথায় কথায় 'কেও' গ্রন্থকে দিনপঞ্জিকার মত ব্যবহার করে। ছেলেমেয়ে প্রেম করছে, কেউ বাইরে যাত্রা করবে, চাষবাস কেমন হবে—সব ব্যাপারেই তাদের কাছে ভবিষ্যদ্‌বক্তা হল 'কেও'। জনজীবনের পক্ষে এবং ভবিষ্যতের কথা বলে বলেই 'কেও' এত জনপ্রিয়। অনেক সময় 'কেও' থেকে অংশবিশেষ নিয়ে প্রয়োজনমত অদল বদল করে এখনকার কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতকের আরও কয়েকজন কবি উল্লেখযোগ্য কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন। মহিলা কবি দোয়ান থি দিয়েম তর্জমা করেছিলেন সেকেলে চীনা ভাষায় লেখা 'চিন ফু'। সরল সুললিত ভাষায় এই অনুবাদটি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। তার কারণ ভিয়েতনামী সাহিত্যে এই প্রথম রমণীর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ পেল এবং সেই সঙ্গে রাজায় রাজায় যুদ্ধে যে বলি হয় সেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হল।

আরেক মহিলা কবি হো সুয়ান হুয়ং স্ত্রীজাতির মর্মবাণী ব্যক্ত করলেন বিলাপের সুরে নয়, বজ্রকণ্ঠের ঘোষণায়। পুরুষের প্রাধান্যকে অস্বীকার করে তিনি বললেন, মেয়েদের নিচু করে রেখেছে সমাজ, প্রকৃতি নয়।

অত্যন্ত পণ্ডিত হয়েও হো সুয়ান হুয়ং লিখতেন সাধারণের ভাষায়; তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল খুব বলিষ্ঠ; তিনি বিপজ্জনক শব্দ আর সরস বাগ্‌বিধি ব্যবহার করলেও কখনও তা অশিষ্ট হয়ে ওঠে নি। সব রকমের ভণ্ডামিকে তিনি আঘাত করেছেন এবং বহুবিবাহ প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন হতভাগ্য নারীদের সমব্যথী এবং অবিবাহিত জননীদের পক্ষে।

ঊনবিংশ শতকের শেষে আর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ভিয়েতনামী ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তু সুয়ং ছিলেন ব্যঙ্গনিপুণ। তিনি প্রচ্ছন্ন ভাষায় ফরাসী ঔপনিবেশিকদের কশাঘাত করেছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নুয়েন দিন চিউ ছিলেন অন্ধ কবি। তিনি তাঁর কবিতায় চেয়েছিলেন সামন্ততন্ত্র আর ঔপনিবেশিক নাগপাশ থেকে মুক্তি।

১৯৩০ সালে ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন। এই সময়ের পর থেকে

ভিয়েতনামী সাহিত্যের 'আধুনিক যুগ'। এই যুগকেও তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়; (১) ১৯৩০—১৯৪৫। অগস্ট বিপ্লবের প্রাক্কাল। (২) ১৯৪৫—১৯৫৪। ফরাসীবিরোধী প্রতিরোধের অবসান। (৩) ১৯৫৪ সালের পর। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধ।

বাস্তবধর্মী আর কল্পনাধর্মী—এই দুই ধারায় আধুনিক কাব্য প্রবাহিত। তাঁরাই বাস্তবধর্মী কবি, যাঁরা সংগ্রামী কবি হিসেবে জনসাধারণকে লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কমরেড হো চি মিন। 'কারাগারের দিনগুলি'র আগেও তিনি কবিতা লিখে দেশবাসীর নানা অংশে সংগ্রামের প্রেরণা জাগান। জেলে থাকার সময় তাঁর লেখা কবিতাবলীতে তিনি শুধু পার্টির নীতি আর আদর্শের কথাই বলেন নি, কবিতার দিক দিয়েও তা সার্থক হয়েছে। কমরেড হো আধুনিক কবিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—এখনকার কবিতা হবে ইস্পাতকঠিন এবং কবিকে জানতে হবে শব্দকে বিদ্যুৎগতি করার কৌশল।

আধুনিক পর্বের গোড়ার দিকের কবি তো হু। তো হু এখন কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রথম সারির নেতা। জেলে থাকার সময় তিনি যে সব কবিতা লেখেন, সেই সব কবিতা গুপ্তপথে জনসাধারণের হাতে গিয়ে পৌঁছোয় এবং দেশবাসীকে সংগ্রামের প্রেরণা দেয়। তাঁর 'তারপর', 'ওঠে হাওয়া', 'উত্তরাংশের ভিয়েতনাম', 'হো চাচা' এইসব কবিতার বই খুবই জনপ্রিয়। তো হু র জন্ম ১৯২০ সালে।

প্রবীণ কবি তু মো বিদ্রূপে দক্ষ। তাঁর বই 'বিপরীত স্রোত', 'প্রতিরোধের স্মিতহাসি'। প্রথম যুগের খ্যাতনামা অন্যান্য কবিদের মধ্যে টে লু ('কবিতাবলীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি'র নতুন কাব্য আন্দোলনের সূচনা করেন), সুয়ান জিউ ('কবিতা কবিতা', 'নক্ষত্র', 'চামু অন্তরীপ', 'দু চোখে ধনী'), হুই কান ('পবিত্র পাবক', 'কাল অন্যদিন', 'আমার হাতজোড়া', 'প্রস্ফুটিত মাটি'), চে লান বিয়েন ('ধ্বংসস্তূপ', 'আলো আর পলিমাটি'), তে-হান ('ফুটন্ত যুগ', 'দক্ষিণের হৃদয়', 'উত্তরে চলি', 'নতুন সুর', 'গানের ভেতর দিয়ে যাত্রা'), হুয়েন সুয়ান শান ('স্বদেশ গাইছে', 'আগন্তুক বসন্তের পদপাত', 'সমুদ্র বাসভূমি') আর দুই মহিলা কবি—আন থো ('গাঁয়ের ছবি', 'মুকুতাদ্বীপ', 'উড়ন্ত পাখির ডানায়') এবং ভান দাই (মৃত : 'ফোটার ঋতু')।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের পর যাঁরা নাম করেছেন, তাঁদের

মধ্যে আছেন: হুয়েন দিন থি (লেখক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক: 'যোদ্ধদল', 'কৃষ্ণসাগরের গান'), হোয়াং চুং থং ('যুধ্যমান বাসভূমি', 'পাল', 'তরঙ্গশীর্ষে'), চান হিউ থুং ('দক্ষিণী হাওয়া'), সৈনিক কবি লেঃ কর্নেল চিন হিউ ('বন্দুকের নিশানায় ঝুলন্ত চাঁদ')।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পরের যুগে তিরিশ বছরের কম বয়স্ক যাঁরা কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন: সুয়ান কিং ('ট্রেঞ্চ বরাবর'), বাং ভিয়েৎ (উনুনে চড়ানো'), সৈনিক কবি ফাম তিয়েন জুয়াৎ ('জলন্ত বৃন্তে চাঁদ') এবং মেয়ে কবি ফাম থি থান নান (হানয়ের উপকণ্ঠ নিয়ে লেখেন)। আর আছেন চোদ্দ বছর বয়সের তরুণতম কবি চান দাং খোয়া। থাকেন হানয় থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে। তাঁর লেখার বিষয়: ইস্কুলের জীবন, শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক, দেশের প্রতি তাঁর টান, জনযুদ্ধ ইত্যাদি।

বিকেলে গিয়েছিলাম সামরিক মিউজিয়ম দেখতে। উঠোনে স্তূপাকার হয়ে আছে মার্কিনদের অসংখ্য ভাঙা বোমারু বিমান আর বোমার খোল। দিয়েন বিয়েন ফু-র লড়াইয়ের যে ছবি দেখলাম কখনও তা ভুলবার নয়।

৮

চলেছি থান হোয়ায়। মার্চের শেষ। এখনও হাওয়ায় একটা সির সিরে ভাব আছে। দিনটা এখনও খুব ঝকঝকে নয়।

একজন লেখক আমাদের সঙ্গী। যেমন লম্বা তেমনি সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান চেহারা। নাম তাঁর দাও ভু। চল্লিশের কাছেপিঠে বয়স।

হানয় থেকে তিন প্রদেশ পেরিয়ে তবে থান হোয়া। উপকণ্ঠের শিল্পাঞ্চল দেখলে বোঝা যায় হানয় বেশ বড় শহর। শ্রমিকদের সুন্দর সুন্দর নতুন বাস-ভবন। শহর সীমান্তে চেকপোস্ট।

রেল লাইনের পাশ বরাবর রাস্তা। শহর ছাড়তেই মনে হল ঠিক যেন বাংলার গ্রাম। কলা বাগান, তাল, নারকোল, খেজুর, ঝাউ আর আমগাছ। ক্ষেতে জল সেচ করছে। খালে ডোবায় কেউ জাল ফেলে, কেউ ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। চমৎকার রাস্তা। সাইকেল আর বাঁকে করে লোকে কত কী

যে বয়ে নিয়ে চলেছে। বাঁশ, কাঠ, পাথর, চালের বস্তা। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছি। প্রত্যেকেরই বেশ ছিমছাম চেহারা। কারো চোখেমুখে দৈন্ত বা হতাশ্বাসের ভাব নেই। থেকে থেকে দোকানপাট। চুল-ছাঁটার সেলুন। হানয়ের কাছাকাছি বেশ কয়েকটা রেল স্টেশন বোমায় বিধ্বস্ত। দু পাশের লোক হাত নেড়ে নেড়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। যেখানেই নদীনালা, সেখানেই ভাঙা ব্রিজ সারাই হচ্ছে।

দু পাশের ধানক্ষেতে চাষী বলতে সবাই প্রায় মেয়ে। কয়েকটা জায়গায় দেখলাম সৈনিকের পোশাক পরা দু চারজন পুরুষ। ছুটিতে গ্রামে এসেছে। ছুটি ফুরোলেই আবার ফ্রণ্টে চলে যাবে। যতদিন গ্রামে আছে ততদিন চাষের কাজে হাত লাগাবে।

এ শুধু গ্রামে বলে নয়, যারা শহরে আছে তারাও কেউ একদণ্ড বসে নেই। প্রত্যেকেই সব সময় কিছু না কিছু করছে।

রাস্তায় একজনকেও দেখলাম না ঝাড়া হাত পা হয়ে হাঁটতে কিংবা সাইকেল চালাতে। লোকে বাঁকে করে নিয়ে চলেছে ভারি ভারি মোট। সাইকেলে হয় মাল, নয় সামনে পেছনে অতিরিক্ত সওয়ারি। ভারি মাল বওয়ার ব্যাপারে সাইকেল যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে তা বোঝা যায় ভিয়েতনামে এলে। কমরেড তাই বলছিলেন, একটা লরি যত মাল বইতে পারে, আমাদের তেরোটা সাইকেলে তত মাল আমরা বয়ে নিয়ে যাই। লরির অভাব এমনি করে সাইকেল দিয়ে আমরা পুষিয়ে নিচ্ছি।

রাস্তার পাশের সব গ্রামেই মাটির ছাদ দিয়ে ঢাকা গড়খাই। বিমান হানার সময়কার আশ্রয়স্থল।

এখানে গাড়ি টানা, হাল চাষ করা—সবই হয় বলদের বদলে মোষ দিয়ে। পড়ার সময়টা বাদ দিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা মোষ চরায়। গ্রামাঞ্চলে যাত্রী বহনের জন্যে আছে ঘোড়ায় টানা বাস।

রাস্তার ধারে ধারে আর ধানক্ষেতের মাঝখানে সিমেণ্টের তৈরি পোস্টার লেখার জায়গা। যখন যে স্লোগান দরকার, তখন সুন্দর অক্ষরে শুধু সেই স্লোগানটি লিখে দেওয়া হয়।

যেতে যেতে এক জায়গায় অনেক দূর থেকে দেখলাম বিরাট বিরাট অক্ষরে উঁচু পাহাড়ের গায়ে সাদা রঙে লেখা স্লোগান। লেখাটা এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না।

পথে পড়ল মা নদীর ওপর হাম জং ব্রিজ। সারা দুনিয়ার মানুষ আজ এই ব্রিজের কথা জানে। এই সেতু হয়েছে অজেয় ভিয়েতনামের মূর্ত প্রতীক।

দাও ভুর সঙ্গে হেঁটে পার হচ্ছিলাম এই ব্রিজ।

যেতে যেতে দাও ভু বলছিলেন: মার্কিনরা যখন এখানে এসে সমানে বোমা ফেলে যেত, তখনকার একটা দিনের কথা মনে আছে। মেয়ে গ্রাম-রক্ষীদের হাতে গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া এক বিমানের পাইলটকে সেদিন আমি দেখি। চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। ব্রিজের কাছে এসে তার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছিল। চোখ খুলে দিতেই হাম জং ব্রিজের দিকে এমন ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইল যে দেখে মনে হল সে যেন ভূত দেখছে। ঐ রকম প্রচণ্ড হাওয়াই হামলার পর কোনো ব্রিজ যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এটা তার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তার একেবারে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, বোমার পর বোমা ফেলে ব্রিজটাকে সে উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে মা নদীর ওপর সাক্ষাৎ যেটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা হাম জং ব্রিজই বটে। তার সেই ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ তখন যদি তুমি দেখতে। ডান পাশে তাকিয়ে দেখল, নামাল জায়গায় যে পাওয়ার প্ল্যাণ্ট—দেয়াল উড়ে গেলেও সমানে সেখানে কাজ হচ্ছে। কিন্তু আশপাশে যত ঘরবাড়ি ছিল, সমস্তই মাটিতে মেশানো। বুদ্ধিমান এক পাইলটকে সাধারণ মানুষের কাছে সেদিন যে রকম বোকা বনে যেতে দেখেছিলাম, সে রকম আর কখনও আমি দেখি নি।

ব্রিজ পেরিয়ে আবার আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এখান থেকে থান হোয়া শহর খুব একটা দূরে নয়।

ক'বছর আগে মার্কিনরা বোমা ফেলে এই শহরে আর তার উপকণ্ঠে কিভাবে যে মানুষ খুন করেছে আর হাসপাতাল, ইস্কুল, বৌদ্ধ মন্দির, গির্জা ধ্বংস করেছে, রাস্তা থেকে ওপর ওপর তাকালেও তা ধরা যায়।

শহরের পৌরভবনে গিয়ে জানা গেল, আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে শহরের একেবারে উপকণ্ঠে। সেখানে গ্রামের পরিবেশে ভারি সুন্দর একটি বাঙলো। গ্রাম্য অলিগলি পার হয়ে সেই বাঙলো। অতিথিদের বিমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এই ব্যবস্থা। বাঙলোর পেছনে দিগন্তবিস্তৃত চাষের জমি। আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া পাহাড়।

উঠোনে সুন্দর সুন্দর ফলফুলের গাছ। বড় বড় গাছের নিচে বিমান আক্রমণের সময়কার শেলটার। ওপরে মাটির ছাদ। কমরেড ভুকে জিগ্যেস করলাম, মাটির ছাদের ওপর যদি বোমা পড়ে? ভু বললেন, ছাদ মাটিরই হোক আর কংক্রিটেরই হোক, মাথার ওপর বোমা পড়লে কাউকে আর বাঁচতে হবে না। শেলটারে থাকার একটাই সুবিধে; ছুটন্ত স্প্লিণ্টারের হাত থেকে বাঁচা যায়।

সন্ধ্যেটা ভারি মনোরম। বাঙলোর বাইরে সবটাই অন্ধকার। সন্ধ্যের পর থেকে চলতে শুরু করেছে বাঙলোর নিজস্ব ডায়নামো। বন্ধ হবে রাত নটায়। খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে তার আগে। নটার পর লণ্ঠনের ব্যবস্থা। ডায়নামোর শব্দ থেমে গেলে তখন শোনা যাবে ঝিঁঝিঁর আওয়াজ।

খেতে বসে কমরেড দাও ভু বলছিলেন এসব এলাকার মানুষজনদের গল্প। দাও ভু তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। ইটের ভাটির সমবায় আর মার্কিন বোমাবর্ষণ নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলো খুবই জনপ্রিয়। জঙ্গলে পাহাড়ে ছোট ছোট যে সব পায়ে-চলা রাস্তা আছে দাও ভুর সব নখদর্পণে। ইঞ্জিনিয়াররা রাস্তা তৈরির সময় তাঁর এই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়েছে।

কিছুদিন আগে দাও ভু সেই সব অঞ্চলে ঘুরে এসেছেন যেখান দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সরবরাহ যায়। দাও ভুকে আমরা জিগ্যেস করলাম, বিদেশী কাগজে যে হো চি মিন ট্রেলের কথা বলা হয়, সেটা কি সত্যি? দাও ভু বললেন, সত্যি তো বটেই। তবে ওরা ভুল করে যে, হো চি মিন সড়ক তো একটা নয়—অসংখ্য। একটা রাস্তার কথাই ওরা জানে আর কেবলি তার ওপর বোমা ফেলে। কিন্তু আমাদের সরবরাহ পাঠাবার হাজারটা রাস্তা আছে। সে খবর তারা রাখে না।

দাও ভু বলছিলেন:

বীরাঙ্গনা হিসেবে এসব এলাকার মেয়েদের খুব নামডাক। এদিককার মেয়েরা পুরুষদের ঠাট্টা করে বলে, তোমরা ঘরে বসে ছেলেপুলে সামলাও—আমাদের পাঠিয়ে দাও লড়াই করতে। আমরা ও ব্যাটাদের এক হাত দেখে নিই। জানেন, লড়াইতে গোড়ার দিকে পাহাড়ী রাস্তায় রাত্রে কনভয় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুব মুশকিল দেখা দিয়েছিল। আলো জ্বালালেই মার্কিন বিমানগুলো থেকে দেখতে পেয়ে বোমা ফেলত। তখন ঠিক হল অন্ধকারে

সাদা জামা গায়ে দিয়ে একজন আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে হেঁটে যাবে আর কনভয় তার পেছনে পেছনে যাবে। কিন্তু দেখা গেল. তাতে কনভয় তাড়াতাড়ি এগোতে পারে না। তখন ঠিক হল, সাদা জামা পরা গাইড না হেঁটে বনেটের ওপর চড়ে বসে রাস্তা দেখাবে। কিছুদিন পর তারও আর দরকার হল না। পাহাড়ে সেই রাস্তা ড্রাইভাররা এমন সড়গড় করে ফেলল যে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও তারা দিব্যি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে শিখে গেল। তখন মার্কিনরা এক কায়দা বার করল। বিমান থেকে প্যারাশুটে করে তারা চোখ ধাঁধানো আলো নামাতে শুরু করল। আমাদের ড্রাইভাররাও কম যায় না। আলো ঝলসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা পুরোদমে গাড়ি ছোটাতে আরম্ভ করে দিল। আর আলো নিভলেই থেমে যেতে লাগল। ওপর থেকে যারা বোমা ফেলবে তাদের হল মুশকিল। ঝলসানো আলোয় চলন্ত গাড়িতে তারা নিশানা করতে পারে না—সেই সুযোগে কনভয় পাঁই পাঁই করে ছোটে। মার্কিনরা তখন তিতোবিরক্ত হয়ে শয়তানি শুরু করে দিল। অন্ধকারে এলোপাথাড়িভাবে আগে বোমা ফেলে তারপর তারা আলো নামিয়ে দেখে নিতে লাগল বোমাগুলো ঠিক জায়গায় পড়েছে কিনা।

ভু বললেন: যেসব প্যারাশ্যুটে করে বাতি নামানো হত, সেই সব প্যারাশ্যুটের কাপড় লোকে ঘরে ঘরে জমিয়েছে। ঐ কাপড়ে জামা-কাপড় আর ঘরের পর্দা হয়। আমাদের বাড়িতে গেলে দেখবেন সব ঘরের পর্দাই প্যারাশ্যুটের কাপড়ে তৈরি। তাছাড়া প্যারাশ্যুটের সুতো দিয়ে মেয়েরা যে কত কিছু বুনেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি একজন চাষীকে জানি, বাড়িতে সে প্যারাশ্যুট বাতির প্রচুর চোং জমিয়েছে। ঐসব চোং দিয়ে সে তার বাড়ির ছাদ ছেয়ে নেবে। মার্কিনরা যেমন বোমা ফেলেছে– কখনও কখনও এক নাগাড়ে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা--আমরাও তেমনি গুলি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ওদের এরোপ্লেন ফেলেছি। আর সেই এরোপ্লেনের অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে আমরা তৈরি করেছি দরকারী তৈজসপত্র আর শৌখীন আংটি।

ভোর হল মোরগের ডাকে। নাম জানি না কিন্তু অনেক চেনা চেনা পাখি। উঠোনে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছে চড়ুই। বাঙলোর পেছনে ঘাসজমিতে পা ফেলে চলেছে কয়েকটা রাজহাঁস।

সকালে এলেন প্রাদেশিক সরকারের বহির্বিষয়ক দপ্তরের প্রধান কমরেড তুয়েন। আজ আমরা দেখব একটি কারখানা আর একটি কৃষি সমবায়।

একটি সরকারি ফার্মের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তায় আমরা এসে পড়লাম এক পাহাড়ের পাদদেশে। কমরেড তুয়েন বলেছিলেন আমরা যাচ্ছি কারখানা দেখতে। অথচ যেখানে এসে থামলাম তার কাছেপিঠে কারখানার কোনো চিহ্ন নেই। সামনে পাহাড় আর দুপাশে ধু ধু মাঠ।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা ছাউনির নিচে মোটর চলছে। তার সামনে সরু রাস্তা। রাস্তার দুপাশে ফুলগাছ।

রাস্তা ধরে এগোতেই একটা সুড়ঙ্গ। ঢুকবার মুখে এক টুকরো অন্ধকার। আর তারপরই আলোর জৌলুশে আর যন্ত্রের ঘর্ঘরে হাঁ হয়ে গেলাম। সত্যিই তো কারখানা। একেবারে পাহাড়ের গুহার মধ্যে।

ভেতরে যেতেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ছুটে এসে আমাদের স্বাগত জানাল। একে একে আলাপ হল। কারখানার প্রধান হলেন কমরেড তুয়ং। এ কারখানার কর্মবীর হোয়াং তিন্। কারখানার পার্টির সম্পাদক ফাম-ওয়ান কে।

কাজ যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্যে ১৯৬৫ সালে গুহার মধ্যে পত্তন হয় এই কারখানা। এর মধ্যে আছে পাঁচটি ওয়ার্কশপ। চারপাশে লেদ মেশিন আর ড্রিল মেশিনের ছড়াছড়ি। সুড়ঙ্গটা গেছে এঁকে বেঁকে। ভেতরে বিস্তর জায়গা। শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়—সাড়ে চার শো। তার মধ্যে কিছু হো চি মিনের নামে গড়া যুব শ্রমিক বাহিনীর সদস্য। তিন ভাগের দু ভাগ মাঝারি গ্রেডের শ্রমিক। ইঞ্জিনিয়ার আছেন পাঁচজন।

এখানকার কাজ হল যানবাহন মেরামত সংক্রান্ত। কোনো সময় যাতে যন্ত্রাংশের অভাবে পরিবহন ব্যবস্থায় টান না পড়ে তার জন্যে এখানে সমানে

কাজ হয়। এঁদের ওপর যে পরিমাণ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে পরিকল্পিত লক্ষ্যকে এঁরা ছাপিয়ে গেছেন। শুধু কাজ করা নয়, এই কারখানাকে রক্ষা করার ভারও তাঁদের ওপর। বিমান আক্রমণ হলে রাইফেল কাঁধে নিয়ে শ্রমিকরাই হন সৈনিক।

কারখানা রক্ষা করার জন্যে এ পর্যন্ত মোট সতেরো বার শত্রুর সঙ্গে তাঁদের লড়তে হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও এ কারখানার যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম আর লোকজনদের গায়ে একটা আঁচড়ও তারা কাটতে পারে নি। ১৯৬৬ সালে শ্রমিকেরা গুলি করে নামিয়েছে একটি মার্কিন বিমান।

কারখানায় পালা করে দু শিফটে কাজ হয়। প্রত্যেকের কাজের মেয়াদ দিনে আট ঘণ্টা। শ্রমিকদের বাসস্থল গুহার বাইরে লোকালয়ের মধ্যে। কর্মীদের জন্যে আছে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। তিন ভাগের এক ভাগ শ্রমিক পেয়েছে তৃতীয় গ্রেডের শিক্ষা। সেই সঙ্গে আছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব রকম সুযোগ-সুবিধে। প্রত্যেক বছর গরমকালে সমুদ্রের ধারে শিবির খোলা হয়। যাদের শরীর খারাপ কিংবা বয়স বেশি, তাদের পাঠানো হয় স্বাস্থ্য-নিবাসে।

কারখানার আছে নিজস্ব ফুটবল টিম। সেই সঙ্গে নাচের আর গানের দল। কারখানার মধ্যেই আছে শ্রমিকদের গ্রন্থাগার। রাজনীতি ছাড়াও নানা টেকনিক্যাল বিষয়ে এবং নানা পেশা সংক্রান্ত বই এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। অবসর যাপনের জন্যে আছে শ্রমিকদের ক্লাব। মাঝে মাঝে হয় নানা জিনিসের প্রদর্শনী। শ্রমিকদের লেখা আর আঁকা নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রাচীরপত্র বেরোয়। মাসে একবার করে বসে নিজেদের সাহিত্য বৈঠক ; তাতে নিজেদের লেখা গল্প কবিতা সবাইকে পড়ে শোনানো হয়। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে লেখকেরা এসে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

এই সব শুনতে শুনতে হৈ চৈ করে এসে যায় চা, বিস্কুট, টফি আর ফল। বেশির ভাগ শ্রমিকই তরুণ-তরুণী। আমরা আসায় কারখানার কাজ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কাজ চালু রেখে মেশিন থেকে পালা করে কেউ কেউ আসছে। গুহার মধ্যেকার সেই যন্ত্রজর্জর কারখানা হঠাৎ যেন কিছুক্ষণের জন্যে হালকা হাওয়ায় পাখা মেলে দিল। লম্বা টেবিলের সামনে শুরু হয়ে গেল দলবদ্ধ গান। তারপর গান গাইল একজন শ্রমিকের মেয়ে। অপূর্ব গলা।

কমবয়সী একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, তার নাম হিয়েন। একটা লোকসঙ্গীত গাইল দেশে রেলগাড়ী আসা নিয়ে।

আমরা খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা ছিলাম সেই কারখানায়। নিজের দেশে কারখানা আমি কম দেখি নি। কিন্তু কারখানার যে এমন প্রাণ থাকতে পারে, কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি।

ঐ একটি ঘণ্টা আমি যে কী রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, কাউকে তা বলে বোঝাতে পারব না।

কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও না বলে পারছি না যে, অবস্থাপন্ন না হলেও উত্তর ভিয়েতনাম সমাজতন্ত্রের দেশ। প্রত্যেকটি শ্রমিকের মুখ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি- কারো মুখ ভার, কারো শুকনো মুখ আমার নজরে পড়ে নি। শোষণ নেই বলেই তারা প্রত্যেকে ভরপেট খায়, কারো বুকের হাড় বেরিয়ে থাকে না, লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে, হাসিমুখে যেমন কাজ করতে তেমনি দেশের জন্যে জীবনও দিতে পারে।

আমরা যখন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, কারখানার সবাই তখন গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে সমানে হাত নাড়াচ্ছে। পেছন ফিরে হাত তুলতে গিয়ে হঠাৎ আমার গলাটা ধরে এল।

দুপুরে আমরা গেলাম নাম ডান কৃষি সমবায় দেখতে।

কৃষি সমবায়ের আপিস এক বৌদ্ধ প্যাগোডায়। যাঁর ওপর প্যাগোডা দেখাশুনার ভার, তাঁর নাম ফাম চি সুয়ান। ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের কাছাকাছি। এক সময়ে প্রতিরোধ বাহিনীতে লড়েছেন। প্যাগোডাতেই তিনি থাকেন।

একটা কথা আগে বলা হয় নি। ভিয়েতনামে স্ত্রী-পুরুষের নামের কোনো পার্থক্য নেই। ডাকনামের ক্ষেত্রে আমাদেরও কতকটা তাই। যেমন, উমা। নাথ বা প্রসাদ জুড়লে তখন হবে পুরুষবাচক। ভিয়েতনামে সেই রকম নামের মধ্যপদে 'থি' থাকলে তখন স্ত্রীলোক বোঝাবে। কিন্তু 'থি' যুক্ত নাম খুব কম। ফলে, সাধারণত নাম দেখে স্ত্রী-পুরুষ বোঝা যায় না।

প্যাগোডার আপিস ঘর অনেকটা আমাদের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের মত। দেয়ালে কমরেড হো চি মিনের ছবি। স্লোগান লেখা কয়েকটা ব্যানার। খুব ছিমছাম।

কৃষি সমবায়ের যিনি পরিচালিকা, তাঁর নাম হুয়ে। বছর ছাব্বিশ বয়স। মুখে লাজুক ভাব। এখনও বিয়ে হয় নি। ছোট্টখাট্টো মিষ্টি চেহারা।

বসতে বসতেই চা এসে গেল। মিস্ হুয়ে বলতে লাগলেন :

'বেশির ভাগ কমরেডই এখন এখানে নেই। খে-শানের যুদ্ধের পর যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমাদের কর্তব্য ঠিক করার জন্যে একটা সম্মেলন হচ্ছে—কমরেডরা সেখানে গেছে। আপনাদের আসবার কথা ছিল একটায়। অপেক্ষা করে করে তারপর ভাবলাম আজ আর হয়ত এলেন না। ফলে, সমবায়ের কাজে চলে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।

'শহর ছাড়িয়ে হাম জং ব্রিজ থেকে এক কিলোমিটার দূরে আমাদের এই সমবায় খামার। চাষবাস তো আছেই, তাছাড়া আমাদের একটা বড় কাজ হাম জং ব্রিজ রক্ষা করা। গত চার বছরে আমরা একশোটা যুদ্ধ করেছি।

'আজ বেলা হয়ে গেছে। সময় নেই। তাই শুধু প্রথমবারের আর শেষবারের লড়াইয়ের গল্প আপনাদের বলব।

'আমাদের গ্রামরক্ষী বাহিনীতে ছেলে মেয়ে দুই আছে। গণফৌজের সঙ্গে যুবশক্তি আর শ্রমিকশক্তি মিলে আমরা দিনরাত যখন যে অবস্থাতেই থাকি লড়াইয়ের জন্যে তৈরী। আমাদের লড়াইয়ের দুটি ফ্রন্ট। একটি হল হাম জং ব্রিজ থেকে চারশো মিটার দূরে ; তার কাজ শত্রুর প্লেন ঠেকানো। দ্বিতীয়টি হল ব্রিজ থেকে ছ শো মিটার দূরে, তার কাজ প্লেনগুলো যখন পালাবে তখন খতম করা।

'হাম জং ব্রিজের প্রথম লড়াই হয় ১৯৬৫ সালে। ৩ এপ্রিল।

'তখন সকাল আটটা। ভোর থেকেই আমরা ধানক্ষেতে কাজ করছি। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে চলে গেলাম যে যার ফ্রন্টে। প্রথমে আসে দুটো প্লেন। তাদের একটিকে আমরা কামান দেগে মাটিতে নামাই। তারপর উঁচু নিচু আর মাঝারি স্তর দিয়ে সমানে উড়ে আসতে থাকে মার্কিন বোমারুর দল। নানাভাবে চোখে ধুলো দেওয়া তো আছেই, সেই সঙ্গে রোদ্দুরে চোখ ঝলসে যাওয়ায় আমাদের নিশানা ভুল হয়ে যাচ্ছিল। ফলে, তারা ব্রিজের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলে। কিন্তু সমানে তিন ঘণ্টা ধরে দুটো ফ্রন্ট থেকে আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করি।

'আমাদের নৌবাহিনী মোতায়েন ছিল মা-নদীতে। আমরা তাদের

লোক যোগাই গোলাগুলি বয়ে দেবার জন্যে। আমাদের লোক-জনেরা গোলাগুলির সাইজ জানত না। ফলে, একটু মুশকিলে পড়ে। সেদিন সারা রাত্তির ধরে গোলাগুলির ব্যাপারে তাদের তালিকা দেওয়া হয়। আমাদের মিলিশিয়ায় উনিশ বছরের একটি মেয়ে ছিল, তার নাম নো থি তুয়েন। সেদিন সে একা ঘাড়ে করে আড়াই মণ ওজনের গুলিগোলা বয়ে ছিল। শুধু ভার বওয়া তো নয়। কাজটা এমনিতেই ছিল খুব বিপজ্জনক। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে বোমারু বিমান। তারা ব্রিজের ওপর বোমা ফেলছে। নোঙর করা নৌকো থেকে ঘাড়ে করে গুলিগোলা বয়ে আনতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই প্রাণ হারানোর ভয় ছিল।

'তাছাড়া ডাঙার ওপর লরির পর লরিতে থাকত গুলিগোলা। এই যে চি সুয়ানকে দেখছেন—এই প্যাগোডা দেখাশুনার ভার যাঁর ওপর—এঁর ওপর ছিল লরির গুলিগোলা ঢেকে রাখার ভার। মার্কিন বিমান থেকে যখন মুষলধারে বোমা আর গুলিগোলা পড়ছে, চি সুয়ান বার বার মাটিতে উল্টে পড়েও গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে লরিগুলো ঢেকে দিয়েছেন। নিজের কম্বল আর মশারি এনে দিয়েছেন আহত সৈন্যদের জন্যে।

'প্রথম দিনের লড়াই চলে তিন ঘণ্টা ধরে। লড়াই যখন চলছে তখন হঠাৎ একটা সময়ে দেখা গেল, চালবোঝাই দুটো নৌকো নোঙর ছিঁড়ে নদীর মাঝখানে চলে গেছে। তার ফলে, চালের বস্তাগুলো অচিরে জলে তো ডুববেই তাছাড়া মাঝ নদীতে নৌকো থাকায় আমাদের নৌবহরের পক্ষে চলাচল করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। তখন আমাদের মেয়েবাহিনীর একজন—হোয়াং সুয়ান ভিয়েন—আর তার সঙ্গে হুয়েত সুয়ান কাদ্ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নদীতে। তারা সেই প্রচণ্ড বোমাবৃষ্টির মধ্যে সাঁতার কেটে নৌকো দুটোকে টেনে নিয়ে এল ঘাটে। এর ফলে, নৌবহরের পক্ষে শুধু যে রাস্তা খোলসা হল তাই নয়—আঠারো টন চাল জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচল।

'আমাদের লড়াইয়ের জায়গা, যেখানে বসানো থাকে বিমানবিধ্বংসী কামান—তাকে আমরা বলি 'ফ্রন্ট'। আমাদের ফ্রন্ট থেকে মাত্র একশো মিটার দূরে শত্রুপক্ষের বোমা আর রকেট এসে ফাটে। কিন্তু তার জবাবে প্রথম দিনের লড়াইতেই আমরা ওদের সতেরোটা বিমান গুলি করে নামাই।

'প্রথম দিনের লড়াই শেষ হওয়ার পর আমরা সভা ডাকি। প্রথম দিনের লড়াইয়ের ভুলত্রুটিগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আমরা খুঁটিয়ে আলোচনা করি।

শত্রুপক্ষ পরের দিন আরও বেশি মরীয়া হয়ে আক্রমণ করল। প্রথম দিন লড়াই করে আমাদেরও মনের জোর বেড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের তিন ঘণ্টার লড়াইতে আমরা ওদের তিরিশটা বিমান ঘায়েল করি।

'এই দুদিনের লড়াইতে আমাদের একজনও জখম হয় নি কিংবা মরে নি। আমাদের হাতের মার খেয়ে এরপর ওরা কিছুদিন চুপচাপ থাকল। আমাদের মাঠের কাজ আর কারখানার কাজ আবার পুরোদমে চলতে লাগল। সাত সপ্তাহ পরে ওরা আবার এসে হানা দিল ২৬ মে।

'কাঁধে রাইফেল নিয়ে আমরা তখন ধানক্ষেতে নতুন ফসল কাটছি। সকাল আটটা নাগাদ সাইরেন বাজতেই আমরা সব কাস্তে ফেলে রেখে লড়াই করতে ছুটলাম। সেদিন সারা দিন তিন বার বিমান হানা হয়।

'নদীর ঠিক ধারেই আমাদের ফ্রণ্ট। আমাদের পাশে নৌবাহিনীও মোতায়েন হয়ে গেল। ঐদিন মার্কিন বিমানগুলো ব্রিজ বাদ দিয়ে নৌবাহিনীর নৌকোর ওপর চড়াও হল। আমাদের মিলিশিয়ার সঙ্গে নৌবাহিনীর ভাল যোগাযোগ ছিল। হঠাৎ নৌকো থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। আহতদের জন্যে ওদের ফার্স্ট-এড দরকার।

'আমাদের জেলা-মিলিশিয়ার প্রধান ছিলেন মহিলা কমরেড নুয়েন থি হাং। তিনি তক্ষুনি দুজনকে নৌকোয় চলে যেতে বললেন। কিন্তু হাঙের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর ওপর একটা রকেট এসে পড়ল। জখম হয়ে হাং নদীতে পড়ে গেলেন। কিন্তু তবু তিনি জল ভেঙে ঠেলে উঠলেন ডাঙায়। জখম হয়েও হাং চাইলেন লড়াই চালিয়ে যেতে। আমরা তাঁকে জোরজার করে সরিয়ে দিলাম।

'এই সময় ঘাটে কোনো নৌকো ছিল না। আমাদের মেয়েবাহিনীর নো থি তুয়েন আর লে থি জুং—দুজনে জলে লাফিয়ে পড়ে নৌবাহিনীর নৌকোর দিকে সাঁতার কেটে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বোমার ধাক্কায় নদীর জলে তোলপাড় কাণ্ড চলেছে। তারা সাঁতার কেটে খানিকটা এগোয়, আবার ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে তারা নৌবাহিনীর নৌকোয় পৌঁছুল।

'নৌবাহিনীর তখন গোলা ছোঁড়ার লোকের খুব দরকার। কেন না তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর লোকজনেরা সকলেই প্রায় বোমার আঘাতে ঘায়েল। গ্রামের এক বুড়ো নো খো লান। তার চার ছেলেই নৌবাহিনীকে সাহায্য

করবার জন্যে এগিয়ে গেল। সবচেয়ে যে ছোট, তার নাম সাউ। বড় ভাইরা তাকে সঙ্গে নিতে চান নি। কিন্তু কিছুতেই সে শুনল না। সাপ্ ছিল সবার বড়। সে হল গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান। চার ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিল থুক আর কুয়াং। ফার্স্ট-এডের কাজ সেরে তুয়েন আর জুং ওদের সঙ্গে গুলিগোলা যোগাবার কাজে লেগে গেল। এইভাবে আমাদের আটজন লোক গেল নৌবাহিনীর গোলা ছোঁড়ার কাজে।

'তৃতীয় বারে বিমান হানা শুরু হতেই নৌবাহিনীর মোটর বোট হাম জং ব্রিজের কাছে চলে গেল। এই সময় প্রথম বোমাতেই জখম হল ছোট ভাই নো থো সাউ। ওর বড় তিন ভাই ওকে চলে যেতে বলল। সাউ রাজী হল না। এই সময় আরেকবার বোমা পড়ল। এই বোমায় সাউ মারা গেল। বাকি তিন ভায়ের মধ্যে সাপ্ আর দাক্—দুজনে আহত হয়েও লড়াই চালিয়ে গেল। আমাদের মেয়ে বাহিনীর লে থি জুং—যে সাঁতার কেটে ফার্স্ট-এড দিতে গিয়েছিল—বোমার পেলেটে তার একটা শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। নিজের শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে বেঁধে নিয়ে তবু সে লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাঁধনটা শক্ত না হওয়ায় কিছুতেই রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। জুং তখন কুয়াংকে বলল পা দিয়ে শক্ত করে ক্ষতস্থান চেপে ধরতে। কিন্তু তাতেও রক্ত পড়া বন্ধ করা গেল না। শেষ পর্যন্ত জুং মারা গেল।

'এই দিনের লড়াইতে আমাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হল। কিন্তু তবু আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও লড়াই বন্ধ করি নি। নৌবাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা হাম জং ব্রিজ রক্ষা করি। ঐ দিন আমরা গুলি করে দুটো মার্কিন বিমান নামাই।

'চার বছর ধরে মার্কিনরা বোমার পর বোমা ফেলেছে। কখনও দিনে কখনও রাত্রে। আমাদের মিলিশিয়া একশো বারেরও বেশি লড়েছে। লড়াই করলেও কোনোদিনই আমাদের মাঠের কাজ বন্ধ থাকে নি। ওরা দিনে বোমা ফেললে কাজ করেছি রাত্রে আর রাত্রে হানা দিলে কাজ করেছি দিনে। এই ভাবে আমরা সমানে ফসল ফলিয়েছি। বোমায় নষ্ট হওয়া ফসল মাটি থেকে কুড়িয়ে আমরা গোলায় তুলেছি। বোমা পড়ে মাঠে বড় বড় গর্ত হয়েছে। সেই গর্ত বুজিয়ে মাটি দিয়ে সমান করে সেখানেই আবার আমরা ফসল ফলিয়েছি। কিছু কিছু গর্ত বোজানো যায় নি। কিছু কিছু গর্ত বর্ষার জলে পুকুর হয়ে গেছে। সেখানে আমরা মাছ চাষ করেছি।

'বিমান হানা যখন নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, তখন বিমান হানার মধ্যেও আমাদের মাঠের কাজ সমানে চলেছে। ধানক্ষেতে কাজ করার সময় গোলাগুলির জখম যাতে বেশি না হয়, তার জন্যে পিঠের ওপর আমরা বেতের কুলো বেঁধে রাখতাম। চার বছরে মাঠে কাজ করতে বোমার টুকরোয় জখম হয়েছে মোটে ছজন আর মারা গেছে একজন।

'আমাদের ছেলেরা সব লড়াইতে গেছে। ফসল ফলানোর ভার নিয়েছি আমরা মেয়েরা। লড়াইয়ের আগে এদেশের মেয়েরা কখনও চাষের কাজ করত না। কিন্তু চাষের কাজ না করে আজ আমাদের উপায় নেই। দেশ বাঁচাবার জন্যে যারা লড়াই করছে, তারা খাবে কী? তাই আমরা শুধু ফসল ফলাই না, ফসল বাড়াই। যুদ্ধের আগেকার পুরুষ চাষীদের আমরা টেক্কা দিয়েছি। এখন আমরা প্রতি হেক্টর (প্রায় আড়াই একর) জমিতে পাঁচ টন করে (প্রায় ১৪০ মণ) ধান ফলাচ্ছি।

'আমাদের যে সমবায়, তার লোকসংখ্যা ১,৩০০। প্রত্যেকের জন্যে মাসে চালের বরাদ্দ ১৯ কেজি করে। প্রতি হেক্টর ধানের জমি পিছু ৫টি করে শুয়োর পোষা হয়। এককটি শুয়োরের ওজন ৫০ কিলো। মোট গ্রামবাসীর মধ্যে তিন শো জন ধান ক্ষেতে কাজ করে। গত বছর আমাদের সমবায়ের ওপর যে লেভি ধার্য করা হয়েছিল, আমরা বেশি খেটে তার দেড়গুণেরও বেশি সরকারকে দিয়েছি।

সরকারের কাছে ধান-চাল আর শুয়োর বেচে আমরা টাকা পাই। ধার্য পরিমাণের পঞ্চাশ ভাগ বেশি পূরণ করলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার মেলে। প্রত্যেকটি পরিবার যা শুয়োরের মাংস উৎপাদন করে, তার অর্ধেক নিজেদের জন্যে রেখে বাকি অংশ সরকারের কাছে বেচে। উৎপাদন বাড়ালে সরকার পুরস্কার দেয়। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের বাছাই করে কৃষিবিজ্ঞান শেখার জন্যে পাঠাই। সরকার আমাদের কৃষিকাজের জন্যে নানা রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে সরকার আমাদের সমবায়কে নানা রকম সুযোগ-সুবিধে দেয়।

'সরকারের কাছ থেকে আমাদের সমবায় পেয়েছে যৌথভাবে বীরত্বের সম্মান। আমাদের মো থি দিয়েন 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে প্রথম পর্যায়ের দুটি অর্ডার পেয়েছে; তাছাড়া তার পরিবারের চারজন ভাইই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। কমরেড জুং আর কমরেড হাং—দুজনেই শৌর্যবীর্যের জন্যে দ্বিতীয়

পর্যায়ের পুরস্কার পেয়েছে। আমাদের এই একটি সমবায় থেকেই পুরস্কারের সংখ্যা আট আর পুরস্কৃতের সংখ্যা সাত।'

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। প্যাগোডায় সমবায়ের আপিস ঘরে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। একটু ঘুরে গ্রামটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া দু একটা ছবিও তোলা দরকার।

মো থি দিয়েন গেছে শহরে সভায় যোগ দিতে।

হুয়ে বলল, চলুন—আমাদের আরেক বীরাঙ্গনা হাংকে দেখিয়ে আনি। কাছেই হাংদের বাড়ি। দিন কয়েক হল ওর ছেলে হয়েছে, বাড়ি থেকে তাই বেরোতে পারছে না।

প্যাগোডা থেকে দুশো হাত দূরে সিমেণ্টের তৈরি রাইফেল হাতে একদল যোদ্ধার মূর্তি। তার সামনে দিয়ে গেছে রাস্তা। রাস্তাটা পেরোলে নদীর বাঁধ। সেখান থেকে হাম জং ব্রিজ দেখা যায়।

মূর্তিটাকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকে ঘুরলেই হাংদের ইংরিজি এল্ ছাঁদের পাকা বাড়ি। সামনে ছোট্ট একটু উঠোন। বেড়ার ধারে ধারে ফুলের গাছ।

গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলে ছুটে এসেছে। হাং বেরিয়ে এল চেঁচামেচি শুনে। হাং যেমন লম্বা, দেখতেও তেমনি সুন্দর। ভেতরে নিয়ে গেল ওর বাচ্চা দেখাতে। বাচ্চার বয়স এক মাসও হয় নি। হাঙের বিয়ে হয়েছে বছর খানেক আগে। ওর স্বামী সৈনিক। সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছিল ছেলেকে দেখতে। দিন তিন চার আগে চলে গেছে ফ্রন্টে।

ফেরবার সময় আমাদের দোভাষী সুয়েন বলল, ছবি কিন্তু একটাও ওঠে নি। ফিল্ম ফুরিয়ে গিয়েছিল।

শুনে কি যে মন খারাপ হল বলার নয়।

সন্ধ্যেবেলা সরকারি রেস্টহাউসে ফেরবার সময় শহরের রাস্তা ছেড়ে এসে অন্ধকারে মনে হল সত্যিই গ্রামে এসেছি। ন'টায় ডায়নামো বন্ধ হওয়ার আগে খাওয়াদাওয়ার পার্ট চুকিয়ে ফেলতে হবে।

ভিয়েতনামে আসার পর থেকে একটা কথা কেবলি মাথায় ঘুরছে। দেশে ফিরে কাগজে লিখে, সভা করে এখানকার কথা বলতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, যা দেখছি কেমন করে তা ভাষায় প্রকাশ করব?

তার চেয়ে, আমার কাছে যদি চলচ্চিত্র তৈরির উপকরণ থাকত, কী ভাল

যে হত বলার নয়। গ্রামে কিংবা শহরে একটি লোকও যে বসে নেই, একটি লোকেরও যে না খেতে পাওয়া হাড় জিরজিরে চেহারা নয়, সবাই যে কি শান্ত আর নম্র—এসব তো বলে বোঝানো যায় না।

রাস্তা দিয়ে যে কনভয় যায়, গ্রামে গ্রামে বিমানধ্বংসী যে সর্বাধুনিক কামান, কৃষকের যে ঘরবাড়ি, প্রত্যেকটি মানুষের যে ছিমছাম চেহারা, হাসিখুশি ভাব—এসব আমি ভাষা দিয়ে কেমন করে ফুটিয়ে তুলব? ভিয়েতনামের মানুষ কিভাবে সমাজতান্ত্রিক জগতের বলে বলীয়ান হয়ে লড়ছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

আরও একটা দিক আছে। হাজার ছবি তুলে দেখালেও যেটা আমি কিছুতেই ফোটাতে পারব না, সেটা হল আমার মনের অবস্থা। উত্তর ভিয়েতনামে এসে অবধি একটা প্রচণ্ড তোলপাড় চলেছে আমার মনের মধ্যে। আমার কেবলি মনে হচ্ছে, ফিরে গিয়ে নিজের জীবনটাকে নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে। সকলে মিলে লাগলে আমরাও পারি আমাদের দেশকে নতুন-ভাবে গড়ে তুলতে। তার জন্যে দরকার জাতীয় ভিত্তিতে দৃঢ়মূল আন্তর্জাতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ পার্টি—যে পার্টি আছে বলে আজ ভিয়েতনাম হতে পেরেছে অজেয় মানুষের বাসভূমি।

১০

প্রাতরাশের পর গ্রামে চলেছি। পাহাড়ের ধার বরাবর রাস্তায় পূর্তকর্মীদের ছাউনি। সামনের মাঠে দুটো ভলিবলের কোর্টে জোর খেলা চলছে। রবিবারের সকাল আজ—এতক্ষণে মনে পড়ল। দাও ভু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—ঐ দেখ, বোমা পড়ার চিহ্ন। রাস্তার ঠিক পাশে দুটো প্রকাণ্ড গর্ত।

বিমানধ্বংসী কামানের ওপর বিছিয়ে দেওয়া জাল। রক্ষী ফৌজ অষ্টপ্রহর তৈরি। কিন্তু সামরিক আর বেসামরিক আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো তফাৎ নেই। জনযুদ্ধের নিয়মই তাই।

আবার সেই হাম জং ব্রিজ। একটা ট্রেন আসছিল ব'লে একটু দাঁড়াতে

হল। এবার কিন্তু হেঁটে নয়। গাড়িতে বসেই আমরা ব্রিজ পার হলাম। ব্রিজ পেরিয়ে রেল লাইনের পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা।

অনেকখানি যাওয়ার পর ডানদিকে ঘুরে চওড়া কাঁচা রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে দেখলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য। দুপাশের বড় বড় গাছের নিচে দু দুটো বিশাল সামরিক গাড়ির মাথায় চাপানো রয়েছে রকেট। মনে পড়ল, মস্কোর রেড স্কোয়ারে নভেম্বর দিবসের প্যারেডে ঠিক এই রকমেরই রকেট একবার দেখেছিলাম।

দুপাশে গ্রামের ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত। সারা রাস্তা জুড়ে সারবন্দী তালখেজুর আর নারকোল গাছ। গাছভর্তি ফল। দেখলেই বোঝা যায়, গাছ থেকে ফল চুরির কথা বোধ হয় কারো মাথায়ই আসে না।

শেষ পর্যন্ত হোয়া লক গ্রামে আমরা পৌঁছুলাম। আমাদের গ্রামগুলোর মতন। তবে ঘরবাড়ি পোশাকপরিচ্ছদ কোনো কিছুতেই দৈন্যদশা নেই। আগেকার মাটির দেয়ালের বদলে এখনকার সব বাড়িরই দেয়াল ইঁটের তৈরি। খড় ছাড়াও আছে টিন আর টালির ছাউনি।

একদিন রেস্টহাউসে দাও ভু-কে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, অনেক নতুন তৈরি বাড়িতেও দেখছি খড়ের চাল। কিন্তু বোমার আগুন লেগে তাতে পুড়ে যাওয়ার ভয় তো খুব বেশি।'

দাও ভু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সে ভয় তো আছেই। তবে সব গ্রামেই রয়েছে আগুন নেভানোর দল। আগুন লাগলেই তক্ষুনি তা নিভিয়ে ফেলা হয়।'

গ্রামের রাস্তা কাঁচা হলেও গাড়ি বেশ স্বচ্ছন্দে চলে। দু পাশের বাড়িগুলো থেকে ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখে হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। সবাই বেশ সুস্থসবল। চোখে-মুখে আনন্দের আভা।

গ্রামের এক প্রান্তে যে বাড়িতে সমবায়ের আপিসঘর, সেখানে গিয়ে আমরা বসলাম। যথানিয়মে আতিথেয়তার অঙ্গ হিসেবে সবুজ চা, টফি, আর সিগারেট এসে গেল। আমি বললাম, একটু ঠাণ্ডা জল দিন। ঠাণ্ডা জল যে খেতে চাইছি, দোভাষীকে এটা বোঝাতে একটু বেগ পেতে হল।

তারপর গ্রামের বয়স্ক কমরেড চিন উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এ গ্রামের মিস্ মাই বয়সে তরুণী হলেও এ অঞ্চলের সর্বজনমান্য নেত্রী। এবার তাঁকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় পরিষদে পাঠানো হচ্ছে। মিস্ মাই-এর সঙ্গে আমাদের দেখা হল না, কারণ তিনি তখন বিশেষ কাজে

পাহাড় অঞ্চলে গিয়েছিলেন। দেয়ালের গ্রুপ ফটোগুলোতে ছিল মিস্ মাই-এর ছবি। ভারি সপ্রতিভ চেহারা। মুখে সেই সঙ্গে ভিয়েতনামী মেয়েদের স্বভাবসুলভ সলজ্জ ভাব।

প্রবীণ কমরেড চিন কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন:

এই ক'বছরের যুদ্ধে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি কমরেড হো চি মিনের কথা যে, স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচা যায় না। লড়াই করে আমাদের মনের জোর বেড়ে গেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামকে আমরা সাহায্য করছি এবং করে যাব। মার্কিনরা যত শক্তিধরই হোক, এ দেশ থেকে তাদের হটতেই হবে। এ গ্রামে আমরা সবাই ঘরে-বাইরে একমন একপ্রাণ হয়ে লড়ছি। পুরুষের দল যখন গ্রাম ছেড়ে ঝেঁটিয়ে চলে গিয়েছে যুদ্ধে, মেয়েরা কাঁধে তুলে নিয়েছে চাষবাসের ভার। তারা উৎপাদন বাড়িয়েছে। মেয়েদের নিয়ে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে উঠেছে। পার্টি কমিটি তাদের শিক্ষা দিয়েছে। তাদের হাতে হাতে আজ রাইফেল। নিজে হাতে গুলি করে তারা মার্কিন জেট প্লেন ফেলে।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তি বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর মার্কিনরা থান হোয়া'র ওপর বোমা ফেলতে শুরু করে। চৌষট্টি থেকে আটষট্টি—এই চার বছরে তারা নৌবহর আর বোমারু বিমানের সাহায্যে একশো কুড়িবার আক্রমণ চালায়। বোমা ফেলে দু হাজার ছ শো রকমের। আমাদের একটি গ্রাম তারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। শত শত মিটার বাঁধ, ডজন ডজন হেক্টর ধানক্ষেত তারা নষ্ট করে।

'আমাদের মেয়েদের হাতের মার কেমন মার্কিনরা তা বিলক্ষণ বুঝেছে। দু দুটো বিমান বিধ্বস্ত হওয়া ছাড়াও ওদের আরও অনেক বিমান সাংঘাতিক-ভাবে জখম হয়ে ফিরে গেছে। আমাদের গ্রামরক্ষী বাহিনী বীরত্বের জন্যে প্রথম আর তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানপত্র পেয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন বাড়ানো আর সম্পত্তি রক্ষার জন্যেও আমাদের সরকারের প্রশংসা পেয়েছে। যুদ্ধের মধ্যেও আমরা সমানে ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছি। তিন বছরের মধ্যে প্রতি হেক্টরে সাড়ে তিন টন থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে আমরা পাঁচ টন করেছি। বাড়তি দশ টন চাল আমরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগ্রামী ভাইদের দিয়েছি। আমাদের মাথাপিছু অন্নের বরাদ্দও বেড়ে গেছে। আমাদের এ গ্রামে কৃষিই হল প্রধান উৎপাদন। লড়তে গিয়ে আমাদের শুধু যে উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে

তাই নয়—সামাজিক আর সাংস্কৃতিক দিক থেকেও উন্নতি ঘটাতে হয়েছে। আমরা নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করেছি, রোগ-ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থা করেছি, নলকূপ বসিয়েছি, নতুন নতুন গাছ লাগিয়েছি।'

এসব শুনতে শুনতে আমি তেষ্টায় ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। শেষ-কালে আর থাকতে না পেরে বললাম, কই, খাবার জল কোথায়?

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওরা তখন প্রায় ফুটন্ত জল এনে আমার সামনে হাজির করল। আমি বললাম, ঠাণ্ডা জল চাই। ওরা বলল, একটু রেখে খাও—তাহলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এতক্ষণে হুঁশ হল, ফোটানো জল ছাড়া ঠাণ্ডা পানীয় জল ওরা কিছুতেই আমাকে দেবে না। (হানয়ে হোটেলের ঘরে প্রকাণ্ড ফ্লাস্কে অতটা করে ফুটন্ত জল থাকে শুধু যে চায়ের জন্যে নয়, এটা বুঝতে দেরি হওয়ায় আমাকে বেশ কয়েক দিন রোগ-জীবাণুর কবলে পড়তে হয়েছিল। মার্কিনরা শুধু তো বোমা ফেলে নি, ভিয়েতনামের জল-হাওয়াতেও যত রকমের পারে বিষ ঢেলেছে)।

সারা দেশের মানুষ কিভাবে যে নিজেদের চিরাচরিত অভ্যেসগুলো বদলে ফেলেছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আগে ম্যালেরিয়া আর আমাশা ছিল এদেশের লোকের সঙ্গের সাথী। এখন মশা থাকলেও ম্যালেরিয়া আর নেই। তার কারণ, প্রত্যেকেই এখন মশারির ভেতর শোয়। জল ফোটানো আর মাঠের বদলে পায়খানার ব্যবস্থা হওয়ায় আমাশাও এখন বিরল।

এর পর গ্রামরক্ষী প্লেটুনের সহনেত্রী উ থু তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। উ থু দেখতে বেঁটেখাটো। এখনও বিয়ে হয় নি। বাঙালি মেয়েদের মতই মুখে সলজ্জ ভাব।

বললেন, 'মার্কিনরা চৌষট্টি থেকে আটষট্টি সাল অবধি এদেশে একের পর এক বিমান হামলা চালায়। সাতষট্টি সালে শ্রমিক যুব সংস্থা একটা সভা করে মিলিশিয়া গড়ে তোলার ডাক দেয়। একশো জন মেয়ে তাতে সাড়া দিয়ে চিঠি দেয়। কিন্তু পার্টি ঠিক করে, বাছাই করা চৌদ্দ জনকে নিয়ে রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হবে। প্রাদেশিক সংস্থা তখন আমাদের চৌদ্দ জনকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করে। ট্রেনিং শেষ হতে যখন আর মাত্র পাঁচদিন বাকি, ঠিক তখনই মার্কিনরা এ অঞ্চলে বিমান হামলা শুরু করে। আমরা তিন দিনের মধ্যে চারটি রণস্থল বানিয়ে ফেলি। আমাদের প্লেটুনের নেত্রী হয় মাই। আমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখি।

'প্রথম দিনের লড়াইতে আমরা মোটেই সুবিধে করতে পারি নি। তার কারণ, শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আমাদের লড়াইতে নেমে পড়তে হয়েছিল। এরপর আমরা একসঙ্গে বসে নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করি। আমরা বুঝতে পারি যে, অস্ত্রগুলো এখনও আমরা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারি নি। এর পরের দিনের লড়াইতেও আমরা যুৎ করতে পারলাম না। তখন রণস্থলগুলো বদলে ফেলে বিমান ওড়ার পথ অনুযায়ী আমরা সাজাই।

এরপর ছ দিনের দিন সকালে মার্কিন বিমান আবার এসে হানা দেয়। 'এ' আর 'জে' টাইপের তিনটি প্লেন। তারা আসে বোমা ফেলার নিশানা ঠিক করতে। আমরা তাদের কিছু বলি নি। দুপুর দুটোয় আবার তারা ফিরে আসে। প্রথম প্লেনটি ছ'টা বোমা ফেলে চলে যায়। তখনও আমরা চুপচাপ। এরপর আসে দ্বিতীয় প্লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন ঝাঁকে সাতাশটা গুলি ছুঁড়ি। জেট প্লেনে আগুন ধরে পড়ে যায়। আমরা যারা ফ্রন্টে ছিলাম আর মাঠে যারা কাজ করছিল—সবাই হৈ হৈ করে নাচতে শুরু করে দিই। সারা গ্রাম জুড়ে সেদিন উৎসবের ধুম পড়ে যায়।

'আবার আমাদের সভা বসে। লড়াইয়ের কৌশল আরও ভাল করবার কথা আমরা ভাবতে থাকি। গ্রামের লোকজনেরা দলে দলে এসে অভিনন্দন জানাতে থাকে। তারা কেউ নিয়ে আসে মুরগি, কেউ নারকোল, কেউ কেক-মিঠাই।

'এরপর সাড়ে চার মাস মার্কিনপক্ষ আর বিশেষ টঁ্যা ফোঁ করে নি। আমরা তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকি নি। নিয়ম করে রোজ আট ঘণ্টা আমরা অস্ত্র চালনা অভ্যেস করেছি। আমাদের বারো পয়েন্ট সাত মিলিমিটার মেশিনগান আছে তিনটি। তাছাড়া প্রত্যেকেরই আছে রাইফেল। আমরা এমন ভাবে ট্রেনিং নিই যাতে সবাই সব কিছু ছুঁড়তে পারে—কেউ মারা গেলে তার স্থান যেন শূন্য না থাকে। সেই সঙ্গে টহলদার প্লেনগুলোর গতি প্রকৃতি বুঝে সেই মত আমরা রণস্থল বদলাতে থাকি।

'এর পরের লড়াইটা শুধু যে আমাদের মনে আছে তাই নয়, ক্যামেরার ছবিতেও ধরা আছে। সেদিন ছিল ২রা নভেম্বর। চীন আর জাপান থেকে একদল সাংবাদিক সেদিন আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছিলেন। এমন সময় এরোপ্লেনের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা রণস্থলে ছুটে যাই। এক ঝাঁক

এফ-ফোর-এইচ প্লেন এসে বোমা ফেলে। আমরা তাদের একটিকে গুলি করে নামাই। সাংবাদিকদের মুভি ক্যামেরায় পুরো দৃশ্যটার ছবি ওঠে।

'এরপর আমাদের মনের জোর খুব বেড়ে যায়। এতদিন লড়াই করলেও আমাদের অনেকেরই বিদ্যার দৌড় খুব বেশি ছিল না। তখন আমরা ঠিক করলাম ফ্রন্টের গড়খাইয়ের মধ্যে ক্লাস বসাব। যিনি পড়াবেন তিনি থাকবেন ওপরে। পড়ানো আর আকাশে নজর রাখা—এ দুটো কাজ তাঁর। এই ভাবে গড়খাইতে ইস্কুল বসার ফলে আমাদের অনেকেই মাধ্যমিকের পাঠ শেষ করে ফেলে।

'এদিককার বাঁধ, ফেরীঘাট আর মাঠভর্তি ধান—সাধারণত এগুলোই ছিল মার্কিনদের বোমা ফেলার জায়গা। হাসপাতাল, ইস্কুল বাড়ি, গির্জা, প্যাগোডা—এসবও হয়েছে তাদের লক্ষ্যস্থল। আমরা অনেক সময় তাদের বোকা বানাতাম। গাছের ডালে দড়ি বেঁধে আমরা যখন গাছগুলো ঝাঁকাতাম, ওরা সেগুলোকে ভাবত গাছপালাঢাকা চলন্ত সামরিক গাড়ি। তার ওপর ওরা ওদের বোমাগুলো ঢেলে দিয়ে যেত।

'আমরা যখন পাকাপোক্ত হলাম, তখন আমরাই নিলাম গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েদের যুদ্ধবিদ্যা আর অস্ত্রবিদ্যা শেখানোর ভার—যাতে আমরা খুন-জখম হলে ওরা আমাদের জায়গা নিতে পারে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রন্ট চাষের ক্ষেতের ঠিক পাশে—মাঠে কাজ করতে করতে চট করে রণস্থলে পৌঁছুনো যায়। লড়াই চাষবাস আর পড়াশুনো সমস্তই এক জায়গায় থাকায় আমাদের কিছুতেই ব্যাঘাত হয় নি। তার ফলে, যখন আমরা লড়াই করেছি তখন আমরা ধানের উৎপাদন বাড়িয়ে হেক্টর পিছু পাঁচ টনে তুলেছি। আবার সেই সঙ্গে লেখাপড়াও শিখেছি।

'আমরা কখনও আত্মসন্তুষ্ট হই নি। সব সময় চেষ্টা করেছি আত্ম-সমালোচনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে। আমরা এটা জেনেছি যে, আমাদের এতদিনের যে সংগ্রাম তার অন্তঃস্থলে রয়েছে পার্টি। পার্টিকে সবল করতে পারলে তবেই আমরা জয়ী হতে পারব। আমাদের মধ্যে ছ জন পার্টি সভ্যপদ পায় অসাধারণ সাহস আর বীরত্ব দেখাবার জন্যে। আমাদের গ্রামে এ পর্যন্ত ন জন পার্টি সভ্য হয়েছে। তারা সবাই মেয়ে।

'এ অঞ্চলে মার্কিনরা অনেকদিন বোমা ফেলে নি। কিন্তু ওরা ক্ষ্যাপা বাঘের মত যে কোনদিন আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা তাই দিন-রাত

পাহারায় আছি। এখন আমাদের কাছে আরও বেশি নতুন অস্ত্র। এসব অস্ত্র আগে থাকলে আমরা শত্রুপক্ষের আরও বেশি বিমান ঘায়েল করতে পারতাম। আমাদের দলের পুরোনোদের মধ্যে কেউ কেউ এখন অন্য কাজের ভার নিয়েছে। কয়েকজন গেছে সদরে নতুন ট্রেনিং নিতে। কিন্তু যে যেখানেই যাক, আমাদের বাহিনীতে চোদ্দজন সব সময়ই মজুত।'

এরপর সদলবলে গেলাম ফ্রন্ট দেখতে। যে রাস্তায় গাড়িতে করে এসেছিলাম, সেই রাস্তা বরাবর হেঁটে লোকালয় ছাড়াবার পর একটা ডাঙা-মতন জমি। সেখানে একটা চালাঘর। এটা হল ফ্রন্টের শিবির। বেড়া পেরোতেই তাজ্জব হয়ে গেলাম। গাছে গাছে রঙীন ফুল। মাঝখানে একটা গর্ত। তার ভেতর বসানো রয়েছে সোভিয়েতের তৈরি একেবারে হালফিল ধরনের বিমান-বিধ্বংসী কামান।

উ থু বললেন, 'এবার যদি ওরা বোমা ফেলতে আসে তাহলে আর ওদের ফিরে যেতে হবে না।'

হোয়া লক্ গ্রাম থেকে ফিরতে বেশ দেরি হল।

বিকেলে আমাদের রেস্টহাউসে এলেন প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রতিনিধি হুয়েন ভান তুয়ং।

কমরেড তুয়ঙের বাড়ি থান হোয়া প্রদেশে। তিনি চাষী ঘরের ছেলে। পার্টিতে যোগ দেন ১৯৪৬ সালে। ফরাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ছিলেন নং কং জেলার প্রেসিডেন্ট। এখন তিনি এই প্রদেশের প্রশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। এর আগে তাঁর উপর ছিল যানবাহন আর প্রতিরক্ষার ভার। তুয়ঙের স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলে। ছেলেটি বড়। সে আছে সৈন্যবাহিনীতে। বড় মেয়ে হাসপাতালে সহকারী ডাক্তার। বাকি চার মেয়ে ইস্কুলে পড়ে। কাজের জন্যে কমরেড তুয়ং এখন শহরেই থাকেন।

উত্তর ভিয়েতনামে যাঁরা দেশ শাসন করেন, তাঁরা সকলেই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নিচে থেকে ওপরে স্তরে স্তরে রয়েছে গ্রাম্য, জেলা, প্রাদেশিক আর জাতীয় পরিষদ। গ্রামে আর জেলায় পরিষদ নির্বাচিত হয় দু বছর অন্তর। প্রাদেশিক পরিষদ তিন বছর আর জাতীয় পরিষদ চার বছর অন্তর নির্বাচিত হয়। থান হোয়া প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা একশো কুড়ি জন। জাতীয় পরিষদে এ প্রদেশের সদস্যসংখ্যা ছত্রিশ। গ্রামে গ্রামে

সভা কম্রে ফ্রন্ট তার প্রার্থী ঠিক করে। কিন্তু ফ্রন্টের মনোনীত নামের বাইরেও যে কেউ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারে। ফ্রন্ট বহির্ভূত প্রার্থী প্রত্যেক নির্বাচনেই থাকে। তারা কেউ কেউ নির্বাচিতও হয়। তবে তার সংখ্যা বেশি নয়। কারণ, প্রায় ক্ষেত্রেই ফ্রন্টের বাছাই জনসাধারণের ঠিক মনের মতো হয়।

কমরেড তুয়ং বললেন, 'সামনের মাসেই এবার জাতীয় পরিষদের নির্বাচন। ফ্রন্টের মনোনীত নামের তালিকা কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে। এই তালিকায় এবার হোয়া লক্ এলাকা থেকে থাকছে মিস্ মাই-এর নাম।'

প্রাথমিক আলাপ পর্বের পর কমরেড তুয়ং গোটা প্রদেশের একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেন। এ থেকে উত্তর ভিয়েতনামের প্রদেশগুলোর অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যাবে।

থান হোয়া প্রদেশের লোকসংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও বেশি। উত্তর ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড় শহরের একটি হল থান হোয়া। এই প্রদেশের উপকূলভাগ একশো দশ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর পাঁচটি জেলা উপকূল সংলগ্ন। পাহাড় অঞ্চলে আটটি জেলা। এ দুইয়ের মাঝখানে সমতলের সাতটি জেলা। সমুদ্র যোগায় মাছ, সমতলভূমিতে ফলে ধান আর পাহাড় থেকে আসে কাঠ আর বনজ সম্পদ। সমতল আর পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোতে হয় শিল্পসামগ্রী।

বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এ প্রদেশের মানুষ প্রায় দু হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে লড়াই করে চলেছে। এখানকার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বড় বড় বীর। মাদাম চিয়াও, লে-নয় এবং আরও অনেকে।

থান হোয়া সুজলা সুফলা হলেও ফরাসী রাজত্বে বরাবর মাছির মতো মরেছে এখানকার মানুষ—অনাহারে, যক্ষ্মায়, ম্যালেরিয়ায়। সে সময় সারা প্রদেশের জন্য ছিল মাত্র কুড়ি বেডের একটি হাসপাতাল। তাও সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। বড় বড় রাজপুরুষ আর জমিদারদের জন্যে। সাধারণ মানুষের অক্ষরজ্ঞানও ছিল না। সারা প্রদেশে ছিল মাত্র দু গ্রেডের একটিমাত্র ইস্কুল—সপ্তম শ্রেণী অবধি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে গেলে অন্য প্রদেশে গিয়ে তৃতীয় গ্রেডের ইস্কুলে ভর্তি হতে হত। জন কয়েক বড়লোকের ছেলের পক্ষে ছাড়া দ্বিতীয় গ্রেড টপকানো সে যুগে সম্ভব হত না। লোকে এত গরিব ছিল যে, বিছানা বালিশ কিংবা মশারি খুব কম বাড়িতেই থাকত।

পঁয়তাল্লিশ সালের অগস্ট বিপ্লবের আগে জাপানী আর ফরাসীরা মিলে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত ফসল লুট করে নেওয়ায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কত লোক যে না খেয়ে মারা যায় তার ইয়ত্তা নেই। বিপ্লবের পর পার্টি আর সরকার গ্রামে গ্রামে ফসল বাড়িয়ে অন্নাভাব দূর করে। তারপর থেকে আজ অবধি একটি লোককেও আর অনাহারে থাকতে হয় নি। অথচ এই সময়ে আমাদের বড় বড় দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দু পর্যায়ে একটানা লড়তে হয়েছে। এমন কি মার্কিনরা যখন আমাদের মাঠে মাঠে সমানে বোমাবর্ষণ করেছে, তখনও আমাদের ফলন ধাপে ধাপে বেড়েছে। ঐ রকম দুর্দিনেও প্রতি হেক্টরে আমাদের সমবায়গুলোতে ধানের ফলন বেড়ে হয়েছে পাঁচ টন (কোথাও কোথাও আট-দশ টন)। ফরাসী আমলে কত হত জানেন? সবচেয়ে সেরা জমিতে খুব বেশি হলে দেড় টন। দুই ফসলের মাঝের সময়টাতে এখন আর কোনো চাষীকেই অন্নকষ্ট পেতে হয় না।

পার্টি আর সরকারের তত্ত্বাবধানে, শুধু উৎপাদন নয়, উৎপাদনের সম্পর্কও বদলে গেছে। কৃষকেরা এখন সমবায়ের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ। তাদের সাহায্য করছে সরকার। সরকারি খামারে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বীজ। সেই বীজ কৃষকের কাছে যাচ্ছে। সরকার পুঁজি যোগাচ্ছে, বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকাচ্ছে আর সেচের জন্যে জল ধরে রাখছে। সার যোগানো ছাড়াও সরকার চাষীদের শেখাচ্ছে চাষের উন্নততর কায়দাকানুন।

আপাতত প্রত্যেকটি জেলায় বসেছে চাষের যন্ত্রপাতি তৈরির একটি করে কারখানা। তাছাড়া চাষীদের ভোগ্যদ্রব্য আর সার তৈরির রকমারি কারখানাও খোলা হয়েছে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যেও সমানে আমাদের কলে কাজ চলেছে। বোমার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে অনেক মেশিনপত্র শত্রুদের চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে কোনদিনই আমাদের সিগারেট, দেশলাই, সাবানের অভাব হয় নি। গ্রামে যে বাড়িতেই আপনি যাবেন, বসবার সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে চা আর সিগারেট।

খাওয়াপরার সংস্থান হওয়ায় লোকে এখন চায় শিক্ষা, সংস্কৃতি আর সামাজিক উন্নয়ন। এ প্রদেশের প্রত্যেকটি পাড়ায় পাবেন একটি করে প্রথম গ্রেডের (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী) প্রত্যেক গ্রামে দ্বিতীয় গ্রেডের (৫ম থেকে ৭ম শ্রেণী) আর প্রত্যেক জেলায় তৃতীয় গ্রেডের (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী) ইস্কুল। প্রত্যেকটি কৃষকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পড়ে। এই একটি প্রদেশে

থেকেই প্রতি বছর তিন-চার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এখন এ প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের সংখ্যা অনেক। প্রত্যেক গ্রামেই এখন তিরিশ-চল্লিশ জন করে গ্রাজুয়েট পাওয়া যাবে। তার মধ্যে অনেকেই আবার বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা। এমন যে হতে পারে, এটা আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

আজকের নিয়ম হল, দ্বিতীয় গ্রেড (৭ম শ্রেণী) পাশ না করলে কেউ কোনো সমবায়ের কর্মকর্তা হতে পারবে না। প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষণ, চিকিৎসা, সমুদ্রবিদ্যা আর বনবিদ্যা সংক্রান্ত বৃত্তিমূলক কারিগরী বিদ্যালয় খোলা হয়েছে; দ্বিতীয় গ্রেডের পাশকরা ছেলেরা এইসব বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। কৃষির উন্নতির জন্যে চাষবাস, গোপালন আর জলসংরক্ষণ বিষয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা আছে। সারা প্রদেশে আবাল-প্রৌঢ় জনসংখ্যার মধ্যে একজনও নিরক্ষর নেই। প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় গ্রেড পাশ-করার সংখ্যা সাত লক্ষ।

'প্রত্যেক গ্রামে আছে একটি করে আরোগ্যভবন। সেখানে দশ থেকে বিশ জন রোগীকে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক আরোগ্যভবনে প্রয়োজন অনুযায়ী থাকেন এক থেকে পাঁচ জন সহকারী ডাক্তার। প্রত্যেকটি উৎপাদনকারী দলের সঙ্গে থাকেন একজন করে নার্স।

'তাছাড়া রোগ-প্রতিবিধান, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন আর মাতৃমঙ্গল বিষয়ে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আগে সারা গ্রামে শৌচাগার ছিল না বললেই হয়। এখন প্রত্যেকটি বাড়িতে দুটি করে খাটা পায়খানা আছে। এখন গ্রামে প্রত্যেক মাসে ডাক্তার এসে প্রসূতি আর নবজাতকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। প্রত্যেক গ্রামে মেয়েদের জন্যে আলাদা স্নানাগার আর

স্বাস্থ্যগৃহ তৈরি করা হয়েছে। ডাক্তার দেখাবার জন্যে কাউকে কোনো পয়সা খরচ করতে হয় না। চিকিৎসার ব্যয় বহন করে সমবায়। এক সময়ে এ প্রদেশের হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যেত। এখন একজনও আর ম্যালেরিয়ায় মারা যায় না। কলেরা রোগ এখন সম্পূর্ণভাবে রদ হয়েছে।

'প্রত্যেক জেলার জন্যে আছে একশো থেকে দেড় শো বেডের একটি করে হাসপাতাল। সহকারী ডাক্তারের দল রোগীদের চিকিৎসা করেন। তিনটি প্রাদেশিক হাসপাতাল আছে তিন জায়গায়। তাছাড়া জেলা হাসপাতালের সমপর্যায়ের ছোট ছোট কিছু হাসপাতাল (পঞ্চাশ থেকে সত্তরটি বেডযুক্ত) আছে পাহাড় অঞ্চলে। গ্রামের আরোগ্যভবনে মামুলি ধরনের রোগের চিকিৎসা হয়। গুরুতর অসুখ হলে প্রয়োজনমতো হয় জেলা হাসপাতালে নয় প্রাদেশিক হাসপাতালে পাঠানো হয়ে থাকে। প্রাদেশিক হাসপাতালে থাকেন ওষুধপথ্যে আর শল্য চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দল। সবচেয়ে ছোট প্রাদেশিক হাসপাতালে বেডের সংখ্যা আড়াই শো। এখন অবশ্য হাজার বেডের কয়েকটি হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে।

'হাসপাতাল ছাড়াও গ্রামীণ মতে চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে। পুরনো প্রথায় যাঁরা চিকিৎসা করেন, তাঁদের সমিতি আছে। গ্রামবাসীরা যাতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ডাক্তারদের সাহায্য পান তার জন্যে আরও বেশি ডাক্তার তৈরির কাজ চলেছে। আশা করা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই প্রতি পাঁচটি গ্রামের জন্যে একজন করে পুরোদস্তুর শিক্ষিত আধুনিক চিকিৎসা-বিদ নিয়োগ করা সম্ভব হবে।'

কমরেড হুয়েন ভান তুয়ং এতটা বলবার পর একটু থামলেন।

সত্যি বলতে কি, আমি এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। শুকনো শুকনো তথ্য। পড়ে কারো ভাল লাগবার কথা নয়। কিন্তু আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল সংখ্যা নয়। পথেঘাটে দেখা অসংখ্য ভিয়েতনামী মানুষের মুখ। ঘটনা নয়—জীবন প্রবাহ। আমার ভাল লাগার আরও একটা কারণ, যিনি বলছিলেন তাঁর বলবার অনুপ্রাণিত ভঙ্গি।

কিন্তু আমার চোখের আড়ালে থেকে যাচ্ছিল আরও একটা গভীর সত্য। গ্রাম আর শহরের সেই অনুপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, যারা এখন রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে শত্রুর মহড়া নিচ্ছে। জীবন মানেই এখানে

মৃত্যুকে ঠেকানো। এখানকার বায়ু প্রতিনিয়ত বিষিয়ে উঠছে নাগিনীদের নিশ্বাসে। গড়বার অসংখ্য হাত এখন জোড়া রয়েছে দেশ বাঁচাবার হাতিয়ারে।

কমরেড তুয়ং সেই অদেখা দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। গড়ার কাজটা এখানে লড়াই বাদ দিয়ে হতেই পারছে না। আবার লড়াইয়ের জন্যেই দরকার গড়ার কাজ।

পঁয়ষট্টি থেকে আটষট্টি—এই চার বছরে মার্কিনরা এ প্রদেশের রাজধানীতে তো বটেই, সেই সঙ্গে মোট একুশটি জেলায় ব্যাপকভাবে বোমা ফেলেছে আর কামানের গোলা ছুঁড়েছে। বোমায় ক্ষত-বিক্ষত অর্ধেক গ্রামাঞ্চল। তিন্ জ্য জেলায় একটি গ্রামও বোমার হাত থেকে রেহাই পায় নি। থান হোয়া শহরে বিমান আক্রমণ হয়েছে এ পর্যন্ত মোট চার শো বার। ওরা বেছে বেছে জনবহুল এলাকায় বোমা ফেলেছে। শেল্টার, ট্রেঞ্চ, বিমানবিধ্বংসী কামান আর গ্রামরক্ষী বাহিনী থাকায় লোকজনের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশি হতে পারে নি। হাসপাতাল, ইস্কুল, গির্জা, প্যাগোডায় ওরা যে কিভাবে বোমা ফেলেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

কমরেড তুয়ং বললেন, 'আসা-যাওয়ার রাস্তায় এ গ্রামের বোমাবিধ্বস্ত গির্জাটা তো দেখেছেন। ওদের বোমার টুকরোয় গ্রামের অনেক বাড়ি পুড়ে যায়। ওদের বোমা ফেলার কোনো সময় অসময় ছিল না। মাঝ রাত্তিরে লোকে ঘুমিয়ে আছে, কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে—সেই সময় হঠাৎ আচমকা এসে তারা বোমা ফেলে গেছে। থান হোয়া থেকে হানয় যাওয়ার পথে পুরো তিন কিলোমিটার রাস্তা ওরা একের পর এক বোমা ফেলে উড়িয়ে দেয়। রাতারাতি সে রাস্তা আমরা মেরামত করে ফেলি। ওরা ভেবেছিল আমরা ভয় পেয়ে নতজানু হব। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। ওরা আমাদের ওপর যতই দুঃখের ভার চাপিয়েছে, ততই আমাদের রোখ বেড়ে গেছে। ওদের আঘাতে আমাদের ভেতরকার সুপ্ত শক্তি জেগে উঠেছে।

'এই চার বছরে মার্কিনদের আক্রমণ ছিল নির্বিচার আর হৃদয়হীন। আমাদের দেশের মানুষ দাঁতে দাঁত দিয়ে সেই আক্রমণকে রুখেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই দুঃসময়ের দিনগুলোতেই সবদিক দিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে গেছে। গোড়ায় গোড়ায় আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নিতে হয়েছিল গ্রামবাসীদের রক্ষার ভার। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েপুরুষদের নিয়ে গ্রামে গড়ে উঠল

মিলিশিয়া। তারা নিজেদের হাতে তুলে নিল নিজেদের রক্ষার ভার। তাতে সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ফ্রণ্টে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করার সুবিধে হল।

'ছেলেদের কথা বাদই দিচ্ছি। শুধু মেয়েদের নিয়ে তৈরি সাতটি রক্ষীবাহিনী গুলি করে বিমান নামিয়েছে—বাহিনীপিছু একটি থেকে তিনটি। হোয়া লাক গ্রামের মেয়েরাই প্রথম এরোপ্লেন ফেলে।'

শুধু মেয়েরা কেন, ভিয়েতনামের বুড়োরাও কম যায় না। দিল্লিতে এ কথা আমি প্রথম শুনি কমরেড তো হোয়াই-এর কাছে।

কমরেড তুয়ং বললেন, অনেক গ্রামেই বুড়ো লোকদের মিলিশিয়া আছে। হোয়াং হোয়া জেলায় এমনি এক মিলিশিয়া গুলি করে দু দুটো শত্রুবিমান নামিয়েছে। সেই দলে যে সবচেয়ে ছোট, তার বয়স উনপঞ্চাশ, সবচেয়ে বড়র বয়স চৌষট্টি। বাহিনীর গড় বয়স পঞ্চান্ন।

'এ প্রদেশে আমরা মোট উনআশীটি বিমান ফেলেছি। শত্রুপক্ষের বিশেষ কমাণ্ডোর তেত্রিশটি যুদ্ধজাহাজ নষ্ট করেছি।

'আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব হল হাম জং ব্রিজ। আজ সারা দুনিয়ার মানুষ এই ব্রিজের কথা জানে। পঁয়ষট্টি সালের ৩ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে আটষট্টি সালের ৪ এপ্রিল অবধি মোট একশো দিন এই ব্রিজের ওপর সবশুদ্ধ সাতশো পঁয়ষট্টি বার আক্রমণ হয়। কোনো কোনো দিন এই আক্রমণ চলে সমানে ভোর চারটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। মধ্যে শুধু মিনিট পনেরোর বিরতি। একবার এই আক্রমণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একদিনে একশো ষাট বার। শুধু দিনে নয়, রাত্রেও ওরা হামলা করেছে। একমাত্র বি ৫২ আর ১১১-এ টাইপ ছাড়া সব রকমের বিমান এসে বোমা ফেলে গেছে। কুড়ি কিলোমিটার দূর থেকে ওরা রকেট ছেড়েছে। বোমা ফেলেছে হরেক রকমের —ভাসন্ত বোমা, স্টীল পেলেট, বিস্ফোরক বোমা। সপ্তম নৌবহর থেকে ছুঁড়েছে গোলার পর গোলা। প্রতি বর্গমিটার জমিতে ফেলেছে তিনটি করে বোমা।

'মা নদীর উত্তর পাড়ে হাম জং ব্রিজের পাশেই হচ্ছে মুকতো পাহাড়। বোমা পড়ে পড়ে এই পাহাড়ের তিন ভাগের এক ভাগ উড়ে গেছে। এ থেকেই ধ্বংসের পরিমাণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। ইয়েন ডাক সমবায়ের তিনশো বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে।

'সেই সময় এলে দেখতে পেতেন লোকে তবু সমানে মাঠের কাজ করে চলেছে। ব্রিজের দু মাথায় বোমার ক্ষত। দু পাশে বোমা-পড়া জায়গাগুলোতে এখন দু দুটো পুকুর। ফেরার সময় নজর করে দেখবেন।

'সমবায়ের লোকজনেরা কিন্তু সে আমলেও চাষের কাজ বন্ধ করে নি। দিনে বোমা পড়লে রাত্রে আর রাত্রে বোমা পড়লে দিনে—এই ছিল তখন চাষ করার রেওয়াজ। সেই ভয়ঙ্কর সময়টাতে এলে দেখতেন গ্রামের লোকজনেরা সৈন্য-বাহিনীর লোকেদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রাস্তা সারাচ্ছে আর যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করছে। গোটা ব্যাপারটা হত উৎসবের মতো। হাম জং এলাকায় একশো দিনের লড়াইতে প্লেন ফেলা হয়েছে মোট নিরানব্বইটি। একশো পূর্ণ না হওয়ায় এলাকার লোকজনদের খুব আপশোস।

'মার্কিন পক্ষে হাম জং এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে ম্যাকনামারা স্বয়ং। দু দিনের মধ্যে ব্রিজটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে, এই ছিল তার প্ল্যান। প্রথম দিনে সতেরোটি আর দ্বিতীয় দিনে তিরিশটি প্লেন ভূপাতিত হওয়ায় মার্কিন সৈন্যরা খুব দমে যায়। তখন তাদের মনে বল দিতে ম্যাকনামারা সশরীরে সপ্তম নৌবহরে এসে উপস্থিত হয়।

'ম্যাকনামারা এবার এ-৬-এ টাইপের আধুনিকতম বিমানবহর পাঠিয়ে কেল্লা ফতে করার চেষ্টা করল। বাইশটি প্লেনের একটি ঝাঁক। তার নেতা করে পাঠানো হল মেজর জেনারেল ডান্টনকে। ডান্টন হল মার্কিন বাহিনীর কোরিয়া-ফেরত বীরপুরুষ।

'ম্যাকনামারা সপ্তম নৌবহরে অপেক্ষা করে রয়েছে। ডান্টন এবার বিজয় গর্বে ফিরে আসবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে, একেবারে প্রথম চোটেই ডান্টনের প্লেন ঘায়েল হল। ডান্টন প্যারাস্যুটে করে কোন রকমে মা নদীতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাল। তার সঙ্গে আরও একজন মার্কিন মহারথী ধরা পড়ল। সে হল ফার্স্ট লেফটেনান্ট চুডি। ম্যাকনামারার তখন মাথায় হাত। সেদিনকার লড়াইতে মাটিতে তিনটি প্লেনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। তাছাড়া অনেক প্লেন ঘায়েল হয়ে উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। এও ছিল মার্কিনদের একটা কায়দা। ওরা উড়ে আসার রাস্তায় কখনও বোমা ফেলত না। সমুদ্রের দিকে মুখ করে নিচু হয়ে ফেরার মুখে ওরা বোমা ফেলত—যাতে গুলিতে ঘায়েল হলেও কোনরকমে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর এটা জানা থাকায় আগে থেকে তারা গুলি ছোঁড়ার তাগবাগ ঠিক করে রাখত। তাতে

তারা ফলও পেত হাতে হাতে। ফলে বিমান হানার ভয় তাদের একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল।

'হাম জং ব্রিজ প্রথম তৈরি হয় ফরাসী আমলে। ১৯১৭ সালে। তৈরি করতে চার বছর লাগে। এই ব্রিজ তৈরি করতে গিয়ে দুশো জন কুলি প্রাণ হারায়। তখন ছিল ঝুলন্ত ব্রিজ। বিপ্লবের পর যখন আমরা ফরাসীদের সঙ্গে লড়ছি, তখন পার্টি থেকে পোড়ামাটির নীতি অনুযায়ী এই ব্রিজ উড়িয়ে দিতে বলা হয়। দুদিক থেকে চালকহীন দুটো বোমাসুদ্ধ রেলইঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন ব্রিজ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়। নতুন ব্রিজটি তৈরি করতে দু বছর লাগে। কাজটা ছিল বেশ শক্ত। আঠারো মিটার চওড়া ব্রিজের ওপর তিন ফালি পথ। মাঝখানে রেলের লাইন, দু পাশে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা। আগেকার ঝুলন্ত ব্রিজের চেয়ে এই নতুন ব্রিজটা হয়েছিল ঢের বেশি মজবুত আর ভাল। আমাদের দেশি ইঞ্জিনিয়ার আর মজুররা মিলে করেছিল। ১৯ মে ১৯৬৪—কমরেড হো চি মিনের জন্মদিনে এই ব্রিজের উদ্বোধন হয়। হো বলেছিলেন, সবচেয়ে বড় জিনিস হল স্বাধীনতা। সে কথা শিরোধার্য করে হাম জং ব্রিজ আজও মাথা উঁচু করে রয়েছে।

'এ যুদ্ধ শেষ হলে আমরা অনেক ভাল ভাল জিনিস তৈরি করব। পুরনো সব কিছুকে আমরা ছাড়িয়ে যাব। হাম জং ব্রিজ আবার আমরা নতুন করে বানাব।

'ভাববেন না শুধু ফসল ফলানো আর লড়াই করা—এই আমাদের একমাত্র কাজ। সংস্কৃতির দিকেও আমাদের নজর আছে। এ প্রদেশে এখন আমাদের দুটো সিনেমা ইউনিট। তারা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখায়। আছে নাচ-গানের পাঁচটি দল। তুয়ং আর চাওয়ের যাত্রাপার্টি। আধা-আধুনিক, আধা-সেকেলে অপেরা। এরা সবাই আটপৌরে সংস্কৃতিকর্মী। গ্রামে অনুষ্ঠান করে বেড়ায়। তাছাড়া সমবায়, সরকারি খামার আর কারখানার সঙ্গে যুক্ত আছে আড়াই হাজার শৌখীন নাচগানের দল। গ্রামে গ্রামে লাউডস্পীকারে রেডিও শোনাবার ব্যবস্থা আছে। গ্রামে গ্রামে আছে বই পড়া আর বই বিক্রির ব্যবস্থা। ক্ষেতে-কারখানায় প্রত্যেকটি কর্মীদল একসঙ্গে বসে কাগজ পড়ে। বৈজ্ঞানিক আর কারিগরী জ্ঞান সহজ ভাষায় লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে প্রচারকের দল আছে। জনশিক্ষার একটা বড় বাহন হল নাটক। তার জন্যে

সারা প্রদেশে আছে এক হাজার নাট্যকার। যারা লেখক হতে চায়, তাদের জন্যে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের আগে ছিল দুটো সিনেমাহাউস আর তিনটে থিয়েটার হল। সবচেয়ে বড় হলে ছিল দু হাজার আসন। বোমা পড়ে সমস্তই এখন ভগ্নস্তূপ।

'এ অঞ্চলে ভাল ভাল হাতের কাজ হয়। মাদুর, মেয়েদের টুপি। রঙীন ছবিওয়ালা বাঁশের চিক। চিনেমাটির রকমারি জিনিস। জলের কুঁজো, গেলাস, কাপ, বাটি। অনেক কিছু।'

কমরেড তুয়ঙের বলা হয়ে গেলে আমি জিগ্যেস করেছিলাম,'আচ্ছা কমরেড, পুরনো জমিদার-আমলাদের কী হল ? তারা এখন কোথায় ?'

কমরেড তুয়ং বললেন, 'ভূমি সংস্কারের পর কিছু কিছু রাঘব বোয়াল দক্ষিণে সটকে পড়েছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি নয়। জমিদার আর আমলাদের আমরা তিন বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করি—হাতেকলমে কাজের ভেতর দিয়ে যাতে তারা নিজেদের বদলাতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এতে ফল হয়। কিছু লোক ছিল যারা জীবনের নতুন ধারার সঙ্গে নিজেদের ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। তাদের কেউ কেউ ভেতরে ভেতরে নানাভাবে শত্রুতা করতে থাকে। গ্রামের লোকে পঞ্চায়েত বসিয়ে নানাভাবে তাদের টিট করে। কেউ কেউ উপায়ন্তর না দেখে নতুন ব্যবস্থা মেনে নেয়। কিন্তু একটা অংশ সত্যিই নিজেদের আন্তরিকভাবে বদলায়।'

'কি রকম ?'

'দেখুন যারা বরাবর পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে, নিজেরা একটা কুটো ভেঙেও দুখানা করে নি—যখন বাধ্য হয়ে তাদের চাষবাসের কাজে হাত লাগাতে হল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনটা বদলাতে লাগল। শোষক-শোষিতের মধ্যে যে ঘৃণার সম্পর্ক থাকে, সেটা চলে গিয়ে এল সহযোগিতার আর পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক। সেই সঙ্গে তারা বুঝতে পারল যে, এতদিন একটা বড় আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে এসেছে। সেটা হল, মিলেমিশে কাজ করে ফসল ফলানোর আনন্দ। হারানোর খেদ চলে গিয়ে আস্তে আস্তে তাদের মনে ঠাঁই নিয়েছে জীবনের সার্থকতাবোধ। আজ তাই বাইরে থেকে গ্রামে গিয়ে আপনি পুরনো জমিদার বা আমলা আর এখানকার কৃষকের মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পাবেন না।

'নতুন জীবনের সঙ্গে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে তাদের ছেলেপুলেরা। কৃষকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে একভাবে বড় হয়েছে। আবার তারাই তাদের বাপ-মা'দের বদলাতে সাহায্য করেছে।'

আজ আমরা হানয়ে ফিরে যাব। তার আগে সকালবেলায় একবার সামসানের সমুদ্রসৈকত দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। গাড়িতে আমাদের লটবহর উঠিয়ে নেওয়া হল। দুপুরে আর রেস্টহাউসে ফিরছি না। এ কদিন ভারি আনন্দে কেটেছে। জায়গাটার ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। রেস্টহাউসের কর্মীদের সঙ্গে বিনা বাক্যে বেশ একটা ভাব-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গাড়ির আওয়াজ পেলেই পাশের বাড়ির যে ছোট্ট ছেলেটা ছুটে এসে হাত নাড়ত, তাকে ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

প্রাদেশিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন। লোকসংখ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু ভালো ভালো খাদ্য পানীয়ের ছিল ঢালাও ব্যবস্থা।

সাংস্কৃতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কমরেড চান থান বলেছিলেন থান হোয়া প্রদেশের সেকাল আর একালের কথা। তিনি নিজে ইতিহাসে সুপণ্ডিত এবং বইও লিখেছেন।

ভিয়েতনামে মানুষের বিবর্তনের যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, অনুমান করা হচ্ছে তার বয়স পাঁচ লক্ষ বছর। প্রত্ন প্রস্তর যুগে এদেশে যে মানুষের বসবাস ছিল, ড পাহাড়ে তার বিস্তর পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেছে। নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে ভিন্ লক জেলার দা বুৎ এলাকায়, পাওয়া গেছে মেলানেসীয় কৃষ্ণকায় মানুষের মাথার খুলি। হাম জং ব্রিজের পাশেই যে পাহাড়, তার গায়ে ডং সাম গ্রামে চার হাজার বছর আগেকার তাম্র যুগের মানব সভ্যতার বিস্তৃত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

তাছাড়া গত দু হাজার বছর ধরে পরদেশআক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম যে লড়াই চালিয়ে এসেছে, তাতেও দেখা যায় বহু বীর আর

বীরাঙ্গনার জন্ম দিয়েছে এই প্রদেশ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদেশী দখলকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন যে বীরাঙ্গনা, সেই মাই থাই হোয়ার জন্ম এই প্রদেশের না-সান জেলায়। তাঁর আরেক নাম শ্রীমতী চুং। তৃতীয় শতাব্দীতে মো আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দেশবাসীকে সংগঠিত করেন আরেক তরুণী বীরাঙ্গনা—তাঁর নাম চিউ। তাঁর বাড়ি ছিল এই প্রদেশের নং কং জেলায়। দশম শতাব্দীতে নাম হান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন ডুয়োং দিন নো। তাঁর জন্মস্থান এখান থেকে ছ কিলোমিটার দূরে থিউ হোয়ায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিয়েতনামের মানুষদের লড়াই করতে হয়েছিল চেঙ্গিস খাঁর বিরুদ্ধে। এই প্রদেশের লোকজনেরা সেই সময় প্রচণ্ডভাবে লড়াই করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর জাতীয় বীর লে লয় ছিলেন এই প্রদেশেরই লাম সনের লোক। চীনা মিং রাজাদের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালিয়ে তিনি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে, ভিয়েতনামের মানুষ একটানা চার শো বছর ধরে জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। অসংখ্য লোককথা আর গাথার ভেতর দিয়ে ভিয়েতনামের জনচিত্তে লে লয়ের স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে এ প্রদেশে একাধিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। না-সন্ জেলায় হয় বা-দিন বিদ্রোহ। লোকে এখানে মাটির প্রাকার তুলে চার মাস ধরে ফরাসী বাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা এখানে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করে। যুদ্ধে সুবিধে করতে না পেরে ফরাসীদেশে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এরপর বিদ্রোহ দেখা দেয় ভিন লক জেলায়। তোং জুই ডাং এ অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। ছ বছর ধরে এই লড়াই চলে। বিদ্রোহের নেতা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। সে সময় পর্যন্ত সমস্ত বিদ্রোহই হয় ভাঁটি অঞ্চলে। কিন্তু পরে পাহাড়ী এলাকাতেও আস্তে আস্তে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। প্রথম মোং আর থাই উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নেতা হন কাম্ থুই গ্রামের হাভান মাও আর থুওং স্যান গ্রামের কাম্ বা থুওক।

ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পর তার নেতৃত্বে থান হোয়া প্রদেশে এক অভ্যুত্থান হয়। সেদিন এই অভ্যুত্থানে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন,

তাঁদের মধ্যে দুজন এখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তাঁদের একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কমরেড লো তাৎ ডাক্ এবং আরেকজন হলেন বিখ্যাত কবি কমরেড তো হু। উনিশশো চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ অবধি তাঁরা ছিলেন প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক।

ফ্যাশিস্তবিরোধী প্রতিরোধের সময় লক্ চাক্ এলাকায় গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। ফরাসীরা তখন গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে দমননীতি চালিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। সে সময়ে গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন এখানকার প্রাদেশিক প্রশাসন কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড তোন্ ভিয়েৎ নিয়েম্।

পঁয়তাল্লিশ সালে অগস্ট বিপ্লবের পর এ অঞ্চলে জনগণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর দশ বছর ধরে এদেশে ফরাসী বিরোধী যে সংগ্রাম চলে, তাতে এ প্রদেশের অসংখ্য লোক অসাধারণ বীরত্ব দেখায়। যেমন, একজন বীর ভিন্ দিয়েন্। দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে পাহাড়ের রাস্তায় একটা ভারী কামান যখন গড়িয়ে খাদে পড়ছিল, ভিন্ দিয়েন তখন চাকার নিচে শুয়ে পড়ে নিজের প্রাণ দিয়ে সেই কামানের গতিরোধ করেন। সারা ভিয়েতনামের মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর কথা আজ স্মরণ করেন। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে এ যুগের অনেক গান, নাটক। আঁকা হয়েছে অনেক ছবি। এই ভিন্ দিয়েনের বাড়ি ছিল চিউ সানে।

এ প্রদেশের হাজার হাজার ছেলে এখন ফ্রণ্টে লড়ছে। মেয়েরা আছে মিলিশিয়ায়। পাখি মারার মতো করে তারা গুলি করে নামায় মার্কিন বিমান। বুড়োরাও কম যায় না। তারা দু-দুটো মার্কিন বিমান ঘায়েল করেছে। কমরেড হো চি মিন স্বয়ং প্রশংসা করে তাঁদের চিঠি লিখেছেন।

এই প্রদেশের এক বীর কিশোর নুয়েন বা লক্। তার বাড়ি কোয়াং সান জেলায়। নুয়েন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। শত্রুর গোলার মুখে নিজের জীবন দিয়ে সে এক ছোট্ট মেয়েকে বাঁচায়।

কিন্তু এ ইতিহাস একা থান হোয়া প্রদেশের নয়। সারা ভিয়েতনাম জুড়েই এই একই চিত্র।

কমরেড চান্ থান্ এরপর বললেন থান হোয়া প্রদেশের বিপুল সাংস্কৃতিক সম্পদের কথা।

সংস্কৃতির উৎস হল জনজীবন। তাই জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গড়ে উঠেছে এখানকার সংস্কৃতি।

বললেন: 'আমাদের সমস্ত লোককথা আর লোকগাথায় রয়েছে এ অঞ্চলের সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনা। এই বর্ণনায় জড়প্রকৃতিতেও মানুষের ভাব আরোপ করা হয়েছে। আপনারা যখন সাম্ সান্ সমুদ্রসৈকতে যাবেন, রাস্তায় দেখতে পাবেন নানা আকারের পাহাড়। এই সব পাহাড়ের নাম কে যে করে দিয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু সেইসব নামের মধ্যে আছে কল্পনাশক্তির পরিচয়। যেমন একটি পাহাড়কে বলা হয়—স্বামী গেছে প্রবাসে, ছেলে কোলে করে স্ত্রী যেন তার পথ চেয়ে দিন গুনছে। সমুদ্রের ধারে দেখবেন ছোট ছোট পাহাড়। একটিকে বলা হয় পুং-পাহাড়, আরেকটিকে বলা হয়, স্ত্রী-পাহাড়।

'এইসব লোকসাহিত্যে রয়েছে জাতীয় বীরদের গুণগান। শ্রীমতী চিউ সম্বন্ধে একটি ঘুমপাড়ানী গানে বলা হয়েছে: ঘুমো রে বাছা, ঘুমো—ঘাট থেকে জল আনব, চিউ মা-র হাতির গা ধোয়াব, হাতির পিঠে চিউ মা বাজান বসে দামামা—দেখতে চাও তো উঠে পড়ো এই পাহাড়ে।

'লে লয়ের বৃত্তান্ত নিয়ে অনেক লোককাহিনী আছে। লে লয় তাঁর সেনাপতি লে-লাইয়ের পোশাক পরে লে-লাইকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচান কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করেন। তার ফলে, লে-লাই পালিয়ে গিয়ে দশ বছর ধরে মিং রাজাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান।

'রাজা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ প্রদেশের লোকসাহিত্য বরাবর সরব। সিয়েন নো তাঁর গাথাকাব্যে সম্রাট তু ডুককে নিয়ে খুব বিদ্রূপ করেছেন। তাতে সম্রাটকে বলা হয়েছে বোবা, কালা, অন্ধ আর খোঁড়া! জনসাধারণের সংগ্রামের সপক্ষে তিনি টুঁ শব্দ করেন না; তাই তিনি বোবা। এই জন্যে তিনি অন্ধ যে, দেশ ক্রমশ বহিঃশত্রুর পদানত হচ্ছে এটা তিনি দেখেও দেখছেন না। দেশবাসীর আর্তনাদ তিনি শুনতে পাচ্ছেন না, সুতরাং তিনি কালা। কোনো কিছু না দেখে আর না শুনে নিজেকে তিনি দরবারে বসিয়ে রেখেছেন, কাজেই তিনি খোঁড়া।

'তাছাড়া আমাদের লোকসাহিত্যে বরাবর মানুষের শ্রমের জয়গান করা হয়েছে। যা নিয়ে আমাদের গর্ব—খাবারদাবার, ফলমূল, গাছপালা—তার উৎসে রয়েছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সাধারণ মানুষ।

'তাছাড়া লেখাপড়ার চর্চাতেও এ প্রদেশের দীর্ঘদিনের সুনাম। আমাদের লিখিত সাহিত্যের ইতিহাস শুরু ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তাং রাজবংশের আমলে

প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন খোং কং ফুং। তিনি ছিলেন খুব বড় পণ্ডিত। রাজ-কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সুচিন্তিত পুঁথি লিখেছিলেন। থিউ চুং গ্রামের লে ভান হিউ ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের লোক। তাঁকে বলা হয় এ দেশের প্রথম ইতিহাস লেখক। তিনি লিখেছিলেন ভিয়েৎ জাতির ইতিহাস। প্রথম যুগের দার্শনিক হিসেবে ষোড়শ শতাব্দীতে খুব নাম করেছিলেন হোয়াং হোয়া গ্রামের লুয়ং ডাক বাং। প্রসিদ্ধ দার্শনিক নুয়েন বিন খিয়েম তাঁর ছাত্র। সপ্তদশ শতকে কবি হিসেবে নাম করেন থিন জ্য এলাকার দাউ জুই তু। রাজনীতিজ্ঞ আর যুদ্ধশাস্ত্রবিদ্ হিসেবেও তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত।

'অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি কাহিনী সারা দেশে খুব সাড়া জাগায়। কাহিনীর নাম ফুং-হোয়া—তার মানে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। এ গল্প আজও সমান জনপ্রিয়। সে সময়ে পদস্থ রাজপুরুষ হতে গেলে কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হত। ছেলে সেজে একটি মেয়ে সেই পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় সে প্রথম হয়। এরপর সে রাজার দরবারে গিয়ে তার পুরো কাহিনী বলে। রাজপুরুষেরা তার স্বামীকে অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। স্বামীর মুক্তির জন্যে যাতে রাজার কাছে এসে সে দাবি জানাতে পারে, তারই জন্যে এতদিন কঠোর পরিশ্রম করে সে নিজেকে তৈরি করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশপ্রেমিক কবি হিসেবে এ প্রদেশের যাঁরা নাম করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন হোয়াং হোয়া গ্রামের ন্যু বাসি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, পণ্ডিত আর তত্ত্ববিশারদ।

'এসব তো গেল অতীতের কথা। কিন্তু এ যুগে জাতীয় প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে শিল্পসংস্কৃতিকে আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তধারায় ছড়িয়ে দিয়েছি। দিন দিন গান, নাচ আর ছবি আঁকার প্রসার হচ্ছে। ক্ষেতখামারে বা কলকারখানায় কাজ করে এমন অনেকেই এখন অবসর সময়ে গল্প কবিতা লেখে। আমরা তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার লেখা পাই। লেখাগুলো যে খুব ভালো তা নয়—কিন্তু এ থেকে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে তাদের আবেগ বোঝা যায়।

'এ প্রদেশে লেখক আর শিল্পী সঙ্ঘের শাখা আছে। মার্কিনবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের ওপর অনেক গান কবিতা লেখা হয়েছে। একটি গান কে লিখেছে কেউ জানে না, কিন্তু খুব জনপ্রিয় হয়েছে। তাতে একজন ভিয়েতনামের গ্রামরক্ষী এক ভূপাতিত মার্কিন বিমানের নিহত চালকের

উদ্দেশে বলছে : একটু আগে তুমি ছিলে মেঘের রাজ্যে, আমি ছিলাম জলে। তুমি ছিলে আমার মাথার ওপর আর আমি ছিলাম তোমার নিচে। এখন আমি বাঁধের ওপর আর তুমি নিচে মাটির গহ্বরে ভুলুণ্ঠিত।

'আমাদের প্রদেশে লেখক আর শিল্পী সঙ্ঘের শাখায় একটি অস্থায়ী কমিটি আছে। তাতে নাটক, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সমালোচনাশিল্প, গবেষণা, সংস্কৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিভাগের সাঁইত্রিশ জন প্রতিনিধি আছেন।

'এই কমিটি থেকে লেখক শিবিরের আয়োজন করা হয় ; তরুণ লেখকদের লিখতে শেখানোর ধারাবাহিক ব্যবস্থা আছে, লেখা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয় ; সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় ; স্বরচিত লেখা পাঠ এবং তারপর তা নিয়ে সমালোচনা হয়।

'লেখকেরা যাতে উৎপাদন আর লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী হন, যাতে তাঁদের মধ্যে সত্যিকার আবেগ আর অনুভূতি জাগে, তার জন্যে তাঁদের ঘরের বাইরে পাঠানো হয়। এর ভেতর দিয়ে নতুন নতুন প্রতিভার সন্ধান মেলে এবং অনেক নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়। শুধু প্রতিভা আবিষ্কার নয়, যাতে তারা অনুকূল পরিবেশ আর সব্ রকমের উপকরণ পায়, সেদিকে দেখা হয়।

'নতুন লেখকদের পাণ্ডুলিপি যত্ন করে পড়া আর সমালোচনা করা হয় এবং পাঠক সমাজে নতুন লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

'আমাদের প্রদেশে শিল্পসাহিত্যের একটি মাসিকপত্র আছে। গত বছর আমরা গল্প, কবিতা আর লোককবিতা নিয়ে তিনটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। তাছাড়া পাহাড় অঞ্চলের লোকসাহিত্যেরও দুটি সংকলন বেরিয়েছে।

'এসব কাজের জন্যে যে টাকা লাগে, আমরা তা সংগ্রহ করি নানা সূত্রে— কিছু টাকা দেয় লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ, কিছু দেয় বিভিন্ন সমবায়, কিছুটা দেন আংশিক সময়ের লেখক শিল্পীরা। তাছাড়া আছে বই বিক্রির আয় আর সরকারি সাহায্য।'

চলেছি থান হোয়া শহর ছাড়িয়ে এক নতুন রাস্তায়। যেতে যেতে অদ্ভুত-দর্শন সব পাহাড়। সঙ্গে চলেছেন প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রতিনিধি কমরেড সান্। মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বলছেন, 'ঐ যে দেখুন— প্রবাসে যাওয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় ছেলে কোলে করে বউ', 'এ হল ছেলে পাহাড় ঐটা মেয়ে পাহাড়', 'ওটাকে বলে ড্রাগন পাহাড়।'

অনেকক্ষণ যাওয়ার পর আমাদের গাড়িগুলো যেখানে এসে থামল, সেখানে বেশ কয়েকটা ভাঙাচোরা আর জনশূন্য ফাঁকা বাড়ি।

এককালে এটা ছিল বড়লোকদের খুব শৌখীন জায়গা। ফরাসীদের ছিল নানা ধাঁচের সৈকতাবাস আর নাচ গান ফুর্তির জায়গা। বিপ্লবের পর এখানে শ্রমিক কৃষকদের জন্যে স্যানাটোরিয়াম আর বিশ্রামভবন তৈরির পরিকল্পনা ছিল। কিছুটা কিছুটা কাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু তারপরই শুরু হল একটানা লড়াই। নৌবহর থেকে ছোঁড়া মার্কিনদের গুলিগোলায় সব ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। নিরাপত্তার জন্যে এদিকটাতে এখন আর কাউকে আসতে দেওয়া হয় না।

শুধু জেলেরা আসে মাছ ধরতে। মার্কিন বিমান এসে প্রায়ই জেলে নৌকোয় বোমা ফেলে।

ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে এসে হঠাৎ দেখি সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় ধু-ধু করছে সমুদ্র। বালিজাগা বিশাল সমুদ্রতট। এত বড় বালুতট পৃথিবীতে বোধহয় বেশি নেই। জলের ধার ঘেঁষে কচ্ছপাকৃতি দু-থাক পাহাড়। একটির মাথায় অনেকদিনের পুরনো কোনো মন্দির।

বালির চড়ায় নানা রকমের নৌকো। তার মধ্যে কয়েকটা পুরোপুরি বাঁশ দিয়ে তৈরি। কী একটা গাছের বাকল দিয়ে বাঁশগুলো শক্ত করে বাধা। সমুদ্রের সব রকম ধকল সইতে পারে। জেলেদের সঙ্গে থাকে রাইফেল। গুলি করে ওরাও অনেক মার্কিন বিমান নামিয়েছে।

কিছু লোক পাথরের গা থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে বার করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম এক রকমের সামুদ্রিক মাছ। জোয়ার নেমে গেলে এইসব মাছ পাথরের ফাঁকে ফোকরে আটকে থাকে।

কমরেড সান বলছিলেন কচ্ছপাকৃতি পাহাড়টা নিয়ে এক জেলেজেলেনীর লোককথা।

দুপুর নাগাদ ফিরে এলাম থান হোয়ায়। ক্যামেরার ফিল্ম কাল সকালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, অনেকগুলো ভালো ভালো বিষয় তোলাই হয় নি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে প্রশাসন দপ্তরের অতিথিশালায়। যাবার পথে একবার নান্ ভান্ হয়ে যেতে হবে। সেদিন আলোর অভাবে ছবি তোলা যায় নি। আজ যে করে হোক্ ফিল্ম যোগাড় করতে হবে।

অতিথিশালায় খেতে গিয়ে দেখি সামনে চমৎকার পুকুর। কমরেড তাইকে বললাম, একটা ছিপ যোগাড় করা যায় না?

পাওয়া গেল ছিপ। তারপর দু-চার জায়গায় মাটি খুঁড়তেই কেঁচোও যোগাড় হয়ে গেল। একটাও ধরতে পারছিলাম না। শেষটায় গোটা দুয়েক চ্যাং মাছ ধরা দিয়ে আমার মান বাঁচাল।

এদিকে সারা শহরে কোথাও পাওয়া গেল না ৩৫ মিলিমিটারের ফিল্ম। এখন উপায়? মিসেস্ হাঙের ছবি আমার খুবই দরকার।

শেষকালে অনেক খুঁজেপেতে বার করা হল ফটোর দোকান। ফ্রন্ট থেকে ছুটি পেয়ে ছেলেরা এসেছে সপরিবারে ছবি তুলতে। দেখলে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়।

শেষটায় পাকড়াও করে এক ফটোগ্রাফারকে গাড়িতে তোলা হল।

আলো থাকতে থাকতে পৌঁছুতে হবে; গাড়ি ছুটল নাম ঙান।

মনটা খারাপ লাগছিল। সাম সানের অত সুন্দর সমুদ্রতীর। ড্রাগনাকৃতি কচ্ছপাকৃতি পাহাড়। স্বামীগেলা পাহাড়। বাঁশের তৈরি সমুদ্রগামী জেলে নৌকো। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জোয়ারের মাছ। বোমায় ভাঙা ঘরবাড়ি। ফিল্ম অভাবে ছবি তোলা গেল না।

পেশাদার সাংবাদিকের যে সুবিধে আমার তা নেই। রেস্ত কম। কাজেই ইচ্ছেমত রোল কেনা সম্ভব নয়। তাছাড়া ছবি তুললেই তো হল না। তার ডেভালাপমেন্ট, প্রিন্ট, এনলার্জমেন্ট বিস্তর খরচা। সে খরচ কোথা থেকে জুটবে?

একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার থাকলে কী যে সুবিধে হত বলার নয়। নোট বইতে সব জিনিস সব সময়ে টুকে রাখা যায় না। তাছাড়া সব কিছুই সাঁটে লিখে রাখতে হয়। আশা থাকে, পরে সব মনে পড়ে যাবে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্বল স্মৃতি ভারি মুশকিল বাধায়। নামের উচ্চারণ নিয়ে সংশয় জাগে।

সাম সান সৈকতে দাঁড়িয়ে একটা ভারি সুন্দর লোককাহিনী শুনেছিলাম। আমার ডায়েরিতে শুধু লেখা আছে 'জেলেজেলেনীর গল্প'। অথচ লিখতে গিয়ে দেখছি গল্পটা ঠিক ঠিক কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিংবা হিন্দী জানা লেখক কমরেড চে লান ভিয়েন আমার ডায়রিতে নাগরী হরফে কিছু নামের যে উচ্চারণ লিখেছেন, তাতে 'মুয়েন' হয়েছে 'মুয়ন' আর 'ভিয়েন' নয় 'বয়েন'। এ সত্ত্বেও আমার ডায়েরির নানা জায়গায় নামের বানানের নানা হেরফের

হয়েছে। তার কারণ, শুনে যখন যে রকম মনে হয়েছে সেইমত লিখেছি।

আরও একটা সম্ভাব্য ভুলের কথা অকপটে জানিয়ে রাখি। দুটো একটা ছবির ক্ষেত্রে নামের গোলমাল হতে পারে। পেশাদার সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফারদের এসব ভুল এড়াবার উপায়গুলো জানা থাকে।

সত্যি বলতে কি, অজ্ঞাতভাষী অচেনা দেশে পা দিয়ে ভ্রমণ কাহিনী লিখতে কখনই আমার খুব উৎসাহ হয় না। তার কারণ, দোভাষী না থাকলে আমি সেখানে সম্পূর্ণভাবে বোবা এবং কালা। সেই সঙ্গে অন্ধও বলা চলে। তার ওপর যদি হেঁটমুখে প্রত্যেকটি কথা নোটবইতে টুকে রাখতে হয় তাহলে চোখ মেলে তাকানো যায় না।

আমি তাই নাম ধাম, সংখ্যার নির্ভুলতা যাচাই করার চেয়েও বেশি ঝুঁকেছি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির দিকে। রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে যায় আমি তাদের একদৃষ্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। আমি তাদের মনের আঁচ আমার গায়ে লাগাবার চেষ্টা করেছি।

নাম ভানে ফটো তোলার পাট চুকিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমরা হানয়ের রাস্তা ধরলাম, তখনও যথেষ্ট বেলা রয়েছে।

মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, আজ রবিবার। রবিবার? কী আশ্চর্য, রাস্তাঘাটে লোকজনের কর্মব্যস্ততা দেখে মনেই হয় নি আজ ছুটির দিন। অবশ্য একটা জায়গায় দেখেছিলাম মাঠে নেট খাটিয়ে রাস্তা তৈরির লোকজনেরা তাঁবুর বাইরে মহা উৎসাহে ভলিবল খেলছে।

যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, জীবনে আর কখনই হয়ত এদিকে আসব না। কিন্তু এই প্রকৃতি তার মানুষজনের কথা চিরদিন মনে থাকবে। পাহাড়তলীতে জালবন্দী বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো এভাবে চিরকাল থাকবে না। যুদ্ধ থেমে গেলে গোটা এলাকার চেহারাই যাবে বদলে।

অদূরে হাম জং ব্রিজ। এবার আমরা ডানদিকে ঘুরে নদী পার হব। কিন্তু কী ব্যাপার? গাড়ি যে সোজা রাস্তায় পাহাড়ের চড়াই ঠেলে উঠেছে!

কাছেই ডং সান। যেখানে একজন ফরাসী পুরাতাত্ত্বিক মাত্র বছর পঞ্চাশেক আগে ভিয়েতনামের চার হাজার বছর আগেকার ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন।

কিন্তু তারও আগে হঠাৎ বাঁদিকে চোখ পড়ল। মার্কিন বোমায় বিধ্বস্ত একটি বিরাট লোকালয়। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া ইটের বাড়ি। এক সময়ে ছিল ঘনবসতি। এখন সেখানে মাথা গুঁজবার মত একটিও ঠাঁই নেই। আজকের মার্কিন বর্বরতার পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল চার হাজার বছর আগেকার ভিয়েতনামী সভ্যতার স্মৃতিচিহ্নের দিকে।

পাহাড়ের গায়ে গাড়ি এসে যেখানে থামল সেখানে কয়েকটি অস্থায়ী আস্তানা। চারিদিকে খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন। সামনে খোলা আকাশ। নিচে দিয়ে গেছে মা নদী।

১৯২৪ সালে ফরাসীদের আবিষ্কৃত হলেও এখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয় সুইডিশ উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে। পশ্চিমী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভিয়েতনামের প্রাচীন ইতিহাস যত না উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার চেয়ে বেশি করেছেন পুরাবস্তু লুণ্ঠন।

তাছাড়া তাদের দৃষ্টি ছিল ঔপনিবেশিক মনোভাবে আচ্ছন্ন। তাই তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, সব কিছু এসেছিল বাইরে থেকে। কেউ কেউ এমন কি এও বলেছিলেন যে, ভিয়েতনামের প্রাচীন সমস্ত শিল্পবস্তুর উৎস হল ইউরোপ।

সাম্রাজ্যবাদী আমলে পুরনোকে জানার কাজ বিশেষ এগোয় নি, এ কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় মুক্তি সংগ্রামের পর্বে। গত দুই দশকে উত্তর ভিয়েতনামের তিরিশটি জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করে ব্যাপকভাবে আর বহুল পরিমাণে যেসব পুরনো যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ হয় যে, এ-দেশের মাটিতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষের বসবাস। ডং সানে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার যে নিদর্শন মিলেছে, তা বাইরে থেকে আসে নি—ভিয়েতনামের মাটিতে তা মানুষের ধারাবাহিক সমাজবিকাশেরই ফল।

ডং সানের চারপাশে দেখলাম সশস্ত্র পাহারা। ভিয়েতনামের মানুষ আজ বুক দিয়ে আগলাচ্ছে শুধু হাম জং ব্রিজ নয়—সেই সঙ্গে ডং সানের পুরাকীর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল হানয় শহরে দেখা ইতিহাসের সেই মিউজিয়মের কথা। কিউরেটর মাদাম জুং বলেছিলেন, 'সাইরেন বাজলেই আপনাদের চলে যেতে হবে শেল্টারে। আর আমি রাইফেল হাতে ছুটে যাব ছাদে। যাতে ওরা এই মিউজিয়ম নষ্ট করতে না পারে।'

বলেছিলেন, 'এসব যা দেখছেন বেশির ভাগই মডেল। আসল দামী দামী জিনিস আমরা সরিয়ে ফেলেছি।'

দিল্লিতে কমরেড তো হোয়াই আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের পুরনো যা কিছু স্থাপত্য—সমস্ত বোমা পড়ে মাটিতে মিশে গেছে। সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ। যুদ্ধ মিটে গেলে আমরা নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করব, ঝলমলে শহর বানাব। কিন্তু পুরনো স্থাপত্য? তার তো আর পুনরুদ্ধার হবে না।'

সাম্রাজ্যবাদীরা চায় যাতে পরাধীন জাতিগুলো তাদের পূর্বগৌরব ভুলে যায়, যাতে তারা নিজেদের দীনহীন অকিঞ্চন বলে মনে করে। তাই পশ্চিমের অনুকরণপ্রিয়তাকে তারা প্রশ্রয় দেয়।

ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামে তাই পদে পদে জাগিয়ে তুলতে হয়েছে পুরনো স্মৃতি। মনে যাতে জোর আসে, পুরনো কলাকৌশলগুলোকে যাতে দরকার মত কাজে লাগানো যায়। ইতিহাস থেকে সেই সব উপকরণ তুলে বেছে আনা হয়েছে যা আজকের জীবনে মানুষকে এগোতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানের হাত ধরেছে অতীত।

ডং সানে এসে হানয়ের মিউজিয়মে দেখা ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শনগুলো নতুন করে মনে পড়ে গেল। উৎপাদনের জিনিস বলতে : লাঙলের ফাল, কুড়ুল, কাস্তে, বাটালি, উকো, সূচ, বঁড়শি, খন্তা। ঘর-গেরস্থালির নানা জিনিস। নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র। তাছাড়া গলার হার, রকমারি মূর্তি।

ডং সানের মাটি খুঁড়ে হান রাজাদের আমলের কবর পাওয়া গেছে। আর সেই সঙ্গে তিন কিলোমিটার জুড়ে হদিশ পাওয়া গেছে পুরনো লোকালয়ের—কাঠের গুঁড়ির ওপর তৈরি সেকালকার বাড়ির।

এ কাজে পথ দেখিয়েছে কমরেড হো চি মিনের পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টি। তাই অন্ধ জাতীয়তাবাদের খপ্পরে ভিয়েতনামবাসীদের পড়তে হয় নি।

বেলা পড়ে আসছে। এবার আর রাস্তায় কোথাও থামা নয়।

হাম জং ব্রিজের ওপর থেকে তাকালাম। দূরে নাম ডান গ্রাম। থান হোয়া দেখা যায় না। মা নদীর ধার বরাবর পাহাড়ের পর পাহাড়। কে যেন বলেছিল, এক কম একশোটা পাহাড়।

রাস্তায় অনেক জায়গায় ভাঙা ব্রিজ সারাই হচ্ছে। নদীতে জল কম। গাড়ি পার হওয়ার জন্যে রয়েছে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো।

সারা রাস্তা দুপাশে কেবল সাইকেল আর বাঁক কাঁধে মানুষ।

কাল বিদায়কালীন ভোজসভায় ইংরিজিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকমে আমি বলেছিলাম : যেন সাইকেলের দুটো চাকায় ভর দিয়ে চলেছে তোমাদের গোটা দেশ। সামনের চাকাটা হল তোমাদের জাতীয় ফ্রন্ট আর পেছনের চাকাটা হল কমিউনিস্ট পার্টি। কিংবা বলা যায়, সামনের চাকাটা জাতীয় স্বাধীনতা আর পেছনের চাকা হল সমাজতন্ত্র।

১৩

কাল রাত্রে হোটেলে ফিরেই শুনলাম ডক্টর শেলভাস্কর বার কয়েক ফোন করেছিলেন।

বাম্নেভাই ফোন করতেই ডক্টর শেলভাস্কর বললেন, 'সুভাষকে নিয়ে এক্ষুনি চলে এসো। জোর খবর আছে।'

যেদিন আমরা থান হোয়া রওনা হই, সেইদিনই ছিল ২৬ মার্চ। পূর্ব বাংলায় যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, এ-কদিন ঘুণাক্ষরেও আমরা তা টের পাই নি।

যে দেশের ভাষা জানি না, সে দেশে গেলে এই এক মুশকিল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগই থাকে না। ভারতীয় দূতাবাসে যে কাগজ আছে, তা প্রায় দু-তিন সপ্তাহের পুরনো। আসে সায়গন হয়ে। অথচ আকাশপথে কলকাতা মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ।

সুতরাং একমাত্র ভরসা রেডিও। তাও ভারতীয় আকাশবাণী নয়। বি-বি-সি। ভয়েস অব আমেরিকাও পাওয়া যায়। কিন্তু তার খবরগুলো নির্ভরযোগ্য নয়।

মুজিবর রহমান ধরা পড়েছেন, না পড়েন নি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লড়াই হচ্ছে।

আজ সকালে আবার গিয়েছিলাম খবর শুনতে। কোনো নতুন খবর নেই। এই মুহূর্তে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে কলকাতায়। মুক্তির লড়াই এখন আমাদের ঘরের কাছে।

বেলা তিনটেয় গেলাম শিক্ষামন্ত্রকে। আমাদের জন্যে সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করছিলেন উপমন্ত্রী ভো থুয়ান নো। দেখে মন্ত্রী বলে বোঝার জো নেই।

তাঁর কাছ থেকে উত্তর ভিয়েতনামের শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি ছবি পেলাম। সে ছবিটা হল এই :

ফরাসীরা ভিয়েতনামকে উত্তর, দক্ষিণ আর মধ্য—এই তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। ১৯৫৪ সালে অগস্ট বিপ্লবের ভেতর দিয়ে ভিয়েতনাম স্বাধীন হয়। তখন পর্যন্ত এদেশে শিক্ষার কী দশা ছিল ?

উত্তর ভিয়েতনামের মাত্র এক লক্ষ লোক লেখাপড়া জানত। শতকরা নব্বই জনই ছিল নিরক্ষর। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ডজন কয়েকের বেশি ছিল না। বছরে মাত্র চার পাঁচজন হত পাশ করা ডাক্তার।

বিপ্লবের পর হো চি মিন বললেন : বাইরের শত্রু এক আর ঘরের শত্রু দুই—অনাহার আর নিরক্ষরতা। এই তিনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

শুরু হল নিরক্ষরতা দূর করার আন্দোলন।

যারই অক্ষর পরিচয় আছে, তাকেই নিতে হবে যে নিরক্ষর তাকে সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র শেখানোর ভার। স্বামী শেখাবে স্ত্রীকে, দাদা শেখাবে ভাইকে। অক্ষর পরিচয়ের ক্লাসে যাওয়া আর নিরক্ষরতা দূর করা মানেই দেশকে ভালবাসা। অক্ষর পরিচয়ের ক্লাস হল ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দুর্গ।

ফরাসীরা ভিয়েতনামীদের ভিয়েতনামী ভাষায় লেখাপড়া শিখতে দেয় নি। প্রত্যেককে তারা বাধ্য করত ফরাসী ভাষা শিখতে। বিপ্লবের পর এই প্রথম ভিয়েতনামীরা মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার অর্জন করল। তার ফলে, লোকে মহা উৎসাহে হরফ চেনার কাজে লেগে গেল।

আগে ভিয়েতনামী ভাষা লেখা হত চীনা হরফে। এই হরফ খুব জটিল বলে সাধারণ লোকের অক্ষর পরিচয়ের ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ হত না। কিন্তু রোমান হরফের ভিয়েতনামীকরণের ফলে অক্ষর পরিচয়ের কাজ এখন খুব সহজ হয়ে গেছে। এখন মাত্র একশো ঘণ্টায় ভিয়েতনামী ভাষায় লিখতে পড়তে শেখা যায়। ফলে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে কর্মীর কোনো অভাব হয় নি।

গ্রামে গ্রামে এই আন্দোলন হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল।

চাষীরা তাদের মাথার টোকায় অক্ষর লিখে রাখতে লাগল যাতে চাষ

করতে করতেও তারা অক্ষরগুলো দেখে চিনতে পারে। অক্ষরগুলো মুখস্থ করার জন্যে নানা রকম ছড়া আর গান বানানো হল। হাটের লোকেদের রাস্তায় ধরে বলা হল, আগে অক্ষর শেখো তারপর বাজারে যাও। মোষের গায়ে লেখা হতে লাগল যাতে রাখাল ছেলেরা তাই দেখে অক্ষর চিনতে পারে। সৈন্যদের পিঠে অক্ষর লেখা হতে লাগল যাতে পেছনের লোক দেখতে পায়।

এক বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার আন্দোলনে কর্মী সংখ্যা হল ন লক্ষ। তাদের চেষ্টায় পঁচিশ লক্ষ লোক লিখতে পড়তে শিখল। কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে তখন লড়তে হচ্ছিল বলে কাজ খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছিল। আটান্ন সাল নাগাদ উত্তর ভিয়েতনামে পঞ্চাশের নিচে যাদের বয়স, তাদের মধ্যে একজনও আর নিরক্ষর রইল না।

এরপর জোর দেওয়া হল ইস্কুলের বিধিবদ্ধ শিক্ষার ক্ষেত্রে। প্রথম এক থেকে চার, দ্বিতীয় পাঁচ থেকে সাত, তৃতীয় আট থেকে দশ—শ্রেণীর পর শ্রেণী নিয়ে এই তিনটি গ্রেড। এরপর কারিগরী এবং উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। ইস্কুলে ছাত্র সংখ্যা বছরে গড়ে দশ লক্ষ।

সমবায়ে, প্রশাসনে এবং পার্টিতে নেতৃস্থানীয় কর্মী হতে গেলে এখন শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই। শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বাড়াতে না পারলে পদোন্নতি সম্ভব হবে না।

কাজ করতে করতে যাতে পড়াশুনো চালানো যায়, তার জন্যে আছে ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা। যেখানে তার অসুবিধা আছে, সেখানে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

এখন উত্তর ভিয়েতনামের লোকসংখ্যার অধিকাংশই প্রথম গ্রেড অবধি শিক্ষিত। শ্রমিক আর কৃষকদের পরিবারের অনেকেই এখন দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসেবে নানা ক্ষেত্রে কাজ করছেন।

কমরেড নো বললেন :

'আগে শুধু যে শিক্ষার সুযোগের অভাব ছিল তা নয়—সেই সঙ্গে পাঠ্যসূচীও ছিল সম্পূর্ণ বিজাতীয় ধরনের। এমনভাবে ইতিহাস পড়ানো হত যেন গলরাই আমাদের আসল পূর্বপুরুষ। ভিয়েতনামী ভাষাকে বিজাতীয় ভাষা বলে গণ্য করা হত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও ফরাসী শিক্ষকেরা ফরাসী ভাষায় পড়াত। আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলে ভিয়েতনামী ভাষার জন্যে বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে মাত্র দুটি পিরিয়ড।'

উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ থেকে শুরু হয় শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বদলে উত্তর ভিয়েতনামে জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা হল নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। পুরনো পাঠ্যসূচী আমূল বদলে নতুন করে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পাঠ্যবই লেখা হল। মাতৃভাষা হল শিক্ষার বাহন। মাতৃভাষায় যাঁরা পড়বেন তাঁদের জন্যে ভালো রকম ট্রেনিঙের ব্যবস্থা হল।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই আর উৎপাদন, অন্যদিকে শিক্ষা—দুটো একই সঙ্গে বজায় রাখতে হয়েছে। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় স্কুল কলেজের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায় এবং ছাত্রসংখ্যা হয় ছ লক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের পর্বে সাধারণ শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে এখন হয়েছে আটচল্লিশ লক্ষ। কিণ্ডারগার্টেনের আঠারো লক্ষ পড়ুয়ার হিসেব এর মধ্যে ধরা হয় নি। উত্তর ভিয়েতনামের মোট লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আজ মোটামুটিভাবে শিক্ষিত।

এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? রাষ্ট্রশক্তি আর জনশক্তি—এই দুই স্তম্ভের জোরে। সাধারণ মানুষ নিজে হাতে তৈরি করে দিয়েছে ইস্কুলের চেয়ার টেবিল বেঞ্চি। তারাই যুগিয়েছে শিশু-শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন। এমন কি প্রাথমিক শিক্ষকদের মাইনেও তিন বছর আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষ চাঁদা করে দিত। এখন দেয় উত্তর ভিয়েতনাম সরকার। ভিয়েতনামে শিক্ষা এখন সমস্ত স্তরেই অবৈতনিক। ছাত্ররা যা বৃত্তি পায় তা দিয়ে তারা নিজের নিজের খরচ চালিয়ে নিতে পারে। শিক্ষকদের জন্যে আছে বছরে তিন মাস নিয়মিত ট্রেনিঙের ব্যবস্থা।

ইস্কুলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিয়েতনামী ভাষাই হল শিক্ষার একমাত্র বাহন। ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টির এ হল বরাবরের নীতি।

কমরেড নো বললেন:

'গোড়ায় গোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষায় পড়ানো হত। তার কারণ, অধ্যাপকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বাহন নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ ছিল। তাঁদের অনেকেই মনে করতেন, ভিয়েতনামী ভাষায় যথাযথভাবে বিজ্ঞান পড়ানো সম্ভব নয়—কেননা বিজ্ঞানের সব ধারণা ভিয়েতনামী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া অধ্যাপকদের অনেকেরই ভিয়েতনামী ভাষায় তেমন দখল ছিল না।

'আমরা বলেছিলাম, এখনও ভিয়েতনামী ভাষায় কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রকাশ করা যে শক্ত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিয়েতনামী ভাষাকে

শিক্ষার বাহন না করে আমাদের উপায় নেই। সমস্যাগুলোকে ক্রমান্বয়ে আমাদের সমাধান করতে হবে।

'আমাদের সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল টেকনিক্যাল শব্দের ব্যাপারে। আমরা আমাদের পাঠ্য বইতে ফরাসী, রুশ বা চীনা পরিভাষাগুলোকে নিজের করে নিয়েছি। এমনভাবে নিয়েছি যাতে আমাদের ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়। আমরা 'অক্সিজেন'কে করেছি 'ওসি,' ইলেকট্রিসিটিকে করেছি 'তিয়েন'। কিন্তু জল-বিদ্যুতের বেলায় 'জল' অর্থে নিজেদের 'থুই' শব্দটা যোগ করে 'থুই-তিয়েন' করেছি।

'গোড়ায় যা অসাধ্য বলে মনে হয়েছিল, পরে দেখা গেল মোটেই তা অসাধ্য নয়। আসলে আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের ইতিহাস তো কম দিনের নয়। ভিয়েতনামী ভাষার যথেষ্ট ঐশ্বর্য আছে। শুধু বৈজ্ঞানিক আর কারিগরী শব্দগুলো অন্য ভাষা থেকে আমাদের ধার করতে হয়েছে। এরপর আর কোনো সমস্যা থাকে নি।

ভিয়েতনামের ইতিহাসে সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্ম তুলনায় প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু জাতীয় আর গণতান্ত্রিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা এসেছে ক্যাথলিক পাদ্রীদের কাছ থেকে।

ইস্কুলের শিক্ষকেরাই সমাজের নতুন শিক্ষাগুরু। উত্তর ভিয়েতনামে ধর্মের বিরুদ্ধে কখনই প্রশাসনিক কোনো ফতোয়া জারি করা হয় না। শিক্ষকেরাও ধর্মকে সোজাসুজি ঘা দেন না। তাঁরা এমনভাবে মনগুলোকে গড়ে তোলেন যাতে ধর্মের প্রতি টান আপনা থেকেই চলে যায়।

উপমন্ত্রী কমরেড নো এরপর দেখালেন একটা ইস্কুলবাড়ির মডেল। ক্লাস-গুলো এক লাইনে নয়। যাতে বোমায় সব একসঙ্গে না ভাঙতে পারে। বাড়ি থেকে আগাগোড়া ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে ইস্কুল পাঠিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। তাছাড়া ক্লাস ঘরের চারপাশে মাটির পুরু দেয়াল। বোমার টুকরো যাতে ছিটকে আসতে না পারে। যে-সব এলাকায় বিপদ একটু বেশি, সেখানে মাটির নিচে ক্লাসঘর। মাথার ওপর বেতের সিলিং থাকায় পেলেট বোমা তাতে ঠেকানো যায়। ফলে, বিমান আক্রমণের মধ্যেও ক্লাস চলতে পারে। কিন্তু আক্রমণ খুব বড় রকমের হলে মাটির নিচে সুড়ঙ্গে আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা আছে। বিমান আক্রমণের সংকেত হলে মাটি-কাটা আর ফার্স্ট-এডের দল তৈরি থাকে। কেউ শেল্টারে বা ট্রেঞ্চে মাটি চাপা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মাটি কেটে তাকে উদ্ধার

করা হয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্যে শেল্টার নির্দিষ্ট করা থাকে। যাতে কাউকে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।

সন্ধ্যেবেলায় এলেন বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড উই। ওঁদের ইচ্ছে আমরা যেন আমাদের এখানে থাকার মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াই।

তার মানে, কলকাতায় ফিরতে কমপক্ষে আরও দু সপ্তাহ। অথচ পূর্ব বাংলার খবরের জন্যে মনটা খুব আনচান করছে।

১৪

ব্রেকফাস্টের পর সোজা চলে গেলাম হোটেলের একতলায় মিটিং ঘরে।

উত্তর ভিয়েতনাম লেখক সঙ্ঘের কবি নুয়েন হুয়ান শান আমাদের নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন: 'ইনি কমরেড নুয়েন ভান বাং। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নামকরা গল্প-লেখক। এঁর অনেক লেখা ইংরিজি আর ফরাসীতে অনুবাদ হয়েছে। কিছুদিন উত্তর ভিয়েতনামে এসেছিলেন লেখবার জন্যে। তারপর আবার চলে যান। গত আট বছর তাঁর কেটেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষ আর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। দক্ষিণে থাকতেন 'চান হিউ মিন্' নামে। ফিরেছেন মাত্র কয়েকদিন। কমরেড বাং এখন দক্ষিণ ভিয়েতনাম লেখক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি। তাঁর অনেকগুলো উপন্যাস। 'মেকঙের উত্তাল তরঙ্গ,' 'ঐ আমাদের সায়গন,' 'উ মিন অরণ্য।' আমাদের ভাষা এক, দেশ এক—অথচ দেখুন, ওঁর নাম দুটো।'

ভিয়েতনামী বন্ধুরা যখন যা কিছুই বলেছেন তাঁদের নিজেদের ভাষায়। আমাদের দোভাষী তা ইংরিজিতে তর্জমা করে দিয়েছেন। যাঁরা ইংরিজিতে বলতে পারেন, তাঁরাও কিন্তু ভিয়েতনামী ভাষাতেই তাঁদের বক্তব্য বলেছেন।

কমরেড বাং সংক্ষেপে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কথা আমাদের বললেন:

'আপনারা কদিন আগে থান হোয়াতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল বাহিনীর বন্দীদের দেখেছেন। ওদের যদি বলতেন—তোমাদের রেশন কাটা যাবে না,

সত্যি কথাটা বলো তো, ওরা তাহলে বলত—হানয় বিরস আর সায়গন হল ফুর্তির জায়গা।'

'সত্যি, বাইরে থেকে দেখে সায়গনকে ফুর্তির জায়গা বলেই মনে হয়। রাস্তায় রাস্তায় চটকদার বিদেশী বই-কাগজের ছড়াছড়ি। যত সব অসার ঠুনকো বিষয়বস্তু। তাতে বলা হয়, সাহিত্য কোনো কাজের নয়। সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য নেই। অন্য জায়গায় এইসব বই-কাগজ পড়ে কী ফল হয়েছে জানি না। তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এর পরিণাম ভাল হয় নি। থান হোয়াতে যে বন্দীর দলটাকে দেখলেন, ওরা অমানুষ বনেছে এইসব বই-কাগজ পড়ে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভালো লোকের অভাব নেই। কিন্তু তাদের মাথা খাচ্ছে এইসব মার্কিনী বই-কাগজ। কানে মন্ত্র দিচ্ছে এই বলে: আজকের মজা এই বেলা লুটে নাও, কালকের কথা ভেবো না। পুতুল বাহিনীর সৈন্যদের কোনো আদর্শের বালাই নেই। তারা পশুরও অধম। ধরা পড়লে ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়। ওদের তখন কেবল ভয় মার খাওয়ার, রেশন কাটা যাওয়ার, নিত্য প্রয়োজনের জিনিস না পাওয়ার। মার্কিন অপসংস্কৃতির বিষবৃক্ষের ফল এরা।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চলে গেলে দেখবেন সম্পূর্ণ অন্য ছবি।'

এ ছবির কথা উত্তর ভিয়েতনামে এ-কদিনে যেমন অনেকের মুখে শুনেছি, তেমনি তার প্রমাণ পেয়েছি বেশ কিছু ডকুমেণ্টারি ছবিতে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো জায়গায় বোমা পড়তে কিংবা কামানের গোলা এসে ফাটতে পারে। তবু কোথাও যদি জাতীয় সংস্কৃতির কোনো অনুষ্ঠান হয় আট দশ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে লোক আসবে। সবাই আসবে দিনে দিনে। এসে ট্রেঞ্চ খুঁড়বে। তারপর ট্রেঞ্চের মধ্যে সপরিবারে বসে অনুষ্ঠান দেখবে।

কমরেড বাং বললেন:

'একটা কথা মনে রাখবেন, দক্ষিণেই থাকি আর উত্তরেই থাকি—শত বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমাদের দেশ এক, জাতি এক, ভাষা এক, জাতীয় সাহিত্য এক। কমরেড তো হিউয়ের কথাই ধরুন না কেন। উত্তর ভিয়েতনামে থাকলেও তিনি তো দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই লোক। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যে ছত্রে ছত্রে পাবেন দক্ষিণের দৃশ্য, সেখানকার মানুষ আর বিপ্লবী সংগ্রাম। এ জিনিস আরও অনেকের লেখাতেই পাবেন। উত্তরখণ্ড হল আমাদের জাতির আর সাহিত্যের লালনভূমি। ফরাসীরা সেইজন্যেই হানয়কে করেছিল সারা

দেশের শিল্পসংস্কৃতির কেন্দ্র। সায়গনকে লোকে মনে করে ব্যবসার কেন্দ্র— ফুর্তির জায়গা। এককালে হানয়ে বই-কাগজ ছাপা হয়ে সায়গনে যেত।'

পঁয়তাল্লিশ সালের অগস্ট বিপ্লবের পর দক্ষিণে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ হতে থাকে। সৈনিক লেখক হুয়েন এক উপন্যাস লিখে পুরস্কার পান। বুই ডুক আইয়ের একটি উপন্যাসের ফরাসী তর্জমা বেরোয়। এঁরা দুজনেই এখনও দক্ষিণেই আছেন। এই সময় বাহান্ন সালে কমরেড বাং তাঁর 'মহিষ' উপন্যাসটি লেখেন দক্ষিণে বসে।

চুয়ান্ন সালে জেনেভা চুক্তির পর দক্ষিণের অবস্থা একেবারে বদলে গেল। সৈনিক আর লেখকদের মধ্যে অনেককেই তখন উত্তর ভিয়েতনামে চলে আসতে হয়। যারা দক্ষিণে থেকে যায়, ধরা পড়ে তাদের অনেকেই হয় কারারুদ্ধ, নয় নির্বাসিত বা নিহত হয়।

কমরেড বাং বললেন :

'চুয়ান্ন সালে আমি উত্তরে চলে এলেও আমার মন কাঁদত দক্ষিণের জন্যে। শুধু আমি নয়, যারাই দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসেছে—তাদের মনে দেশবিভাগের এই ব্যাপারটা সব সময় কাঁটার মত বিঁধে থাকত। তেমনি আবার দক্ষিণের লোকদেরও প্রেরণাস্থল ছিল উত্তর ভিয়েতনাম—যেখানে পত্তন হয়েছে সমাজতন্ত্রের।

'আমরা যারা দক্ষিণের লোক উত্তরে থাকতাম, আমরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলতাম : 'দিন কাটে উত্তরে রাত কাটে দক্ষিণে। দিনের বেলায় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম, কিন্তু রাত্তির বেলায় দক্ষিণ আমাদের মনের মধ্যে হানা দিত। সত্যি বলতে গেলে, কী দিন কী রাত্তির -- কখনই আমরা দক্ষিণকে ভুলে থাকতে পারতাম না। কিছুদিন পর আবার আমি লুকিয়ে দক্ষিণে চলে যাই।

'চুয়ান্ন থেকে উনষাট—এই ছ বছর আমাদের লোকদের খালি হাতে মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। সাহিত্যের দিক থেকে এই ক'বছরকে আমরা বলি 'অন্ধকার যুগ।' ষাট সাল থেকে দক্ষিণে দেখা দেয় বিদ্রোহ আর বিপ্লবের জোয়ার। পঁয়ষট্টি থেকে মার্কিনরা ব্যবহার করতে থাকে বি-৫২ আর বিষাক্ত ধোঁয়া। এ সত্ত্বেও লোকে বলেছে, চূড়ান্ত দুর্দিন—চুয়ান্ন থেকে উনষাট—আমরা পেরিয়ে এসেছি। তখন ছিল খালি হাত। আমরা পড়ে

পড়ে মার খেয়েছি। এখন আমরা সশস্ত্র। এখন ন নম্বর সড়কে আমাদের সৈন্যরা বিমানকামান নিয়ে লড়ছে।

'কিন্তু সেই দুর্দিনের ভেতর দিয়ে একটা সত্যকে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। আমরা জেনেছিলাম—শিল্পসংস্কৃতি আমাদের অস্ত্র। দক্ষিণের জেলখানাগুলোতে কয়েদীদের কাছ থেকে আমরা এই সময় অনেক লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করেছি। জেলে বসে অনেকেই তখন লিখেছেন। সে-সব লেখা হয়ত খুব উঁচুদরের নয়, কিন্তু সে-সব লেখা পড়ে কত লোকে যে হাসিমুখে সাংঘাতিক যন্ত্রণা আর অত্যাচার সহ্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

'একজনের গল্প বলি। আঠারো বছরের একটি মেয়ে। তার নাম হুয়েন থি চাউ। সে বিয়ে করেছিল লে হং তু বলে একটি ছেলেকে। সায়গনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত খুন হলে বেড়াজাল ফেলে ছাত্র আর শিক্ষকদের ধরা হয়। তু এই সময় ধরা পড়ে। বিচারে ঠিক হয় সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এমন গণআন্দোলন দেখা দিল যে, শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত বদলে কারাদণ্ড করতে হল।

'এদিকে কিন্তু তু ধরা পড়ার আগেই পুলিশ এসে চাউকে ধরে নিয়ে যায়। জেলখানায় চাউ অসাধারণ বীরত্ব দেখায়। অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও সে একটি কথাও বলে নি। এই সময় চাউ একদিন জানতে পারে তার স্বামীর ধরা পড়া এবং ফাঁসির হুকুমের কথা। এরপর শুরু হয় চাউয়ের ওপর প্রচণ্ড দৈহিক নির্যাতন। তার ফলে, সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর চাউ তার রক্তাক্ত আঙুল দিয়ে কালো দেয়ালের গায়ে নখের আঁচড়ে একটি কবিতা লেখে। চাউ সায়গনে পড়লেও জীবনে এর আগে কখনও কবিতা লেখে নি। চাউয়ের জীবনের সেই প্রথম কবিতাটি হল এই :

'জীবনের কাদায় কখনও নোংরা হয় নি
আমার শ্বেতশুভ্র জামা।
আমি কখনও দেখি নি গোলাপী স্বপ্ন
কিন্তু আজ আমি এ কী আতান্তরে
পড়েছি।
আমার সাদা জামা সাদা রাখব
এই আমার পণ।'

(ভিয়েতনামী ছাত্রীদের বরাবরের পোশাক হল সাদা কামিজ। কিন্তু মার্কিনরা এসে এখন নানারকম ফুল-তোলা নক্সাদার রঙীন জামার আমদানি করেছে। এখানে চাউয়ের সাদা জামার তাই বিশেষ অর্থ আছে। চাউকে যখন জেলে নিয়ে যায় তখন জামা সাদা ছিল না—ছিল ছেঁড়া আর রক্তাক্ত। তবু সাদা পোশাকের কথাই সে সারাক্ষণ ভেবেছে—কারণ, শুভ্রতা হল একদিকে জাতীয়তাবাদ আর অন্যদিকে স্বামীর প্রতি নিষ্ঠার প্রতীক।)

'এই কবিতা লেখার পর চাউকে যুব সংস্থা আর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেওয়া হয়। হাজার নির্যাতন করেও চাউকে যখন কিছুতেই টলানো গেল না, কর্তৃপক্ষ তখন তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তেষট্টি সালে চাউ একবার বিদেশ যাওয়ার পথে উত্তর ভিয়েতনামে এসেছিল। চাউকে দেখে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ কিভাবে বিশেষ অবস্থায় পড়ে কবিতা লিখে ফেলে, নিজেকে উন্নত করে, মানুষকে সাহস দেয়।

'আমাদের লেখকেরা পাহাড়েই থাক আর বনেই থাক—সমানে লিখে চলেছে। সব কিছু ছাপাও হয় না। তবু হাতে হাতে ঘোরে। সাহিত্যের মাপকাঠিতে খুব উঁচুদরের না হলেও এসব লেখার দাম আছে।

'চুয়ান্ন থেকে উনষাট ভারি কষ্টে গেছে। জিয়েম তখন চুটিয়ে তার ছবি বেচছে। যার ঘরে জিয়েমের ছবি থাকবে না তার গর্দান যাবে। লোকে সে ছবির দিকে চেয়েও দেখত না। লুকিয়ে রেখে দিত কমরেড হো চি মিনের ছবি। তা সে যত কাঁচা হাতেরই আঁকা হোক। সে ছবি ছিল সকলের প্রিয় ছবি।

'সায়গনের কাছেই আছে বিস্তীর্ণ জলা জায়গা। সেখানে সাম্পানের গায়ে সাম্পান বেঁধে ষ্টেজ বানানো হত। সেখানে হত মুক্তিযোদ্ধাদের সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান। শত্রুপক্ষ হামলা করলে চটপট সাম্পানে করে সবাই সরে পড়ত।

'অনেক সময় মুক্ত হওয়া নতুন অঞ্চল নিয়ে আমাদের কম মুশকিলে পড়তে হয় না। দীর্ঘদিন অত্যাচারের মধ্যে থেকে সেখানকার লোকজনেরা হাসতে তো ভুলে যায়ই, জোরে কথা বলতেও ভয় পায়। তাদের মন-মরা ভাব কাটাবার জন্যে গোড়াতেই পাঠাতে হয় নাচগানের দল। রাজনৈতিক প্রচার তার পরে।

'জুয়ং নক্ একবার একটা অভিজ্ঞতার গল্প বলেছিল। একবার সে এক

গ্রামে গেছে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে। হাত পা নেড়ে খুব বক্তৃতা দিচ্ছে, ভালো ভালো কথা বলছে—তবু শ্রোতাদের মধ্যে কোনো সাড়া নেই। না দিচ্ছে কেউ হাততালি, না নাড়ছে মাথা। জুয়ং নক্ বুঝল এখানে নিছক রাজনীতিতে কাজ হবে না। সে তখন জনপ্রিয় 'বাই চই' সুরে গান ধরল। গ্রাম্যসুর শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মনের ভাব কেটে গেল। সবাই হৈ চৈ করে বলে উঠল—এ আমাদের লোক, এ আমাদের। গানের কথাগুলো ছিল কমরেড হো আর রাজনীতি নিয়ে। জুয়ং নক্ তখন অবাক হয়ে তাদের জিগ্যেস করল—বক্তৃতায় এতক্ষণ তো একই কথা বলেছি। কিন্তু যখন গান করে বললাম তখন তোমরা সাড়া দিলে। ব্যাপারটা কী? তখন তারা বলল—মার্কিনরা এতদিন নানা রকল ছদ্মবেশে লোক পাঠাত, তারা এসে বক্তৃতা দিত। কমরেড হো চি মিনের কথাও তারা বলত, যাতে গ্রামের দেশভক্তদের তারা ধরতে পারে। কাজেই তুমি এসে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলে, তোমার কথায় আমরা মোটেই কান দিই নি। কিন্তু চেনা সুরে যেই গান গাইলে, তখনই ধরে ফেললাম তুমি আমাদের লোক।

'কমরেড হো চি মিন ভারি সুন্দর করে বলেছেন: শিল্পসংস্কৃতি হল রণাঙ্গন; লেখকশিল্পীরা হলেন যোদ্ধা; কলম আর বাদ্যযন্ত্র হল অস্ত্র।

'পঞ্চান্নর আগে পর্যন্ত আমাদের ছিল একটাই কাজ—যুদ্ধ করা। তারপর যখন মুক্তিফ্রন্ট আর লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ গড়ে উঠল, তখন আমরা হলাম একদিকে লেখক অন্যদিকে যোদ্ধা। সায়গনে থাকার সময় আমি শুধু লড়াই করেছি· তারপর মুক্তাঞ্চলে চলে গিয়ে লিখেছি উপন্যাস—'ঐ আমার সায়গন'! আমি যদি তখন শুধু দর্শক থাকতাম, যদি না লড়তাম—তাহলে যেভাবে লিখেছি সেভাবে কখনই লিখতে পারতাম না।

'আমি একবার সোভিয়েত গিয়েছিলাম। সেখানে একজন আমাকে জিগ্যেস করেছিল—তুমি যে সায়গনে থাকো, তুমি তো নাম-করা লেখক। যদি ধরা পড়ো?

'বলেছিলাম: আমি তো একা যাই না। আমাদের সৈন্যরাও দল বেঁধে যায়। শত্রুদের পক্ষে আমাকে গ্রেপ্তার করা সহজ নয়।

'তাছাড়া লেখক হিসেবে আমার তো আর এমন অধিকার থাকতে পারে না যে, যদি দরকার হয় তাহলেও আমি ধরা পড়ার ঝুঁকি নেব না। শত্রুর

সামনাসামনি হলে আমাকে বরণ করতে হবে যোদ্ধার ·ভূমিকা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সব লেখক শিল্পীদেরই মনের ভাব এই।

'আমাদের একজন খুব প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। তাঁর নাম হুয়েন থি। সায়গনের রাস্তায় লড়াই করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দেন। তাঁর লেখা ছোট গল্প আর রিপোর্টাজ উত্তর দক্ষিণে সমান জনপ্রিয়।

'আরেকজন আছেন ডকুমেণ্টারি চলচ্চিত্রকার। তাঁর নাম ফাম থাক। ডং সোয়াইতে একবার তিনি যুদ্ধের ছবি তুলছিলেন। শত্রুপক্ষ প্রবল গোলা-বর্ষণ করছে। তার আড়ালে এগিয়ে আসছে আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী। শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ির ছবি তুলতে তুলতে লাফ দিয়ে তিনি তার ওপর উঠে পড়লেন। তার ভেতর ছিল শত্রুপক্ষের একজন সৈন্য। ফাম থাক প্রথমে তাকে পিস্তল বার করে মারলেন। তারপর ছবি তুললেন।

'চিত্রশিল্পীদের বেলায়ও তাই। তাঁরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে সৈন্যবাহিনীব সঙ্গে চলেন। যোদ্ধারা যখন তাঁদের আপন বলে মনে করেন, তখন তাঁরা রণক্ষেত্রেই আয়োজন করেন ছবির প্রদর্শনীর।

'হো-র কথামতো, শিল্পসংস্কৃতির রণাঙ্গনে আমাদের যোদ্ধা হতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। মার্কিনদের বিরুদ্ধে আমাদের আজ কঠিন লড়াই।

'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে সফরে যায় আমাদের নাচগানের দল। তাতে থাকে সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে। তাদের পিঠে থাকে ঝোলা। ঝোলার মধ্যে থাকে ওষুধপত্র, নিত্যনৈমিত্তিক জিনিস আর জামাকাপড়। সেই সঙ্গে কাঁধে থাকে রাইফেল আর হাতে কোদাল। ঝোলা নামিয়ে তাদের প্রথম কাজই হয় কোদাল দিয়ে ট্রেঞ্চ কাটা। আমাদের মুক্তাঞ্চল যদিও বিরাট এবং আমাদের মুক্তিবাহিনীও খুব বিশাল—তবু মার্কিনরা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় বোমা ফেলতে আর গোলা ছুঁড়তে পারে। যে কোনো মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থাকতে হয়। ট্রেঞ্চ কাটা শেষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পালা শুরু হয়।

'১৯৪৫ সাল থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে চলেছে একটানা মুক্তির লড়াই। সাধারণ সৈনিক বা সেনাধ্যক্ষ, গেরিলা বা লেখকশিল্পী—কেউই বেতন পায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা থাকে, উৎপাদনে অংশ নেয়, তারা সাধারণের সুখদুঃখের শরিক। অন্য সকলের মতই লেখক শিল্পীদেরও মোটের

ওপর তিনটি কাজে সমানভাবে সময় দিতে হয়। এক ট্রেঞ্চ বা শেল্টার খোঁড়া, দুই খাদ্যের সংস্থান, তিন পেশাগত কাজ।

'মাটি খুঁড়ে গর্ত করে তার নিচে থাকার ব্যবস্থা। তারপর চাষবাস, মাছ ধরা আর শিকার করা। এরপর সময় পেলে লেখকেরা লিখবে।'

কমরেড বাং বললেন: 'তবু কিন্তু আমাদের লেখা কখনও বন্ধ হয়নি। আমাদের লেখকদের ঝোলায় সব সময় পাবেন পাণ্ডুলিপি। ট্রেঞ্চে কিংবা শেল্টারে বসে ঘস ঘস করে চলে তাঁদের কলম। কম সময়ের মধ্যে কম জায়গায় কম কথায় আমাদের লিখতে হয়। তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামে ছোট গল্প আর রিপোর্টাজেরই চল বেশি। আমাদের দেশে যেমন গেরিলারা অনেক সময় বড় দরের যুদ্ধও করে, তেমনি এইসব ছোট ছোট লেখাতেও অনেক সময় বড়দরের সাহিত্যও হয়ে থাকে।'

দক্ষিণ ভিয়েতনামের একজন নামকরা কবি জ্যাং নাম। ফরাসিদের বিরুদ্ধে যখন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয় তখন তাঁর বয়স ষোল। তারপর কখনও সাইকেল রিক্সা চালিয়েছেন, কখনও রবার বাগানে মজুরি করেছেন, কখনও ব্যবসাদারের গদিতে করেছেন খাতা লেখার কাজ। তারপর গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজও তিনি মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক। তাঁর কবিপ্রতিভার উৎসে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

হুয়েন চুং থান ('সাহু বন'), ফান তু ('প্রত্যাবর্তন'), হুয়েন চি চুং ('মূক গ্রামের চিঠি')—এঁদের বছরের অর্ধেক সময় গেছে জমিতে ফসল ফলানোর কাজে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি কবি ফাম মিন দাওকে বাস করতে হয়েছিল কঠিন এলাকায়—গাছের পাতা আর বুনো ওলকচু খেয়ে কাটাতে হয়েছে। 'হন ডাৎ'-এর লেখক আন্ ডুক্ দশ বছর বয়স থেকে দেখে আসছেন চারপাশে বোমা আর কামানের গোলা। হুয়েন ডুক্ থুয়ান লুয়ো ছ বছর অসহ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন সায়গনের জেলে।

কমরেড বাং বললেন: 'আমাদের একজন লেখক ভারি সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন—ঘরের বাইরে গেলেই বীরের দেখা পাবে। কথাটা খুবই ঠিক। চারপাশে একটু তাকালেই এমন সব লোক পাওয়া যাবে, যাদের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত গল্পের খনি। বিষয়ের কোনো অভাব নেই। পড়ে রয়েছে, শুধু কুড়িয়ে নিলেই হয়। জীবন থেকে নিয়ে জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। এটাই তো লেখকের কাজ।

'অনেক মুশকিলের মধ্যে আমাদের লিখতে হয়। আমরা এ দাবি করি না যে, আমরা খুব মহৎ-সাহিত্য রচনা করেছি। করবার মত অনুকূল অবস্থাও নয়। কিন্তু এসব লেখায় আছে প্রাণের ছোঁয়া। ভবিষ্যতে যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হবে, তার অব্যর্থ বীজ।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট তৈরি হওয়ার আট মাস পর আমাদের লেখক শিল্পী সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। শিগগিরই আমরা তার সম্মেলন করব। এই দশ বছরে আমরা কতটা কী করেছি তার যেমন হিসেব নেব, সেই সঙ্গে ভুলত্রুটি কাটিয়ে সার্থক নতুন সৃষ্টির সংকল্প নেব। এখনও আমাদের অনেক লেখক শিল্পী জেলে কিংবা গুপ্তভাবে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে আছেন। কেউ কেউ বন্দীনিবাস থেকে পালিয়ে এসে মুক্তাঞ্চলে আছেন। লিভান সাম বিয়েন হোয়ার জেল থেকে পালিয়ে মুক্তাঞ্চলে আসেন। আমাদের সভাপতি চান হিই চাং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সায়গনে গুপ্তভাবে থেকে তারপর মুক্তাঞ্চলে চলে আসেন। এখনও আমাদের ইউনিয়নের অনেক সদস্য নাম ভাঁড়িয়ে সায়গনে আছেন।'

এ-কদিনে বুঝে গিয়েছি এ যাত্রায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে যেতে পারার কোনো আশা নেই। সেই সঙ্গে আমাকে ভালো করে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু সাধ নয়—সেই সঙ্গে সাধ্যও থাকা চাই। শরীরের আর মনের। তাছাড়া মার্কিনরা এদেশের জলহাওয়ায় যেভাবে বিষ ঢেলেছে, মাইন ফেলে রেখেছে—তাতে বাইরের উটকো লোকদের বিপদ প্রতি পদে।

দিল্লিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক লেখক আমাকে বলেছিলেন, 'পাহাড়ী রাস্তায় তোমার হাঁটার অভ্যেস আছে?' আমার জীবনে পাহাড় বলতে বক্সা জেল। দক্ষিণে যাওয়া পাছে ফসকে যায়, তাই তাড়াতাড়ি ঘাড় কাত করেছিলাম। তখন সেই লেখক আমাকে বলেছিলেন 'হানয়ে আমাদের দপ্তরে গিয়ে বললেই ওরা তোমাকে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবে।'

আজ বিকেলে হানয়ের সেই দপ্তরে সশরীরে যখন হাজির হলাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামে যাওয়ার কথাটা ভরসা করে বলতেই পারলাম না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুজন নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি আমাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একজন হুয়েন ফু সোয়াই, আরেকজন কান লাক তুয়েন।

ওঁরা বললেন—

'আপনারা আসায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। এখন আমাদের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব বদলেছে। প্রগতিশীল মানুষের আন্দোলনের দরুনই তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধিরা আপনাদের দেশে যে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছে, তার জন্তে আমরা কৃতজ্ঞ।

'সম্প্রতি বেশ কয়েকটা বড় লড়াইতে জিতেছি। সায়গনের পুতুল সরকারের পক্ষে এ আঘাত সামলানো শক্ত। ওদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়েছে ওদের বাহিনীর যারা কর্তা, তাদের মধ্যে যেমন খেয়োখেয়ি বাড়ছে— তেমনি মার্কিনদের সঙ্গেও ওদের অসদ্ভাব বাড়ছে। ভিয়েতনামীদের দিয়ে ভিয়েতনামীদের কোতল করার নীতিতে ওরা কেউই এখন আস্থা রাখতে পারছে না। আবার মার্কিন বিমান বহর আর সৈন্যসামন্ত দিয়েও তেমন কাজ হচ্ছে না। ওরা এখন পড়েছে উভয় সঙ্কটে।

'মার্কিন কাগজ বাল্টিমোর সান বলছে—দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনী হেরেছে, তার কারণ ওরা মার্কিন সাহায্য পায় নি। আর মার্কিনরা বলেছে— দক্ষিণ ভিয়েতনামে সৈন্যবাহিনী একদম ওঁছা। ওরা লড়তে জানে না।

'পুতুল বাহিনীর সেপাইরা যে যুদ্ধ করতে চাইছে না, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডং হা-তে মোতায়েন ৫৪তম ডিভিশনের সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে তাদের কমাণ্ডারকে গুলি করে মেরেছে। ফু ল-কে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা তাদের কোম্পানির ভারপ্রাপ্তকে খুন করেছে। তারাও লড়তে চাইছে না। ব্যারাকের লোকেরা ফ্রণ্টে যেতে নারাজ। পাছে জোর করে পাঠানো হয়, তার জন্য নিজের পায়ে গুলি করে জখম হচ্ছে। ডা নাঙের হাসপাতাল আহত সৈন্যে ভর্তি।

'ভয়ে সৈন্যদের যত হাত-পা সিঁধিয়ে যাচ্ছে, সেই সুযোগে সাধারণ লোকের আন্দোলনও তত বাড়ছে। এক সপ্তাহ আগে কোয়াং নান প্রদেশে তাম্-কি শহরের পঞ্চাশ হাজার লোক মিছিল করে সেখানকার মেয়রকে ঘেরাও করে। তারা বলে—আমাদের স্বামীদের, আমাদের ছেলেদের ফিরিয়ে দাও মেয়র কোনরকমে পালায়। তারপর মার্কিনরা সাঁজোয়া গাড়ি আর মিলিটারি পুলিশ পাঠায়। লোকে তাদের ছেঁকে ধরলে তারা পিঠটান দেয়।

'সায়গনের আশপাশ থেকে মিছিলের পর মিছিল বেরিয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে পুতুল বাহিনীকে তুলে নেওয়ার দাবিতে। এই আন্দোলন

ক্রমশ বিরাট আকার নিচ্ছে। সায়গনের কাগজগুলো এখন প্রকাশ্যে সরকারকে তুলো ধোনা করছে। নিক্সনের ভিয়েতনামীকরণের নীতির তীব্র সমালোচনা করে একটি কাগজে লিখেছে: 'দশ লক্ষ মৃতদেহ কি যথেষ্ট নয়?' কড়া ভাষায় লেখার জন্যে গত কয়েক সপ্তাহে ডজন ডজন পত্রিকাকে হয় জরিমানা, নয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বহু কাগজের সম্পাদক এই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একজন পরিষদ সদস্য সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নিক্সনের নীতির কড়া সমালোচনা করে। এ থেকে বোঝা যায়, সরকারি বাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরেছে আর সেই সঙ্গে মার্কিনদের সঙ্গে মোটেই বনছে না।

'আমরাও যুদ্ধ চাই না। আমরা চাই শান্তি, যার ভিত্তি হবে স্বাধীনতা। সায়গনের প্রত্যেকটি কাগজ বলছে, শান্তি চাই। কেননা শান্তির কথা না বললে লোকে কাগজ কিনবে না। সায়গনের রাজনৈতিক নেতারাও প্রত্যেকে শান্তির কথা বলছে—তা না হলে লোকে তাদের বিশ্বাসঘাতক বলবে।

'শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র, জনসাধারণ—সকলের ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট আজ এমন কি পুতুল বাহিনীর মধ্যেও দেশের ডাক পৌঁছে দিচ্ছে। তার পাশাপাশি চলেছে বৌদ্ধদের, আহত সৈন্যদের আর সর্বব্যাপী শান্তির আন্দোলন। এই পাঁচ আন্দোলনের ধারায় প্রত্যেকেরই সমস্ত দাবি গণতন্ত্র আর সুস্থ জনজীবনের এক মোহনায় এসে মিলছে। সেই সঙ্গে আওয়াজ উঠছে—মার্কিনদের এদেশ থেকে হটাও। ভাঙা দেশ জোড়া দাও। শান্তি আনো।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামের কারখানায় কারখানায় চলেছে মজুরি বৃদ্ধির জন্যে আর ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট। কাজ বন্ধ হচ্ছে সামরিক বন্দরে আর মার্কিনদের অস্ত্রগুদামে। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে, মার্কিন যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে নিত্য নতুন ফ্রণ্ট। এ সমস্তই বেসামরিক আন্দোলন। কোনোটা নিচু আবার কোনোটা উঁচু পর্যায়ের। কোথাও সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত, কোথাও বা দরকার মত আধা-আইনী আন্দোলনের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। কখনও ধর্মঘট, কখনও মিছিল, কখনও সত্যাগ্রহ, কখনও প্রস্তাব পাশ।

'আবার কখনও বা দরকার হলে বে-আইনী কাজ। শহরে এ-কাজ হয় গেরিলা কায়দায়। যেমন, অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে মার্কিনদের সামরিক গাড়ি পোড়ানো। কোনো কোনো জায়গায়—যেমন, বিন থিনের দক্ষিণে

মেকং নদীর ধারে— লোকে বিদ্রোহ করে সরকারি শাসনব্যবস্থা উল্টে দিয়ে বিপ্লবী ব্যবস্থা চালু করেছে। শহর এলাকাগুলোতে গেরিলাদের আক্রমণে কেন্দ্রীয় শাসনের অবস্থা আজ টলমল। স্থানীয় এলাকাগুলোতে এ-জিনিস অনেক আগেই ঘটেছে।

'আমরা অনেক আগেই চেয়েছি—স্বাধীনতা, শান্তি আর নিরপেক্ষতা। লোকে আজ সেই পথেই এগিয়ে চলেছে।

'আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের কথা তো সারা দুনিয়া জানে। লাও আর কম্বোজের সঙ্গে মিলে ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী আজ একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে। কোয়াং নান প্রদেশে বিপ্লবী সৈন্যরা মার্কিন গোলন্দাজ বাহিনীকে ছাতু করে দিয়েছে। সবচেয়ে মোক্ষম লড়াই হয়েছে ইন্দোচীনে। ওরা ভেবেছিল দক্ষিণ লাও-র হো চি মিন সড়কে বিঘ্ন ঘটিয়ে সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দেবে। ওরা যে তা পারেনি, ওদের কাগজগুলোই এখন তা স্বীকার করছে।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমাদের যুদ্ধ গেরিলা, গণবাহিনী আর নিয়মিত ফৌজ —এই তিন বলে বলীয়ান। দেশের সমতলে, কেন্দ্রে, পাহাড়ে সমানে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানের পর অভিযান চলেছে। মার্কিনদের আর তার ক্রীতদাসদের 'ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা' বানচাল হয়ে গেছে। মারের ভয়ে পুতুল বাহিনীর সৈন্যদের হাঁটু কাঁপছে। তাদের মনোবল আর শৃঙ্খলার বালাই নেই।

'কিন্তু মার্কিনদের আক্রমণাত্মক নীতির ফলে আমাদের দেশ, আমাদের জীবন বিপর্যস্ত। আমাদের উত্তরপুরুষের জীবনে তারা এনেছে ভয়ঙ্কর অভিশাপ। কিন্তু নিক্সনের নীতি যত নিষ্ঠুরই হোক, দক্ষিণ ভিয়েতনামে সে নীতি পরাস্ত হচ্ছে।

'আমাদের জয় আর আমেরিকার পরাজয়ের কারণ আছে। আমরা জয়ী হতে চলেছি আমাদের পার্টির নির্ভুল নেতৃত্বে, জনসাধারণের অজেয় শক্তিতে আর সমাজতান্ত্রিক দেশ আর প্রগতিশীল মানুষের দুনিয়াজোড়া সমর্থনে। মার্কিনদের মানববিরোধী পশুশক্তিই ওদের পরাজয়ের মূলে। ওরা হিসেবে ভুল করেছিল। ওরা ভেবেছিল, ওদের যখন অগাধ টাকা আছে আর নিদারুণ অস্ত্রশক্তি আছে, তারই জোরে ওরা আমাদের দেশবাসীকে হারাবে। ওরা লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত ছুঁড়েছে। তবু পারছে না।

'ওরা আমাদের খোঁজখবর নেবার জন্যে মাঠেঘাটে একরকমের বার্তাপ্রেরক

যন্ত্র নামিয়েছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে মাটিতে ঠিক যেন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের লোকজনেরা দেখলেই তা ধরে ফেলতে পারে। তারা ছুটে গিয়ে ঐ 'গাছের' ডালগুলো জুড়ে দেয়। ব্যস, তাহলেই যন্ত্রটা অকেজো হয়ে পড়ে।

সেই সঙ্গে আমরা কূটনীতির লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছি। সংগ্রামের সমস্ত পথই আমরা খোলা রেখেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো স্বাধীনতা, শান্তি, নিরপেক্ষতা। শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির ঘৃণার জোরে আমরা লড়ছি।'

১৫

থান হোয়া থেকে ফেরার পর মন উতলা হয়ে আছে দেশের জন্যে। বি বি সি-র যা খবর তাতে মন ভালো থাকার কথা নয়। ভয়েস অব আমেরিকার খবরে যত কম কান দেওয়া যায় ততই ভালো। দূতাবাসের ভারতীয়রা দেখা হলেই ভরসা দেয়। ইয়াহিয়া যতই গুলি করুক আর বোমা ফেলুক, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই পারবে না। ভারতীয় হয়েও আমি বাঙালী ; সেইখানে আমার ব্যথার জায়গা। কিন্তু বাঙালী হয়েও আমি ভারতীয় ; সেইখানে আমার জোর।

প্রায়ই কমরেড তে-হান রেডিও শুনে এসে একটা দুটো খবর দেন। লড়াইয়ের সূত্রে অদ্ভুত উচ্চারণে এমন এমন সব নাম বলেন অনেক সময় তা ধরে উঠতে পারি না। আসলে বিভক্ত দেশের মানুষ বলেই তিনি বুঝতে পারেন আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে।

তে-হানের সমস্ত কবিতায় দ্বিখণ্ডিত ভিয়েতনামের হৃদয়বেদনা। যার সঙ্গেই দেখা হয় বলে : আমাদের এই ভাঙা দেশ যখন জোড়া লাগবে তখন এসো— দেশ জুড়ে আনন্দের বান ডাকবে।

ব্রেকফাস্টের পর আজ এক প্যাগোডা দেখতে যাওয়ার কথা।

শহর ছেড়ে বেরোবার রাস্তাটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। চেকপোস্ট পেরোবার পরেও দুপাশে অনেকখানি লোকালয়।

এখানে এসে পর্যন্ত একটা জিনিস লক্ষ্য না করে পারি নি। শহরই হোক

আর গ্রামই হোক, মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক—প্রত্যেকেরই খুব সাদাসিধে কিন্তু ছিমছাম পোশাক। ছেঁড়া কিংবা তালিমারা পোশাক আমার কখনও চোখেই পড়ে নি। অথচ রেশনে যা জামাকাপড় বরাদ্দ তাতে সারা বছর চালানো কঠিন।

রাস্তার দুপাশে তাকিয়ে মনে হচ্ছে বেশ সুজলা সুফলা অঞ্চল। হানয়ের ঠিক কোন দিক জানা নেই। উত্তর, না উত্তর-পশ্চিম?

একটা দুটো গ্রাম পেরোলেই ইটের ভাঁটি। গ্রামে মাটির দেয়াল আর থাকবে না। প্রত্যেকটি ইটখোলা সমবায় পরিচালিত।

দূর খুব কম নয়। বড় রাস্তা ছেড়ে ঘোরানো-প্যাঁচানো রাস্তা ধরে আসতে আসতে দুটো-চারটে বাড়ি দেখে মনে হল আগে বোধহয় জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল। ফরাসীদেরও কুঠি হতে পারে। এখন সবই দেশের সরকারের।

দুপাশে সারবন্দী গাছ; বীথির ভেতর দিয়ে গাড়ি এসে থামল এক পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড় বলতে টিলা।

সামনে পাথর কাটা সিঁড়ি উঠে গেছে টিলার মাথায়। উঁচু উঁচু তিন শো ছাব্বিশটি ধাপ। মাঝে মাঝে বসে জিরিয়ে নিতে হল। আসতে যেতে দেখলাম এদেশে ধর্মপ্রাণের সংখ্যা খুব কম নয়।

বেশ বড় প্যাগোডা। অনেক দিনের পুরনো। মার্কিনরা এখানেও বোমা ফেলতে ভোলে নি। সামনের ছাদের অনেকটাই বোমায় উড়ে গিয়েছিল। পুরনো কারুকাজের নকল করে ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করা হয়েছে। কোথায় কোথায় জোড়া হয়েছে তা দেখলে ধরা যায়। অন্দরমহলের মূর্তিগুলো বরাতজোরে ভাঙে নি।

সামনের জমিতে নানা রকম গাছ-গাছালি। পুরোহিতের বাড়ির উঠোনে তরিতরকারির বাগান। আপিসঘরে দেখলাম দুই বুড়ো বসে এক মজাদার গড়গড়া টানছে। গোল উঁচু বারকেশের মত একটা জিনিস টেবিলের ওপর বসানো। ওপরটা ঢাকা। দোয়াতদানির মত। ভেতরে জল। খোঁদলে তামাক ধরানোর ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে ধোঁয়া টানার জন্যে বাঁশের আধ ফুট লম্বা নল। গুড়ুক গুড়ুক করে আমিও বেশ খানিকক্ষণ টানলাম।

বাগানের ধারে দাঁড়ালে নিচে অনেক দূর অবধি দেখা যায় ধূপ হাতে করে ধর্মপ্রাণ যাত্রীরা আসছে প্যাগোডায়। বুদ্ধদেবের কাছে কী তাদের প্রার্থনা?

পৃথিবীতে শান্তি? মানুষের কল্যাণ? সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মুক্তি? ভিয়েতনামের লড়াই তো তারই জন্যে।

ফেরার সময় দেখলাম রাস্তায় রুট মার্চ করে চলেছে তরুণ সৈন্যের দল। পোশাকে কোনো চেকনাই নেই। ঘাড়ে বন্দুক। পিঠে ঝোলানো শোবার মাদুর আর ভাত খাওয়ার সানকি।

সন্ধ্যেবেলায় গেলাম তুয়ং অপেরা দেখতে। সোর্ড লেকের পাশ দিয়ে গিয়ে ডানদিকে ঘুরেছিলাম। অনেক দোকান পাট। বেশ জনবহুল পাড়া। সেই যে একদিন সার্কাস দেখতে এসেছিলাম, সে জায়গাটা মনে হচ্ছে এরই কাছে পিঠে। সার্কাসে আমার বরাবরই খুব টান। কিন্তু আমাদের দোভাষী নুয়েনের কেন অত আগ্রহ, সেটা বুঝেছিলাম দেখতে গিয়ে। খুব ভালো রিঙের খেলা দেখাচ্ছিল একজন। নুয়েন আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'ঐ যে এখন যে খেলা দেখাচ্ছে—ও আমার শালা।'

তুয়ং অপেরা হচ্ছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে।

পালার নাম 'ডে থাম'। যখন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই চলছিল, সেই সময়কার ঘটনা।

ফরাসীর বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে এক দেশভক্ত বুকে গুলি লেগে মারা যায়। লোকটি মৃত্যুর আগে তার পতাকা মেয়ের হাতে দিয়ে বলে, এই পতাকা সে যেন এমন কাউকে দেয় যে এর মান রাখবে। এর পর মেয়েটি সেই পতাকা নিয়ে সত্যিকার সংগ্রামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এক গ্রামে গিয়ে সে ডে থাম বলে এক মোড়লের দেখা পায়। তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তার কাছে মেয়ের মত থাকে। ইচ্ছে থাকলেও গোড়ায় গোড়ায় ডে থাম লড়াই করার ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। বউ, মেয়ে, দলের লোকজন—সকলে মিলে ডে থামকে সাহস দিতে থাকে। তখন ডে থাম তার মন বেঁধে নেয়। ফরাসী কর্তাব্যক্তি আর তার দেশী দালালদের কাছে গিয়ে সে সটান একদিন হাজির হয়। ডে থামকে তারা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

এদিকে মেয়েটি ভাবে, ডে থাম বোধহয় শত্রুর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে গেছে। ডে থামকে ফেরার জন্যে মেয়েটি শত্রু শিবিরে গিয়ে ধরা দেয়। জানতে পেরে ডে থাম কৌশল করে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে আনে। ফরাসীরা তখন ঘরে আগুন দিয়ে ডে থামকে পুড়িয়ে মারার জন্যে গুণ্ডা পাঠায়। ডে থাম এমন

ভান করে যেন সে বেহেড মাতাল। আগুন লেগে ঘর পুড়ে গেল। কিন্তু ডে থাম সেয়ানা। তার আগেই সে সরে পড়েছিল। তারই মতলব মত গ্রামের লোক রটিয়ে দিল ডে থাম মারা গেছে। তারপর তারা একটা খালি কফিন কবরস্থ করার ব্যবস্থা করল। ডে থাম মারা গেছে ভেবে ফরাসীরা এল গ্রাম আক্রমণ করতে। ডে থামের নেতৃত্বে জনবাহিনী আড়ালে ওৎ পেতে ছিল। গ্রামে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জয়ধ্বনিতে মুখরিত হলো গোটা প্রেক্ষাগৃহ।

খুব সহজ সরল কাহিনী। অনবরত গানের ভেতর দিয়ে সংলাপ। স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ তরঙ্গভঙ্গে ভিয়েতনামি ভাষা এমনিতেই খুব সুরেলা। তার ফলে, কোন্‌টা গদ্য আর কোন্‌টা গান আমাদের পক্ষে ধরা শক্ত। তাছাড়া আলো, প্রেক্ষাগৃহ, পোশাক, দৃশ্যপট—সবই খুব সাদাসিধে। ভাষা অজানা, সুর অচেনা। ফলে, আমার যে খুব ভাল লাগল তা নয়। কিন্তু লক্ষ্য করলাম হলসুদ্ধ সবাই মুগ্ধনেত্রে দেখছে।

হল থেকে যখন বেরোলাম তখন রাস্তা প্রায় ফাঁকা।

১৬

সকালে গেলাম চারুশিল্প সঙ্ঘে।

গেটে ঢোকার মুখে দেখলাম একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে। ভেতরে কিছু লোক বসে। গাড়ির ছাদে গোছা গোছা ছবির প্যাকেট তোলা হচ্ছে। একজনকে জিগ্যেস করে জানলাম, শিল্পীদের একটি দল যাচ্ছে ফ্রন্টে। ছবি আঁকতে আর ছবির প্রদর্শনী করতে।

দোতলার একটি ঘরে কয়েকজন শিল্পী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তার মধ্যে একজন মেয়ে শিল্পী। ভু থি কিম। ভিয়েতনামিদের নাম দেখে কে ছেলে কে মেয়ে বোঝা যায় না। নামের মধ্যপদে থি থাকলে একমাত্র তখনই বোঝা যায় তিনি মেয়ে। পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জিয়েপ মিন চাউ, হুয়েন ভান মুবি, নো মিন কাউ আর মাই ভান হিয়েন।

সব দেশেই বোধহয় লেখকদের চেয়ে শিল্পীরা কথা বলায় কম পটু। কাজেই খুব বেশি কথা হল না। সব ঘরেই দেয়ালে অনেক ছবি। তাঁরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব আমাদের দেখালেন।

কথাবার্তার ভেতর দিয়ে যেটুকু জানলাম, তা এই—

'পার্টি আমাদের বলে, ছবি আঁকবে তো সেইসব মানুষের কাছে যাও যারা মেহনত করে। শিল্পকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলো যাতে আজকের কাজগুলো সারা যায়। আমরা চেষ্টা করি দেশবিদেশের শিল্পচর্চা থেকে প্রেরণা পেতে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে ভারত আর জাপান আমাদের প্রেরণাস্থল। এদেশে একবার আমরা 'বৌদ্ধ যুগের ভারতশিল্প' বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। দিল্লীতেও আমাদের ছবির একটি প্রদর্শনী হয়েছিল।

'বিপ্লবের পর চুয়ান্ন সালে আমাদের সংস্কৃতিভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বাড়িতেই স্থাপিত হয় চারুশিল্প সঙ্ঘ। আমাদের শিল্পীদের যখন সম্মেলন হয়, পার্টির বড় বড় নেতারাও তাতে যোগ দেন। এমন কি কমরেড হো চি মিন তাঁর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সম্মেলনে এসেছেন।

'বিপ্লবের আগে শিল্পশিক্ষার বিশেষ কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এখন আমরা চারুশিল্পের উচ্চ বিদ্যালয় চালাচ্ছি। উৎপাদন শিল্পের জন্য পত্তন হয়েছে উচ্চ শ্রেণীর চারুশিল্প বিদ্যালয়। দলে দলে ছেলেমেয়েরা এখন এইসব জায়গা থেকে পাশ-করা শিল্পী হয়ে বেরোচ্ছে। তাছাড়া রং তুলি, ভাস্কর্য আর গ্রাফিক শিল্পের ব্যাপারে আলাদা করে শেখানোর ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া টেকনিক শিখে আসার জন্যে আমাদের ছাত্রদের আমরা বিদেশে পাঠাই।

'আমাদের শিল্পীরা অনেকে শিক্ষকতা করেন। অনেকে গণসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছবি আঁকার কাজ করেন। সরকার কিংবা পার্টি তাঁদের যখন যা কাজ দেয় তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে করেন।'

মাদাম ভু থি কিম বললেন, 'আমি এক সময়ে অনেক বইয়ের ছবি এঁকেছি। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বইও ছিল।'

রোদটা আজ ছিল বেশ চনচনে। ফিরে এসে লাঞ্চের পর ভিয়েতনামি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কমরেড তাই টেলিফোন করে আমাকে জাগিয়ে না দিলে ঘুম সহজে ভাঙত না।

কম্বোজের রাজদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তিনটেয়। ঘড়ি দেখে চক্ষুস্থির। তিনটে প্রায় বাজে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচে নামতে যাব, দোতলার

সিঁড়ির মুখে সকলের সঙ্গে দেখা। আমাকে আসতে বলে ওরা তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। আমি অবাক। একে দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর আবার এখন তিনতলায় কেন?

তিনতলার বারান্দা পেরিয়ে হোটেলের একটা বড় স্যুইট। দরজায় চোখ পড়তেই গোটা ব্যাপারটা জল হয়ে গেল। এই হলো বিপ্লবী কম্বোজের দূতাবাস।

রাজদূত আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। হোটেলের রেস্তোরাঁয় রোজ ওঁকে দেখছি। বয়সে খুবই তরুণ। ছেলেমানুষ বলা যায়। কম্বোজের রাজপরিবারের ছেলে বলেই মনে হয়। নাম ইউ সিম হুন।

টেবিলে ছিল একটা ছবির বই। চা খেতে খেতে পাতাগুলো ওল্টাচ্ছিলাম। ছবিগুলো দেখার আগে কম্বোজ কেমন দেশ, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

শুধু যে সুন্দর তা নয়। দেশ গড়ার কাজে রাজা যে প্রজাদের দিকে এভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাও আমার জানা ছিল না। বড় বড় যৌথ খামার। নতুন নতুন কারখানা। রাজাকে জীইয়ে রেখেও দেশের সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্র চাইছে। কী সুন্দর রাস্তাঘাট। স্টেডিয়াম।

রাজা সিহানুক বামপন্থীদের পছন্দ করলেও সময় মতো দক্ষিণপন্থীদের কড়া হাতে দমন না করায় দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার শিকার হলেন। সিহানুক যখন দেশের বাইরে, তখন মার্কিনদের সাক্ষীগোপাল লন নল কম্বোজের ক্ষমতা দখল করে বসল। এরপর রাজা সিহানুকের সমর্থনে কম্বোজে গড়ে ওঠে সংগ্রামী যুক্তফ্রণ্ট। তারপর থেকে কম্বোজের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মার্কিন আর তার দুই দালাল—দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর লন নল-বাহিনীর চলেছে লড়াই। সেই সঙ্গে মার্কিন অস্ত্রপুষ্ট থাই হানাদারদেরও তারা রুখছে।

কম্বোজের রাজদূত বললেন—

'এখন কী অবস্থা বলছি। লাওতে যা করেছে, সেইরকম কম্বোজেও শত্রুর দল বড়দরের আক্রমণ করবে ভেবেছিল। গত বছর মে-জুন মাসে পনেরো হাজার সৈন্য লাগিয়ে মুক্তাঞ্চলের ওপর ওরা বাহান্ন বার হামলা করে। কিন্তু তাতেও ওদের হটে যেতে হয়। ওরা সাত নং নৌবহর এনেছিল। চার নম্বর সড়কের যুদ্ধে আমরা ওদের দশ হাজার সৈন্য খতম করি। কম্পোনসং থেকে

নমপেন পর্যন্ত ছিল ওদের আক্রমণের বিস্তীর্ণ এলাকা। ওদের প্রায় ষোল আনা বিমানই আমরা ধ্বংস করেছি। ওদের একবারের আক্রমণেই আমরা মাটিতে ফেলেছি ওদের নব্বইটা প্লেন। সেই সঙ্গে রাজধানীর মার্কিন আর সায়গনী দূতাবাসে আমরা বোমা ফেলেছি। এরপর লন নল বিছানা নেয়। গত পয়লা মার্চ আমরা কম্‌পোনসঙে ওদের অয়েল রিফাইনারি নষ্ট করে দিয়েছি। এক বছর লাগবে সারাতে। ওদের প্রত্যেকটা অয়েল ট্যাঙ্ক আমরা ধ্বংস করেছি। ফলে ওদের নাক বন্ধ হয়ে গেছে। হামলার ভয়ে মেরামতের কাজে ওরা হাতই দিতে পারছে না। চার নম্বর সড়ক এখন পর্যন্ত ওরা ব্যবহার করতে পারেনি। এর পাশাপাশি চলেছে ন'নম্বর সড়কে দক্ষিণ লাওতে প্রচণ্ড প্রতিরোধ। এখানে ওরা বিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছিল। মাত্র উনিশ দিনের লড়াইতে তাইমিনে ওদের জেনারেল কাউ চি খুন হয়। ভারতীয় কাগজে খবর বেরিয়েছিল যে, বিমান দুর্ঘটনায় কাউ চি মারা যায়। আসলে তা নয়। আসলে মুক্তিফৌজ ওর প্লেন গুলি করে নামায়। কম্বোজের মানুষ কাউ চিকে একজন নৃশংস খুনী বলে জানে। জেনারেল মারা যাওয়ায় তার সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ—মাত্র তিন সপ্তাহে ওদের তিন হাজার সৈন্য খতম হয়। তখন ওরা বাধ্য হয়ে বলে লাও থেকে ওরা সৈন্য তুলে নিচ্ছে। লাও, কম্বোজ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম—সব জায়গাতে ওদের এখন হাঁটু ভাঙা দ-এর অবস্থা। বড়দরের আক্রমণ চালানো এখন আর ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

'এ তো গেল বড়দরের লড়াইয়ের কথা। এ ছাড়াও সারা দেশে ছড়িয়ে আছে আমাদের গণবাহিনী। আপনারা তো সেদিন থান হোয়ায় গিয়ে বন্দী কর্ণেল থ-কে দেখে এসেছেন। ও লোকটা কম্বোজে গিয়েও আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তারপর জখম হয়ে পালায়।

'আমাদের দেশের দশভাগের সাত ভাগ এলাকা এখন মুক্ত। মুক্তাঞ্চলের লোক সংখ্যা এখন চল্লিশ লক্ষ। আটটি প্রদেশের আশি-নব্বই আর পাঁচটি প্রদেশের পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ এখন মুক্ত। সেখানে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও আছে স্থানীয় জনরক্ষী আর গেরিলা বাহিনী। আমাদের সৈন্যরা জনপ্রিয়। তারা ধান কাটার সময় কৃষকদের সাহায্য করে। এমন ভাবে করে যে, শত্রুপক্ষ ধরতেই পারে না কে সৈন্য আর কে কৃষক। জনগণের ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছে আমাদের বাহিনী।

মুক্তাঞ্চলের বাসিন্দাদের আছে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। শত্রু অধিকৃত এলাকায় সামরিক শাসনের মধ্যে যারা থাকে, তাদের কোনো অধিকার নেই। দেশপ্রেমিক বেতার শুনলেও তাদের পনেরো-বিশ বছরের জেল হয়। শত্রু পক্ষের সৈন্যরা নেশাখোর আর লম্পট। তারা লড়তে ভয় পায়। আমাদের দেশভক্ত জনসাধারণ অনেক জায়গায় জনবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই তাদের হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে।

'নম্‌পেনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। সরবরাহের সব রাস্তা বন্ধ। লোকে জানে, শহরে কিছু নেই। কৃষিপ্রধান দেশ আমাদের। অন্নপূর্ণা গ্রাম আমাদের হাতে। শহরে মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও খাদ্য অগ্নিমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। ফলে শহরের লোক অসন্তুষ্ট এবং অতিষ্ঠ। মার্কিন টাকার বেশির ভাগ যায় অস্ত্রশস্ত্রে আর প্রশাসকদের পেটে। এর ঠিক উল্টো ছবি মুক্তাঞ্চলে। শত্রুর টন টন বোমা আর বিষাক্ত রাসায়নিক সত্ত্বেও।

'সামরিক আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন রাজনৈতিক দিক থেকেও শত্রু পক্ষ এখন নাজেহাল। শাসকশ্রেণীর মধ্যে দলাদলি বাড়ছে। লন নলের নিজের ভাই গত ১৫ মার্চ কুদেতা-র চেষ্টা করে। তার পেছনে সাম্রাজ্য-বাদীদেরও সায় ছিল। তারা বিষম ফাঁপরে পড়েছে! কাকে সরিয়ে কাকে বসাবে ঠিক করতে পারছে না। তাছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর কম্বোজ— এই দুই পাপেট সৈন্যদের মধ্যে মিল নেই। 'দক্ষিণী' ভাড়াটে সৈন্যরা নিষ্ঠুর। তারা লুটতরাজ করে, বলাৎকার করে। কম্বোজের স্থানীয় পাপেট সৈন্যরা সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় তাদের ওপর গুলি চালায়। তাছাড়া কম্বোজ বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সেনাপতিতে সেনাপতিতে দ্বন্দ্ব। তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এ সমস্তই হলো পশ্চিমী কাগজগুলোরই খবর।

'মুক্তাঞ্চলে নিরন্তর চলেছে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই! শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। মার্কিনদের হাতে পড়ে কম্বোজের জাতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হতে বসেছে। তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখছে মুক্তিফৌজ। তাই অধিকৃত অঞ্চলেও লেখক আর বুদ্ধিজীবীরা মনেপ্রাণে আমাদের সমর্থক। মুক্তাঞ্চলে তো কথাই নেই।

'এমন কি নম্‌পেন রেডিও থেকেও মার্কিনদের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হয়েছে যে, তারা মন্দিরগুলো থেকে পুরনো মূর্তিগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন মার্কিন সংগ্রাহকদের মধ্যে মূর্তি কেনবার জন্যে কম্বোজে আসার ধুম পড়ে গেছে।'

সন্ধ্যেটা খুব জমেছিল। হোটেলের ভেতরদিকে একতলায় একটা বড় ঘর। তার একাংশে বসেছিল কবিতার আসর। আসরের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ভারতীয় সন্ধ্যা'।

কালিদাসের কবিতা ভিয়েতনামি ভাষায় অনুবাদ করেছেন কবি স্যুয়েন স্যান সান্। খুব সম্ভবত সরাসরি সংস্কৃত থেকে নয়। ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগ প্রধানত ফরাসী এবং কিছুটা ইংরেজি অনুবাদের ভেতর দিয়ে।

পড়া হলো 'মেঘদূত' থেকে। পড়া হলো বলা ঠিক নয়। গাওয়া হলো।

ভিয়েতনামি কবিতা সাধারণত সুর করেই পড়া হয়। বাংলায় কবিতা আর গান অনেক আগেই যেভাবে আলাদা হয়ে গেছে, এশিয়ার বেশির ভাগ ভাষাতেই তা হয়নি। মস্কোতে লেখক সঙ্ঘের এক সমাবেশে জাপানী হাইকু শুনেছিলাম। হাইকু শুধু যে গাওয়া হয়েছিল তাই নয়। হাইকু গাইবার সময় দরকার যথোচিত জাতীয় পোশাক।

এ আসরেও তার অন্যথা হয়নি। যে তিনজন মেয়ে সুর করে ভিয়েতনামি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন, তাদের মধ্যে শুধু একজনই ছিলেন যিনি নিজে কবি। বাকি দুজন শুধু কবিতা পাঠের জন্যেই বিখ্যাত। কিম জুং মহিলা কবি। তিনি পড়ে শোনালেন ভিয়েতনামি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার তর্জমা। তাঁর আবৃত্তির সময় ব্যবহার করা হয়েছিল সঙ্গত হিসেবে তারের বাজনা।

তিনজনেরই পরনে ছিল আগুল্‌ফলম্বিত ঝলমলে রেশমী জাতীয় পোশাক। 'মেঘদূত' থেকে পড়ে শোনালেন সু মাই।

এরপর এল আমার আর বান্নেভাইয়ের কবিতা পড়বার পালা। বান্নেভাই উর্দুতে আর আমি বাঙলায়। দুটোই ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে লেখা। আমাদের কবিতাদুটির ফরাসী অনুবাদ বার হয়েছিল আফ্রো-এশীয় লেখক সঙ্ঘের মুখপত্র 'লোটাসে'। আমরা ভিয়েতনামে যাওয়ার আগেই ভিয়েতনামি ভাষায় কবিতা দুটির অনুবাদ হয়েছিল।

যিনি সেই অনুবাদ দুটি পড়লেন, তাঁর নাম মিসেস্ চান থি তুয়েত। কবিতা পাঠের জন্যে তাঁর দেশজোড়া নাম।

এরপর পড়া হলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু আধুনিক কবিতা। শেষকালে

আমাদের দেশের পক্ষ থেকে ডক্টর শেলভাঙ্কর এই আসরের উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

এটুকু লেখার পর মনে হচ্ছে, এটা হয়ে গেল যেন নিছক কাগজের খবর। তাও একেবারে বাসি।

কিন্তু সেদিনের সেই গমগম করা ঘর, তার যন্ত্রের মূর্ছনা, সারি সারি উৎকর্ণ উৎসুক চোখ, দুই দেশের হাতে হাত দেওয়া ভালবাসা—এ আমি কেমন করে ভাষায় ফুটিয়ে তুলি।

আর হোটেলের লাউঞ্জে ঘুর-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস তুয়েতের আবেগবিহ্বল সেই বিদায়বাণী—এবার থেকে আমি যেখানেই যাব, সেখানেই গাইব জেনো 'গাও হো'।

১৭

কোথাও গিয়ে মন তোলপাড় হওয়া, এমন আমার আগে কখনও হয়নি। কাল সারা সকাল ঘরে বসে ভেবেছি। ফিরে গিয়ে এবার জীবনের ধারা বদলাতে হবে। দিন আনি দিন খাই করে আর কত দিন চলবে? আমরা তো ইচ্ছে করলেই দেশ জুড়ে নতুন হাওয়া আনতে পারি। কেন করছি না? আমরা কি পারছি দেশকে আর দেশের মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে? মনে-মুখে আর কথায়-কাজে এক হতে পারছি কি?

হানয় থেকে হোয়া বিন। রাস্তা খুব কম নয়। আর এই সারা পথ এইসব ভাবতে ভাবতে এসেছি। সমতল ছেড়ে রাস্তা ক্রমে উঁচুর দিকে উঠেছে। দুপাশে সার দিয়ে পাহাড়।

আসতে আসতে একটা খোলা জায়গায় দেখি কয়েকটা ট্যাঙ্ক। খাঁকি পোশাকে এক দঙ্গল সৈন্য। জেনারেটরের ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ। কমরেড তাই বললেন, ওখানে সিনেমা তোলা হচ্ছে। ফরাসীদের সঙ্গে জনযোদ্ধাদের লড়াইয়ের ছবি। দিয়েন বিয়েন ফু-তে যাবার এটাই তো রাস্তা।

এবারের যাত্রায় আমাদের সঙ্গী বিখ্যাত লেখক কমরেড তো হোয়াই।

পার্বত্য অঞ্চলে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে তিনি অনেকদিন কাটিয়েছেন। পাহাড়ী মানুষদের নিয়ে লেখা তাঁর অনেক গল্প আছে।

হোয়া বিনের রেস্ট হাউসে যখন এসে পৌঁছুলাম, তখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে। আসবার সময় কাছেই এক পাহাড়ী গ্রামে দেখে এসেছিলাম স্টেজ বাঁধা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। দেখে আসার লোভ ছিল। কিন্তু সন্ধ্যের পর শরীরটা হঠাৎ বেঁকে বসল।

সকালে উঠে চারদিকে তাকিয়ে কী ভালো যে লাগল। সামনে উঠোন জুড়ে চাঁপা, পলাশ আর খুবানি। সেই সঙ্গে সোয়ান গাছ। যার সাদা সাদা ফুল আর যার কাঠ দিয়ে তৈরি হয় বাড়ি। কমরেড হো চি মিন বলেছিলেন দেশ জুড়ে এই গাছ লাগাতে। এখন সোয়ান গাছের দিকে তাকালেই বাক্ হো-র কথা সকলের মনে পড়ে।

উঠোন পেরিয়ে রণপায়ের ওপর দাঁড়ানো কাঠের পুরনো বাংলো। সেটা এখন রেস্টহাউসের বৈঠকখানা। তার পেছন দিকে প্রশস্ত বারান্দা। সেখান থেকে পাহাড়ের নিচে অনেক দূর অবধি দেখা যায়।

বেলা হওয়ার পর আমার অসুখ ধরা পড়ল। ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, নার্স—সবশুদ্ধ এসে হাজির। ওষুধ আর ইঞ্জেকশন। সেবা-শুশ্রূষার ঠেলায় বিকেলের মধ্যে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে উঠলাম।

হোয়া বিন প্রদেশ প্রশাসন কমিটির সদস্য কমরেড কোয়াক কোং চাম। কাল সন্ধেবেলায় আর আজ সকালে কমরেড চামের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। কমরেড চাম হলেন পাহাড়ী উপজাতির মানুষ।

কমরেড চাম বললেন :

'হোয়া বিন হলো পার্বত্য প্রদেশ। এর চার হাজার ছশো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে এক হাজার বর্গ কিলোমিটার বাদ দিয়ে সবটাই পাহাড় এলাকা। কাজেই ধানক্ষেত খুব কম। এ প্রদেশের লোকসংখ্যা তিন লক্ষ ষাট হাজার। এখানে সাতটি ভিন্ন জাতি উপজাতির বাস। লোকসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ হলো মুওং। বাকি হলো থাই, তাই, জও, মেও, হোয়া আর ভিয়েত। এরা সবাই দীর্ঘকাল ধরে এখানে আছে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্মৃতিপুরাণ, ইতিহাস আর সংস্কৃতি আছে। গবেষণা আর প্রত্নতত্ত্ব থেকে জানা যায়, মুওংরা প্রস্তর যুগের আমল থেকে এখানে বসবাস করছে।

'আলাদা আলাদা উপজাতি হয়েও আমাদের মধ্যে বরাবরের বনিবনা।

কেউ কাউকে ছোট চোখে দেখে না। ফরাসী আমলে খুব চেষ্টা হয়েছিল আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরাবার। কিন্তু উপজাতীয়রা সে ফাঁদে পা দেয়নি। বরং উল্টে ফরাসীদের বিরুদ্ধেই লোকে এক হয়ে লড়েছে।

'এ অঞ্চলে জাতীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে মুওংরাই প্রধান। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। মুওংদের সঙ্গে ভিয়েতদের অনেক মিল। কিন্তু মুওংদের ভাষার কোনো লিপি ছিল না। পঁয়তাল্লিশ সালের অগস্ট বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এখানকার উপজাতীয়দের ছিল জঘন্য অবস্থা। বড় বড় জমিদারদের দখলে ছিল ফসল, জমি আর মানুষের দেহ। কোনো কোনো উপজাতি—যেমন মেও—তাদের মধ্যে শ্রেণীভাগ স্পষ্ট ছিল না। তাদের ছিল পরিবারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। লোকের অন্নসংস্থান হতো বছরে মোটে দু তিন মাসের। অর্থনীতি ছিল একেবারেই পিছিয়ে পড়া। শুধু ধান আর পশুপালন। না ছিল শিল্প, না ছিল ব্যবসা। কোনো কোনো উপজাতি যাযাবরের জীবন যাপন করত।

'একে পাহাড় জঙ্গল, তার ওপর চরম দুর্দশা। ফলে, ম্যালেরিয়ায় মানুষ উজাড় হতো। ফরাসী আমলে সারা প্রদেশে হাসপাতাল ছিল মোটে একটি। একমাত্র হোয়া বিন শহরে। সেখানেও ভর্তি হতে পারতো শুধু সৈন্য আর কেরানী। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

'হোয়া বিন প্রদেশে শতকরা নিরানব্বই জনই ছিল নিরক্ষর। মেও এবং আরও কয়েকটি উপজাতির মধ্যে একজনও লেখাপড়া জানতো না। এসব দুরবস্থা ছাড়াও উপজাতীয় লোকদের প্রতি উপরমহলের ছিল একটা ঘৃণার ভাব। আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। উপজাতীয়দের কাছে তাই সবচেয়ে বড় কথা ছিল মানুষের মর্যাদা। অর্থনৈতিক শোষণের চেয়েও ঢের বেশি তীব্র ছিল আমাদের এই মানসিক যন্ত্রণা। আমাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে : অনেকদিন মনে থাকে মুখরোচক খাবার—কিন্তু চিরদিন মনে থাকে কথার খোঁচা।

'বিপ্লবের আগে সামাজিক দিক দিয়ে এ অঞ্চল ছিল খুবই পিছিয়ে। অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস কম গৌরবের নয়। উপজাতির মানুষেরা পাথরের বুক চিরে এখানে ফসল ফলিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে কতভাবে তারা মানুষের কাজে লাগিয়েছে। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বার বার তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় দেশভক্ত—যেমন, ডে থাম—এই সব জায়গাকে ভিত্তি

করে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছে। উপজাতীয় নেতারা—যেমন ১৮৮২ সালে—ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়েছে এবং হোয়া বিন শহর মুক্ত করেছে ; কোনো কোনো উপজাতি—যেমন, মেও—ফরাসীদের খাজনা দেয়নি। ভিটেমাটি ছেড়ে বনে চলে গেছে, তবু শত্রুর কাছে মাথা নোয়ায়নি।

'এখানকার অনেক উপজাতিরই প্রাচীন লোককথা আছে। যেমন, মুওংদের। আছে এমন কি পাঁচ ছ হাজার ছত্রের বিরাট গাথা কাব্য। আমরা এর কিছুই হারিয়ে যেতে দিইনি। উপজাতীয়দের সামাজিক প্রথাপদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য থাকলেও জাতীয় চরিত্রের দিক দিয়ে তারা সকলেই এক। উপজাতীয়রা সবাই উদার, মহানুভব, দয়ালু আর অতিথিবৎসল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় সমতলের যে মানুষদের পাহাড়ী অঞ্চলে সরে আসতে হয়েছিল, উপজাতীয়দের কাছ থেকে তারা পেয়েছিল জমি, সার আর বন্ধুত্ব। এসব এলাকায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল বিশাল গেরিলা বাহিনী।

ফরাসী আমলে এ অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল কয়েকটি বন্দীশালা। উদ্দেশ্য ছিল দুটি—প্রথমত, রাজনৈতিক বন্দীদের দূরে সরিয়ে রাখা। দ্বিতীয়ত, পাহাড়ীরা যাতে বন্দীদের দুর্গতি দেখে ভয় পায়। কিন্তু ফল হলো ঠিক তার উল্টো। বন্দীদের সংস্পর্শে এসে পাহাড়ীরা বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হলো। দেশে যখন বিপ্লবের ডাক এলো, তখন এ অঞ্চলের লোকও বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করলো।

'অগষ্ট বিপ্লব হলো। কিন্তু আমরা দেশ গড়ার কাজে হাত দেবার সময়ই পেলাম না। কেননা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে দিতে হলো। লোকে তখনই সুখের মুখ দেখতে পেল না বটে, কিন্তু মুঠোর মধ্যে পেল স্বাধীনতা আর মানুষের মর্যাদা। তাই ফরাসীদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধে এক হলো। ছ নম্বর সড়ক ধরে ফরাসীবাহিনী এ অঞ্চলের দিকে এগোতে লাগল, রাস্তার ধারের বাসিন্দারা ভেতর দিকে উঠে চলে গেল। সেখানে তারা ফসল ফলাতে আর গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাতে লাগলো। ফরাসীরা আবার চেষ্টা করল উপজাতীয়দের ভাংচি দিতে। কিন্তু জনকয়েক জমিদার আর ম্যাণ্ডারিন ছাড়া আর কেউই তাদের দলে ভিড়লো না। এই সময় একটা নতুন জিনিস দেখা গেল। উপজাতীয়রা গড়ে তুলল সাংস্কৃতিক দল। তারা জায়গায় জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়াতে লাগলো।

মাই অঞ্চলে এই রকমের জাতীয় সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখে ফরাসীদের ভাড়াটে সৈন্তরা দল ভেঙে চলে এল বিপ্লবীদের দিকে। বিপ্লবী সৈন্তের দল আর জনসাধারণ একযোগে ফরাসীদের কামান বিমানের বিরুদ্ধে লড়েছে এবং সড়ক তৈরি করেছে। দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে এ অঞ্চলের লোক অকাতরে সাহায্য করেছে।

'চুয়ান্ন সালের পর হোয়া বিন শত্রুকবলমুক্ত হয়। লোকে আবার যে যার নিজের জমি জায়গায় ফিরে এলো। জনকল্লোলে আবার মুখর হলো জীবন। সেই সঙ্গে নতুন করে শুরু হলো কঠিন সংগ্রাম। ফরাসীরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাওয়ার অনেক পরেও তাদের পুঁতে রাখা মাইন আর টাইম বোমায় প্রচুর লোক খুনজখম হলো। পার্টির নেতৃত্বে প্রদেশময় শুরু হলো জীবন গড়া আর ভাঙা-দেশকে জোড়া লাগাবার সংগ্রাম। ফরাসীরা চলে যাওয়ার পর তিন বছর লাগলো ফসল ফলাতে আর ঘরবাড়ি বাঁধতে। আরেক বড় সমস্যা ছিল ম্যালেরিয়া। এখন এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নেই বললেই হয়।

এ অঞ্চলের যে নদী, তার নাম সোং বা। তার মানে কালো নদী। এক সময়ে এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের জন্যে লোকে বলতো কালো নদীতে যে যাবে সে আর ফিরবে না।

এখন সব দিক দিয়েই এ অঞ্চলের অন্য চেহারা। ১৯৬০ সালের পর এ প্রদেশের একজনও আর নিরক্ষর নেই। আটান্ন সালে শুরু হয় আমাদের সমবায় খামারের আন্দোলন। তিন বছরের মধ্যে আমরা সে কাজ শেষ করি। শতকরা নিরানব্বই ভাগ জমি আর শতকরা নিরানব্বই জন কৃষক এখন সমবায় খামারে।

'একষট্টি সাল থেকে শুরু হয় এ অঞ্চলে যানবাহন ব্যবস্থা আর শিল্প পত্তনের কাজ। ইনজিনিয়ারিং কারখানা বসিয়ে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবস্থা হয়। আমাদের প্রচুর বন-জঙ্গল থাকায় আমরা করাত-কল বসিয়েছি। তাছাড়া আছে চিনিকল। তার জন্যে পাহাড়ের গায় সুড়ঙ্গ কেটে তৈরি হয়েছে রাস্তা। আমাদের দুশো গ্রামের মধ্যে দেড়শো গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে গাড়ির রাস্তা। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন এখন অনেক বেশি সমৃদ্ধ। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও এখন আমরা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিই হাজার হাজার টন উদ্বৃত্ত ফসল, হাজার হাজার গরুমোষ আর বিস্তর পরিমাণ চা।

'এটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে, শিক্ষার বিস্তার না হলে অর্থনৈতিক

বিকাশ সম্ভব নয়। মার্কিন হামলার সময়ও আমরা তাই সমানে শিক্ষার বিস্তার আর কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের প্রদেশে তরুণ ছাত্রের সংখ্যা এক লক্ষ। তাছাড়া আছে তিরিশ হাজার শিক্ষার্থী। প্রতি তিনজনে একজন ইস্কুলে যায়। প্রত্যেক গ্রামে আছে প্রথম আর দ্বিতীয় গ্রেডের স্কুল। প্রত্যেক জেলায় তৃতীয় গ্রেডের স্কুল। আর প্রদেশে আছে কৃষিবিদ্যালয়, বনসংক্রান্তবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া আছে কৃষি, বন, চিকিৎসাবিদ্যা আর শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে বৃত্তিগত মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

'সেই সঙ্গে আছে জনস্বাস্থ্য রক্ষা আর চিকিৎসালয়ের সুব্যবস্থা। আমাদের প্রদেশে এখন বারোটি হাসপাতাল। প্রত্যেক হাসপাতালে আছে ডাক্তার আর সার্জেন। গোটা প্রদেশে পাশ করা বিয়াল্লিশন জন ডাক্তার। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই স্থানীয়।

'আমাদের আর্থিক অবস্থা এখনও খুব ভালো নয়। কিন্তু তা সত্বেও মনন আর সংস্কৃতির দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিই। আমাদের আছে সিনেমা দেখানোর ষোলটি ভ্রাম্যমান দল। গ্রামে আর কারখানায় আছে তিন শো শৌখিন নাচগানের গ্রুপ, পাঁচ শো রীডিংকর্ণার আর ছোট পাঠাগার। প্রদেশের নানা জায়গায় প্রায়ই হয় সাংস্কৃতিক উৎসব। এমনকি লড়াইয়ের সময়ও নাচগানের প্রতিযোগিতা কখনও বন্ধ থাকেনি।

'উপজাতীয় মেয়েদের কথা তো আপনাদের বলিনি। পুরনো আমলে তাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। বিপ্লব তাদের মুক্তি দিয়েছে আর সেই সঙ্গে তাদের দিয়েছে সবদিক দিয়ে পুরুষের সমান অধিকার। গেরিলা বাহিনীতে মেয়েরা লড়াই করেছে। কৃষিখামারের কাজ করে মুওং উপজাতির মেয়ে মুয়েন থি খুয়ং। সে পেয়েছে জাতীয় শ্রমবীরের খেতাব। মার্কিন বিমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে গ্রামে গ্রামে আছে মেয়েদের বাহিনী। এইরকম এক বাহিনীর সদস্য বুই থি টন। নিজে হাতে সে মার্কিন বিমান গুলি করে নামিয়েছে।

'আমাদের প্রাদেশিক পরিষদের বিরাশী জন সদস্যের মধ্যে চৌত্রিশ জন মেয়ে। তাদের অনেকেই হলো স্থানীয় সমবায় খামারের পরিচালক কিংবা সহ-পরিচালক। আমাদের মহিলা সমিতির শাখা রয়েছে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে। গ্রামের সমস্ত মেয়ে তার সদস্য। এমন কি দেশের জাতীয় পরিষদে আমাদের প্রদেশের মোট ছ জন প্রতিনিধির মধ্যে তিনজন মেয়ে। একজন

কাজ করে সমবায় খামারে, একজন মহিলা সংগঠনে, আরেকজন নারী-বাহিনীতে। এর মধ্যে তুজন মুওং উপজাতির। জেলা পরিষদ আর গ্রাম পরিষদেও শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন মেয়ে।

'সমবায় খামারের মেয়ে কর্মীরা সন্তান হওয়ার আগে এক মাস আর পরে একমাস ছুটি পায় এবং এই সময়টা তারা কাজ না করেও টাকা আর ধান পায়। সরকারি মেয়ে কর্মীরা প্রসূতি-ভাতা হিসেবে তু মাসের ছুটিসহ পায় পূর্ণ বেতন এবং বিনামূল্যে ওষুধ আর বাচ্চার জামাকাপড়। প্রত্যেক গ্রামে কিণ্ডারগার্টেন আছে। নার্সরা মাইনে পায় সমবায় খামার থেকে। বাচ্চারা বিনা খরচে খাবার পায়। কারখানা আর আপিসের কিণ্ডারগার্টেনের খরচ যোগায় ট্রেড ইউনিয়ন।

'আমাদের এ অঞ্চলে কুটির শিল্প কারো জাতব্যবসা ছিল না। থাই বা মুওংরা নিজেরা নিজেদের রঙীন কাপড় বুনে নিতো। সুচের কাজ আর কাপড়ে রঙ দেওয়ার কাজ করতো জও আর মেওরা। কোনো কোনো উপজাতি বন্যপশু শিকারের জন্যে বানাতো বন্দুক, তরোয়াল আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। আমাদের সরকার এখন এ অঞ্চলে হস্তশিল্পের কয়েকটা সমবায় করে দিয়েছে। তাতে বিভিন্ন উপজাতির নিজস্ব পোশাক পরিচ্ছদ আর বেতের জিনিস বানানো হয়। কোনো কোনো উপজাতি আবার নিজেদের পোশাক নিজেরা তৈরি করতে চায়। সরকার থেকে তাদের সুতো, কাপড়, রঙ আর যন্ত্রপাতি যোগানো হয়।'

আজ আমার ওপর কড়া হুকুম ওঠা-হাঁটা যেন না করি।

পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে ছোট একটা বই সঙ্গে ছিল। শুয়ে শুয়ে সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

গোটা ভিয়েতনামে ষাটটি সংখ্যালঘু উপজাতি। তাদের লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষের মতো। দেশের মোট আয়তনের তুই-তৃতীয়াংশ যে পার্বত্য অঞ্চল, সেখানে তারা থাকে। দেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা সাতাশী ভাগ হলো ভিয়েত বা কিন্। 'নাম' মানে দক্ষিণ। 'ভিয়েতনাম'—অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতভূমি—এই নাম চীনাদের দেওয়া। সংখ্যালঘু উপজাতীয়রা ভিয়েতদের বলত 'কিন্'। কিন্ কথাটার মানে 'রাজধানী'। উপজাতীয়রা সবাই হয় 'চীন-তিব্বতী' আর নয় 'অস্ট্রো-এশীয়' গোষ্ঠীর।

বিপ্লবের আগে এইসব উপজাতি সমাজবিকাশের পশ্চাদপদ নানা স্তরে

আটকে ছিল। প্রত্যেকেরই ছিল নিজের নিজের লোকসংস্কৃতি। খুব কম উপজাতিরই ছিল লেখার লিপি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে কিন্‌দের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব ছিল না। তার কারণ, জমিদার মহাজন আর রাজপুরুষেরা তাদের নানাভাবে শোষণ করত। তারা অধিকাংশই ছিল কিন্‌ জাতির লোক।

পাহাড় আর সমতলের সাধারণ মানুষ তাই বলে সম্পূর্ণ আলাদা থাকেনি। পরস্পরের প্রয়োজন মেটানোর ভিতর দিয়ে তাদের মধ্যে যে বৈষয়িক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, বিদেশী আক্রমণকারীকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে সেই সহযোগিতা ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সামন্ততান্ত্রিক আর ঔপনিবেশিক শাসনে পরস্পরের বিসম্বাদ আর ঐক্য—এই দুই ধারার মধ্যে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংহতিরই জয় হলো।

সন্ধ্যের পর সামনের কাঠকুঠিতে গিয়ে বসি। ঘরে কেরোসিনের মিটমিটে আলোটা বাইরের অন্ধকারকে আরও বেশি জমকালো করে তুলেছে।

বাড়িটা দেখলেই মনে হয় এক সময়ে ফরাসীদের ফূর্তির জায়গা ছিল।

বারান্দায় বসে আছি আমি, বান্নেভাই, তো হোয়াই আর কমরেড চাম। কথা হচ্ছিল আড্ডার মেজাজে। উত্তর-পশ্চিমের এই পাহাড়ী মানুষদের সঙ্গে তো হোয়াইয়ের সম্পর্ক অনেক দিনের।

তো হোয়াই এক সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে ছিলেন বিপ্লবের গণ-বাহিনীতে। তাঁর সে সময়কার চেহারা হানয়ে লেখক সঙ্ঘের আপিসঘরের দেয়ালে টাঙানো গ্রুপ ফটোতে দেখেছি। তখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন উপজাতীয়দের সঙ্গে থেকেছেন। আহারনিদ্রা কাজকর্ম সবই ছিল তাদের সঙ্গে এবং ঠিক তাদেরই মতো। এ সময় তিনি উপজাতীয়দের ভাষা শিখে পাহাড়ীদের লোকাচার, তাদের নাচগান, তাদের ধ্যানধারণা—সব কিছু আত্মস্থ করেন এবং তারপর তাঁর পাহাড়বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি গল্প লেখেন। তার জন্যে ১৯৫৫ সালে তিনি ভিয়েতনাম লেখকশিল্পী সঙ্ঘের পুরস্কার পান। ১৯৭১ সালে তো হোয়াই দিল্লিতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে পান লোটাস পুরস্কার। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের লেখক প্রতিনিধিদের হাতে তাঁদের মুক্তিসংগ্রাম তহবিলে দান করেন।

তো হোয়াই ১৯৪১ সালে গুপ্ত আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর লেখক জীবনেরও শুরু তখন থেকে।

কথায় কথায় বান্নেভাই ভুম করে জিগ্যেস করে বসলেন : আচ্ছা, অনেকে অভিযোগ করে সমাজতন্ত্রের দেশে সুবিধাভোগী একটা নতুন শ্রেণী গড়ে উঠেছে—এ সম্বন্ধে আপনাদের কী মনে হয় ?

আমি লক্ষ্য করছিলাম এই প্রশ্নের কী প্রতিক্রিয়া হয়।

তো হোয়াইয়ের মুখের রঙ মুহূর্তে কেমন যেন বদলে গেল। কমরেড চাম তো হোয়াইয়ের দিকে চাইলেন।

তো হোয়াই এক মিনিট একটু গুম হয়ে থাকলেন। বোঝা যাচ্ছিল কথাটাতে তাঁর লেগেছে। তারপর বললেন :

'কমরেড চাম কিংবা আমি—আমাদের কথাই ধরুন। কমরেড চাম পঁচিশ বছরের পুরনো কর্মী। আমি ছেলেবেলা থেকে দেশের কাজ করছি এবং জেল খেটেছি। আমি লেখক। কিন্তু আমি কোনো বিশেষ সুবিধে পাই না। সাধারণ শ্রমিকের মতোই আমাকে লিখে খেতে হয়। থিওরির কথা ছেড়ে দিন, বাস্তবের দিকে তাকান। উনত্রিশ বছর আগে আমি বিপ্লবে যোগ দিই। আমার ওপর এখন লেখক সংগঠনের ভার। ভাববেন না আমি শুধু আমার একার কথা বলছি। যারা আমার সমবয়সী তাদের সবারই এই এক অবস্থা।

'কাল আমার সঙ্গে কমরেড চামের বিশ বছর পর দেখা। তখন ফরাসীদের কব্জায় এ-সব অঞ্চল। কমরেড চাম তখন আমাদের সৈন্যবাহিনীতে। মাই চো অঞ্চলে ছিল ঘাঁটি। জুং নদীর যুদ্ধে কমরেড চামের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

'আজ বিশ বছর বাদেও কমরেড চাম দেখছেন আমার গায়ে সেই এক শার্ট। আমার কলম, নোটখাতা—সবকিছু সেই একই থেকে গেছে। কাজেই তত্ত্বের কথা বলা আমার পক্ষে শক্ত। বাস্তবের কথা জিগ্যেস করলে বলব, আমরা কোনো আলাদা সুবিধে ভোগ করি না। আমরা সমানে লড়ে চলেছি সমাজতন্ত্রকে রূপ দেবার জন্যে।'

তো হোয়াইয়ের পর বললেন কমরেড চাম :

'আমার সঙ্গে কিছু লেখকের আলাপ আছে। দেখেছি লেখকেরা চান সত্যিকার জীবন জানতে। বলছি।

'আমি ভিয়েতনামের মুওং উপজাতির লোক। অগস্ট বিপ্লবের আগে আমি ইস্কুলে যেতে পেরেছিলাম। আমার নিজের বাবা-মা ছিলেন খুব গরীব।

আমার ছিলেন এক প্রতিপালক পিতা। তাঁরই দয়ায় আঠারো বছর বয়সে আমি প্রাইমারি পাশ করি।

'আমাদের গোটা প্রদেশে ছিল তখন একটি মাত্র প্রাইমারি ইস্কুল। চুয়াল্লিশ সালে প্রাইমারি পাশ করেই আমি ফরাসীদের এক আপিসে টাইপিস্টের কাজ পাই। আমার বরাত খুব ভালো ছিল। কিন্তু হলে হবে কি, সে চাকরি আমাকে ছাড়তে হলো।

'সে সময় ফরাসীরা সমতল থেকে স্বদেশী বন্দীদের ধরে এনে পাহাড় অঞ্চলে আটক করে রাখত। হঠাৎ কিছু বন্দী বিপ্লবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারা আমাকে দেশের স্বাধীনতা আর মানুষের মুক্তির কথা বলে। সেই থেকে আমার জীবনের ধারা বদলে যায়। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি গেরিলা দলে যোগ দিই। তার জন্যে আমার আসল বাবা-মার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলে।

'পঁয়তাল্লিশ সাল অবধি ভিয়েত মিং অঞ্চলে লড়াই করি। তখনও আমি পার্টি সদস্য নই। ছেচল্লিশ সালে আমি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। তখন আসে ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পালা। আবার আমি সৈন্যদলে যোগ দিই। সাতচল্লিশ সালে পাই পার্টির সদস্যপদ। যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হাতে ধরা পড়ি। কিছুদিন পর বন্দীশালা থেকে পালিয়ে আবার সৈন্যদলে ফিরে আসি।

'এখন আমি প্রাদেশিক গণ-পরিষদের সদস্য এবং প্রশাসক মণ্ডলীর একজন। আমি নির্বাচিত হয়েছি সাধারণ মানুষের ইচ্ছায় আর আগ্রহে।

'কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের পরিবারের অবস্থা এখানকার আর পাঁচ জনেরই মতো। আমার স্ত্রী আর আমার ভাইরা—সবাই সমবায়ের খামারে কাজ করে। আমার ছেলেমেয়েরা সাধারণ ইস্কুলে পড়ে। আমার ওপর এ প্রদেশের শিক্ষা আর সংস্কৃতি দপ্তরের ভার। এই কাজের জন্যে আমি একটা নির্দিষ্ট বেতন পাই। ছুটির দিনে আর রবিবারে আমি গ্রামে যাই। স্ত্রীর সঙ্গে আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে আমি চাষবাসের কাজ করি।

'শিগ্‌গিরই আবার নির্বাচন হবে। লোকে যদি আমাকে চায় তাহলে এখন যে কাজ করছি সেই কাজই করব। যদি নির্বাচিত হতে না পারি, তাহলে অন্য যে কাজ দেওয়া হবে সেই কাজই আমি করব।

'কমরেড হো বলেছেন, আমাদের পার্টির লোকদের সাধারণ শ্রমজীবীর

জীবন যাপন করতে হবে। আলাদা কোনো সুবিধে নেবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না।'

আবহাওয়াটা হালকা হয়ে গেল সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার টেবিলে বসে।

আমার জন্যে ব্যবস্থা রোগীর পথ্য। টেবিলে রকমারি রান্না। সেই সঙ্গে বিয়ার আর 'লুয়া ময়'।

তো হোয়াইকে জিগ্যেস করলাম, 'কোন্ মাংসে তোমাদের সবচেয়ে বেশি রুচি?' তো হোয়াই একগাল হেসে বললো, 'ঘেউ ঘেউ'।

আমাদের নাগাল্যাণ্ডের কথাটা আগে থেকে জানা না থাকলে তো হোয়াইয়ের কথা শুনে হয়তো মূর্ছাই যেতাম।

তবু ফিরে আসার দিন হোয়া বিনের হাটে ঘুরতে ঘুরতে আমার আর বান্নে-ভাইয়ের চোখ একসঙ্গে গিয়ে পড়েছিল বন্দী সারমেয়ের একটি খাঁচায়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে গরু শুয়োর খেকো আমরা সেখান থেকে হাওয়া।

১৮

ভিয়েতনাম বড় দেশ নয়। কিন্তু বহু জাতির দেশ। তাই ধর্মে, পোশাকে, ভাষায়, জীবনযাত্রায় একের সঙ্গে অন্যের ছোট বড় তফাত তো থাকবেই। ঘরের শত্রু বরাবরই এই ভেদবিভেদকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে।

আলাদা আলাদা যত জাতি উপজাতি আছে স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে তাদের মিলিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়বার ডাক ভিয়েতনামে প্রথম দেয় কমিউনিস্ট পার্টি। এখন তার নাম লাও ডং পার্টি। রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা আর মার্কসবাদী চিন্তাধারার জোরেই এটা সম্ভব হয়েছিস।

১৯৪৬ সালে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, তার সংবিধানে বলা হল: জাতিবর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, সামাজিক অবস্থা সামাজিক শ্রেণীগোত্র এবং ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে ভিয়েতনামের সমস্ত নাগরিকের হাতে এদেশের ক্ষমতা। জাতীয় সংখ্যালঘুরা যেমন সাধারণ স্বার্থের সমভাগী হবে, তেমনি অচিরে সমান স্তরে পৌঁছবার জন্যে সর্বক্ষেত্রে তারা সাহায্য পাবে।

সমাজতন্ত্র গড়বার আমলে ১৯৬০ সালে সংশোধিত সংবিধানে আরও স্পষ্ট করে বলা হলো :

'ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলো ঐক্যবদ্ধ বহুজাতিক রাষ্ট্র।

'ভিয়েতনামী রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত জাতিসত্তা অধিকারে আর কর্তব্যে সমান। তাদের ভেতর সংহতি বজায় রাখা এবং সেই সংহতির বিকাশ ঘটানোর জন্যে আছে রাষ্ট্র। কোনো জাতিসত্তার প্রতি বিসদৃশ অথবা নিগ্রহমূলক যে কোনো আচরণ, জাতিসমূহের ঐক্যের পক্ষে হানিকর যে কোনো কাজ আইনমতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

'নিজস্ব প্রথাপদ্ধতির সংরক্ষণ বা সংস্কার, নিজেদের ভাষায় বলা আর লেখা এবং নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ—এ অধিকার রয়েছে প্রত্যেকটি জাতির।

'জাতীয় সংখ্যালঘুরা যেসব এলাকায় জোটবন্দী হয়ে বাস করে, সেখানে স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এইসব স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'জাতীয় সংখ্যালঘুরা যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাধারণ অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক স্তরে উন্নীত হতে পারে রাষ্ট্র তার জন্যে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।'

না। এসব শুধু কথার কথা হয়ে থাকেনি।

পার্বত্য প্রদেশের প্রত্যেকটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এইসব অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান পদে এখন জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা দলে দলে লেখাপড়া শিখে সরকার আর পার্টির দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগছে। নিজেদের অঞ্চলের বাইরেও তারা ক্রমেই বেশি বেশি করে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। কেন্দ্রের মন্ত্রিসভায়, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং গণবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীতে আজ অনেকেই রয়েছেন যাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। জাতীয় আইনসভায় প্রায় প্রতি সাত জনে একজন সংখ্যালঘু সদস্য।

কিন্তু অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর সামাজিক দিক থেকে না এগোলে সমান অধিকারের ব্যাপারটা শুধু কাগজে-কলমে থেকে যায়।

পাহাড় অঞ্চলে কী অবস্থা ছিল বিপ্লবের আগে? অঞ্চলবিশেষে মাসে পনেরো থেকে চব্বিশ দিন বেগার খাটতে হতো। খাজনার ভারে প্রজারা

মাথা তুলতে পারত না। গরু-ছাগলের ট্যাক্স, পুরুষদের মাথাপিছু ট্যাক্স, এমনকি মেয়েদের বয়ঃসন্ধির ট্যাক্স—জুলুমের অন্ত ছিল না। চাষীদের নিজের বলতে জমি ছিল না। অনেক অঞ্চলে কৃষকেরা ছিল ভূমিদাস। বছরের অর্ধেকদিন লোকে থাকত অনাহারে। কিছুদিন পরে পরে দেখা দিত দুর্ভিক্ষ আর মড়ক। নুন ছিল সোনার চেয়েও দামী। ম্যালেরিয়া আর আমাশা ছিল নিত্যসঙ্গী। তার ওপর কলেরা আর বসন্ত, যক্ষ্মা আর কুষ্ঠ, তাছাড়া সিফিলিস। সেইসঙ্গে আত্মক্ষয়ী মদ আর আফিং। অশিক্ষার অন্ধকারে মানুষ ডুবে ছিল।

সেই পাহাড়ে জীবনের জোয়ার এনে দিল বিপ্লব। চিরতরে বিদায় নিল দুর্ভিক্ষ। ভাটি এলাকা থেকে কিন্ জাতির মানুষ উঠে এসে পাহাড়তলীতে ডাকিয়েছে সবুজ ফসলের বান। গণতান্ত্রিক সংস্কারের ধাক্কায় নির্মূল হয়েছিল সামন্ততন্ত্র। কৃষিতে সমবায় প্রথা নতুন রকমের আধা-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের পত্তন করল। সেইসঙ্গে গড়ে উঠল কৃষি আর বনসম্পদের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ। ছোট ছোট কলকারখানার ভিতর দিয়ে পাহাড় অঞ্চলে জন্ম নিল স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণী—যে অঙ্কুর থেকে একদিন মাথা তুলবে নব-জীবনের মহীরুহ। ব্যক্তিগত দোকানদার আড়তদার উঠিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা চালু করা হলো। নতুন নতুন রাস্তাঘাটে গোটা পাহাড় অঞ্চল ছেয়ে গেল। সেইসঙ্গে নিরক্ষরতা পুরোপুরিভাবে ঘুচিয়ে দেওয়া হলো ১৯৬১ সালের মধ্যে। সব বয়সের আর সব অবস্থার মানুষের উপযোগী সব রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। যাদের ইস্কুলে যাওয়ার বয়স তারা সবাই ইস্কুলে গেল। প্রত্যেকে পেল মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার।

কমরেড চাম কাল সন্ধ্যেবেলা বলছিলেন হোয়াবিন প্রদেশের কথা। মেও বলে যে উপজাতি, এ প্রদেশে তাদের সংখ্যা মোটে এক হাজার হলেও প্রাদেশিক পরিষদে তাদের প্রতিনিধি দু জন। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখবার জন্যে কেন্দ্রে আর প্রত্যেক প্রদেশে আছে সংখ্যালঘু কমিশন।

কমরেড চামের মাতৃভাষা মুয়ং। লিপি হওয়ার ফলে মুয়ং ভাষা এখন ইস্কুলে পড়ানো হয়। মুয়ং ভাষায় বই ছাপা হচ্ছে, কাগজ বেরোচ্ছে, সাহিত্য লেখা হচ্ছে। মুয়ং ভাষার দু জন লেখক ভিয়েতনাম লেখক সঙ্ঘের সদস্য।

বিকেলে গাড়ি করে বেরিয়েছিলাম পাহাড় অঞ্চল ঘুরতে।

উত্তর ভিয়েতনামে আসার আগে মনে মনে আমার একটা ভয় ছিল। যে

দেশ যুদ্ধ করছে, সে দেশে নিশ্চয় পদে পদে নানারকম বিধিনিষেধ থাকবে। কৌতূহল দমন করতে হবে। কিছু একটা মনে হলেই তা বলা চলবে না। একটু বাঁকা কথা বললেই তার অন্যরকম মানে করা হবে।

এতদিনে বুঝে গিয়েছি অন্তত এদেশে আমার সেই ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড উইকে প্রথম দিনেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ফটো তোলার ব্যাপারে কী কী বিধিনিষেধ আছে যদি বলেন—'

কমরেড উই হেসে বলেছিলেন,—'আপনার যেমন খুশি ছবি তুলবেন। সামরিক কারণে যদি কোথাও ছবি তোলায় বাধা থাকে আমাদের লোকজনেরা তো থাকছেই—তারা আপনাকে বলে দেবে।'

শুধু হানয় শহরে নয়, গ্রামের দিকে রাস্তাঘাটে একা বেরিয়ে আমি ছবি তুলেছি। কেউ কোনোদিন আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়নি।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এরা কেউ প্রশংসার কাঙাল নয়। এ পর্যন্ত যত জায়গায় গিয়েছি, সব জায়গায় একটা কথা শুনেছি—'কমরেড, আমাদের ক্রটির দিকগুলো বলুন।' বার বার শুনেও, আমার কিন্তু কখনই মনে হয়নি যে, কথাগুলো ঢং করে বলা। মুখচোখ দেখেই বোঝা যায় কোন্ কথা আন্তরিক আর কোন্ কথা আন্তরিক নয়। এটা ভিয়েতনামের জাতের গুণ নয়, আসলে কমরেড হো চি মিনের শিক্ষার গুণ।

যেতে যেতে এক পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল পোড়ার দাগ দেখিয়ে কমরেড চামকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'ওখানে আগুন লেগেছিল নাকি?'

কমরেড চাম বললেন, 'না, না—গত বছর ওখানে গাছ পুড়িয়ে জুম চাষ করেছিল। জুম চাষ করা এখন বেআইনী। উঁচু পাহাড়ের লোকদের নীচে পাহাড়তলীতে জমিজায়গা দিয়ে থিতু করে বসানো হয়েছে। এখন বারোমাস ঘরে ভাত। রোগে ওষুধ। ছেলেপুলেদের জন্যে ইস্কুল। এ সত্ত্বেও একেকটা পরিবার হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। হাজার হাজার বছরের এ অভ্যেস সহজে যাবার নয়।'

এক পাহাড় ছেড়ে অন্য পাহাড়ে। গাড়ি উঠে চলেছে উঁচু রাস্তায়। দুপাশে মাঝে মাঝে পাহাড়ী মানুষের একেকটা দঙ্গল। কমরেড চাম চিনিয়ে দেন। কারা কোন্ উপজাতির। 'মেয়েদের কালো কামিজ দেখছেন, ওরা কালো থাই। সাদা কামিজ হলে সাদা থাই।'

চারপাশে বনজঙ্গলে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়। দেখতে ঠিক উত্তর বাঙলার পাহাড় অঞ্চলের মতো। জঙ্গলে বাঘ, চিতা, হাতি, বাঁদর আর সাপের আস্তানা। পাহাড়ের গা বেয়ে কলাক্ষেত, পাটক্ষেত আর বাঁশঝাড়।

অনেকখানি যাওয়ার পর আমরা এসে গেলাম থু ফং গ্রামে। রাস্তার ঠিক ধারেই একটা চালাঘর। গ্রামরক্ষী বাহিনীর আপিস ঘর। তার ঠিক পাশেই মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা ভাঙা বিমান।

ঘরে আমাদের বসিয়ে মার্কিনদের এই জঙ্গী বিমানটি ধ্বংস করার কাহিনী বলল বুই ভান কেন :

'সে সময় এক হাতে লাঙল আর এক হাতে বন্দুক। এইভাবে আমরা লড়েছি।

'দিনটা ছিল ছেষট্টি সালের বিশে জুলাই। মাঠের ধারে বসে আমরা তিন জন কর্মী সভা করছিলাম। আর তিনজন মাঠে কাজ করছিল। হঠাৎ দেখি একটা বড় প্লেন। প্লেনটা পশ্চিম দিক থেকে আসছিল। সেই সময় ২-বি ক্রসরোড ধরে আসছিল একটা লরি। লরিটা আসছিল খোলা আকাশের নিচে দিয়ে। আশেপাশে গাছপালা না থাকায় তার পক্ষে গা ঢাকা দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। প্লেনটা তখন নিচু হয়ে এসে লরিটাকে তাড়া করে। আমাদের কাছে ছিল পাঁচটা রাইফেল। এক মুহূর্ত দেরি না করে দল বেঁধে আমরা লড়তে শুরু করে দিলাম। প্রথমবার প্লেন থেকে কোনো কামান দাগেনি, দ্বিতীয়বার নেমে এসে লরিটাকে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে লাগল। প্লেনটা ছিল আমাদের মাথার ঠিক দুশো মিটার ওপরে। তার পাখার ঝাপটায় আমার মাথার টুপি উড়ে গেল। চারপাশে গাছের উঁচু ডালগুলো প্রবলভাবে নড়ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বললাম, 'গুলি করো'। তাকিয়ে দেখি প্লেনের গায়ে গুলি লেগেছে। প্লেনটা আমাদের কাছে এসে পড়ল। তার পেছনে ছিল জুড়িদার আরও একটা প্লেন। প্রথম প্লেনের দশা দেখে দ্বিতীয় প্লেনটা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গিয়ে পিঠটান দিল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্লেনটাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। যাতে করে ওদের প্লেন এসে দিশে না পায়, তার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি আগুন নিবিয়ে ফেললাম। পাইলটের মাথার খুলি আর দুটো পা-ই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখি তার সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। প্লেনটা পড়েছিল এখান থেকে

এক কিলোমিটার দূরে। কাগজপত্র থেকে জানা যায় পাইলটের নাম ছিল গ্যাসন উইলিয়ম হামক্রে।'

এই পাঁচ বছরে গ্রামরক্ষী দলের অস্ত্র আরও ভালো এবং হাত আরও পাকা হয়েছে।

থু ফং থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় দেখলাম এক শহীদ বেদীর ওপর তোলা রয়েছে কুড়ি বছর আগের এক ফরাসী ট্যাঙ্ক। কু চিন লান নামে এক সৈনিক ট্যাঙ্কে উঠে ওপরের ঢাকনা তুলে হাতবোমা ছুঁড়েছিল। পরে অন্য এক যুদ্ধে সে মারা যায়।

আরও একজন বীর শহীদের কথা লোকে ভোলেনি। তার নাম জ্যাং মো। শত্রুঘাঁটি ধ্বংস করার জন্যে সে তার বুকে বারুদ বেঁধে নিয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়।

সন্ধ্যেবেলা কুঠিঘরে বসল গানবাজনার জলসা। গান গেয়ে শোনাল একজন থাই আর দু জন মুয়ং উপজাতির মেয়ে। তিন জনের খুব কম বয়স। ভারি মিষ্টি দেখতে। সুন্দর গানের গলা।

প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক বাহিনীর তিন জন প্রতিনিধি—কমরেড জিয়েম, কমরেড চি আর কমরেড খুয়ে—মাঝে মাঝে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। ওঁরা কেউ কেউ বলছিলেন মুয়ং ভাষায়। কমরেড চাম তা থেকে ভিয়েতনামী ভাষায় তর্জমা করে দিচ্ছিলেন। তারপর আমাদের ভিয়েতনামী দোভাষী সেটা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

কমরেড চি বললেন, 'জাতীয় সাহিত্য আর জাতীয় সুরকে ভিত্তি করে আমাদের সব গান। মধ্যে চার বছর মার্কিন হামলার সময় আমাদের অনেক কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। তবু আমরা তার মধ্যেও সাংস্কৃতিক কাজ সমানে চালিয়েছি। কমরেড হো চি মিন এই সময় আমাদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'বোমার শব্দ ডুবিয়ে দাও গানের সুরে।' আমরা তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। সংস্কৃতিকে আমরা দাঁড় করিয়েছি রাজনীতির শক্ত পায়ের ওপর। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বহুবর্ণ বিচিত্র রূপ আমরা ফুটিয়ে তুলেছি।'

কমরেড খুয়ে বললেন, 'ভিয়েতনামে যত জাতি-উপজাতি আছে, তাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব লোকসঙ্গীতের সুর। সেইসব সুরে আমরা গান বাঁধি। মুয়ংদের কিছু কিছু গানের ধরন আছে, যা সারা দেশে এখন খুব

জনপ্রিয়। তার মধ্যে একটি হলো 'ভি'। ধানক্ষেতে কাজ করার সময় একজন ছেলে আর একজন মেয়ে কথোপকথনের ভঙ্গিতে এই গান গায়। নবান্নে আর বসন্ত উৎসবে দ্বৈতকণ্ঠে এই গান গাওয়া হয়। সুর যেমন তেমনি রেখে শুধু কথাগুলো আমরা বদলে দিয়েছি। একটি মেয়ের কাছ থেকে তার প্রেমিক বিদায় নিচ্ছে। ছেলেটি যাচ্ছে ফ্রন্টে লড়াই করতে। মেয়েটি বলছে সে রক্ষা করবে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাৎভূমি। ফসল ফলানো, ঘর আগলানো আর একাগ্র প্রেমে অপেক্ষা করা—এই তিন কর্তব্য সে সাধবে।

'গানের আরেকটি ধরনের নাম 'তুম্'। বিষয় আর সুর—দুটোকেই এখনকার মতো করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশে দেশবন্দনা আর মুয়ং অঞ্চলের প্রতি ভালবাসা। দ্বিতীয় অংশে মুয়ংভূমি রক্ষায় যুবশক্তির সাহস আর মনোবলের কথা।

'মুয়ংদের সবচেয়ে প্রিয় বাজনা হলো কাঁসর। তিরিশ থেকে সত্তর মিলিমিটার অবধি একেকটির বেড়। একেকটি ব্যাণ্ডের দলে থাকে সাতটা থেকে বারোটা কাঁসর। মুয়ংদের উৎসব, শবযাত্রা, বিয়ে সব কিছুতে কাঁসর বাজানো চাই। আমাদের নাচগানের যে দল, তাতে আছে কুড়িটা কাঁসর। সেকালে মুয়ংরা দুটো মোষ দিয়ে একটা কাঁসর কিনত।

'তাছাড়া আছে একতারা। কেউ কেউ এমনভাবে বাজাতে পারে যে শুনলে মনে হবে মানুষ কথা বলছে। একতারা বাজিয়ে প্রেম নিবেদন করারও এ অঞ্চলে একটা রেওয়াজ আছে।'

থাই উপজাতির নিজস্ব গানের সুর আছে। তায়দেরও আছে নিজস্ব আঞ্চলিক সুর—যে অঞ্চলে কমরেড হো চি মিন গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতেন।

গানবাজনার শেষে একটি মুয়ং কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো হলো। যিনি কবিতাটি লিখেছেন তিনি ছেলেবেলায় ছিলেন মৈষাল—মাঠে মোষ চরাতেন। মৈষাল এখনও আছে। তারা সমবায়ের রাখাল। কিন্তু সেদিন আর নেই। মৈষালদের কপাল ফিরেছে। এখন তারা যেমন মোষ চরায়, তেমনি লেখাপড়াও করে।

নিজের দেশের কথা মনে পড়ে গিয়ে সে রাত্তিরে আমার কান্না পাচ্ছিল।

১৯

আজ প্রাতরাশের পর সদলবলে রওনা হলাম মাই চো জেলায়। ফিরতে সন্ধ্যে হবে। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে অনেকখানি রাস্তা।

যেতে যেতে কথা হচ্ছিল তো-হোয়াইয়ের সঙ্গে। একদিন এই ছিল দিয়েন বিয়েন ফুতে যাওয়ার রাস্তা। সে সময় তো-হোয়াই ছিলেন যুদ্ধের সংবাদদাতা।

তো-হোয়াইয়ের 'উত্তর পশ্চিমের গল্প' হানয়ে থাকতেই আমি পড়েছিলাম। তাতে এ অঞ্চলের নানা সামাজিক প্রথার কথা আছে।

চান্দ্র নববর্ষের সময় হয় 'তেং' উৎসব। পাহাড় অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে তখন এক রকমের খেলা হয়। তাকে বলে 'কন্' ছোঁড়া। রঙে-ছোপানো কাপড়ের একটা বল থাকে। একটা বাঁশের মাথায় বাঁধা চাকতি গলিয়ে বলটা ছুঁড়তে হয়। একদিকে থাকে ছেলের দল আর একদিকে থাকে মেয়ের দল। কোনো ছেলের ছোঁড়া বল কোনো মেয়ে যদি লুফে নেয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই ছেলেটিকে সেই মেয়েটি ভালবাসে। বলটা মাটিতে পড়ে যেতে দিলে বুঝতে হবে মেয়েটি ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান করছে। ছেলেটি তখন আর কোনো মেয়ের দিকে বল ছুঁড়ে তার ভাগ্য পরীক্ষা করবে।

তেং উৎসবের সময় আরেকটি প্রথা এ অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল। লোকে বাড়ির বাইরে লম্বা বাঁশের একটা খুঁটি পোঁতে। তার মাথায় থাকে একটা গোল চাকতি। তার গায়ে ঝোলানো থাকে একটা মাটির সরা আর মাটির তৈরি মাছ। লোকের বিশ্বাস, এর ফলে আলাই-বালাই দূরে থাকে আর পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মারা রাস্তা চিনে বাড়ির উৎসবে এসে যোগ দিতে পারে।

থাইদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল, মেয়ের যে পাণিপ্রার্থী হবে তাকে মেয়ের বাড়িতে থেকে কয়েক বছর বেগার খাটতে হবে। বছর কয়েক পরে তার কাজ পছন্দ না হলে জামাই করা তো হবেই না, উপরন্তু তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

মেওদের মধ্যে এক রকমের বিয়ের প্রথা আছে, যাতে ছেলেরা আনুষ্ঠানিক বিয়ের খরচ এড়াতে পারে। পাত্র আর তার বন্ধুরা রাত্তিরবেলায় পাত্রীর বাড়িতে কায়দা করে ঢুকে পড়ে। তারা মেয়েকে যদি তুলে নিয়ে যেতে পারে তাহলে পরদিন সকালে এসে মেয়ের বাবাকে বলবে। মেয়ের বাবা সেটাকেই তখন বিয়ে বলে মেনে নেবে। অনেক সময় গোটা ব্যাপারটাই হয় আপসে। ছেলের সঙ্গে মেয়ের আগের থেকে সাঁট থাকে। প্রথাও মানা হলো আর বিয়েতে খরচও কিছু হোল না। কিন্তু অতীতে এই প্রথায় অনেক করুণ ব্যাপারও ঘটেছে। মেয়ের অমতে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে হওয়ার ফলে, অনেক মেয়ে দুঃখে আত্মঘাতী হয়েছে। এ প্রথা আমাদের দেশেও ছিল। 'বিবাহ' কথাটার মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। বিবাহ বলতে 'বিশেষভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া।'

রাস্তাটা সুন্দর। পাহাড়ের গা বেয়ে আর নিচের প্রান্তর জুড়ে চোখ জুড়ানো সবুজ। কোথাও কলাগাছ, কোথাও বাঁশঝাড়। একেবারে সিধে ঋজু বাঁশ। যে-রকম আসামে দেখেছি। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যে, লোকের চেহারায় বেশবাসে খুব মিল। হয়তো খাদ্য-পানীয়, অন্তঃপ্রকৃতি, লোককথা, লোকাচার, আমার এমনকি সন্দেহ হয়, খুঁজলে ভাষার ক্ষেত্রেও অনেক দিক দিয়ে দু দেশের মিল আছে।

এপ্রিলের গোড়া। না শীত না গ্রীষ্ম। কিন্তু এখনও দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কুয়াশা। উত্তরের উঁচু পাহাড়গুলোতে শীতের সময় নাকি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে কেবলি উঠছি নামছি। কখনও দূরে গোচর হচ্ছে গ্রাম। অনেকটা আমাদেরই পাহাড়ী গ্রামের মতো।

মাঝে মাঝে খাদের গা ঘেঁষে যাচ্ছে গাড়ি। সারাই হচ্ছে রাস্তা।

উত্তর ভিয়েতনামে ছ হাজার দুশো মাইল টানা রাস্তা। আর চুয়াল্লিশ হাজার মাইল শাখাপথ। তাছাড়া হাজার হাজার মাইল জুড়ে তৈরি হয়েছে গ্রামে গ্রামে প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা। মার্কিন হামলা শুরু হওয়ার পর সারানো আর বজায় রাখার কাজটাই হয়েছে প্রধান।

পাহাড় অঞ্চলে বাঁকে করে মাল বওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। লরি এখনও সংখ্যায় খুব বেশি নয়। 'চৌষট্টি সালে একবার হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, মোট মাল বহন করা হয়েছিল ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টন। তার মধ্যে কাঁধে করে বওয়া মালের পরিমাণ ছিল ন লক্ষ ষোল হাজার টন।

এক জায়গায় এসে পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে রাস্তা। গাড়িটা থামতেই কমরেড চাম আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'নিচে ঐ যে দেখছেন ঘরবাড়ি। ওটাই হলো মাই চো জেলা।'

খাদের ধারে নলবন। হাওয়ায় একটু একটু নড়ছিল। তার ফাঁক দিয়ে পাহাড়তলীর জনপদ দেখা যায়।

কালভার্টের ওপর বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া গেল।

এরপর উৎরাইটুকু পেরিয়ে জেলা-কেন্দ্র ভাং-এ পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগল না।

আসলে আমাদের আরও আগে পৌঁছুবার কথা ছিল। রোদ্দুর বেশ কড়া হয়ে উঠেছে টিনের চালে। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে জেলা প্রশাসনের দপ্তর। কলাগাছ, তরিতরকারি আর ফুলের বাগান।

বাড়িগুলো ঝকঝকে তকতকে। পেছন দিকে ধানক্ষেত।

জেলা প্রশাসনের সভ্য কমরেড চাউ আর সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কমরেড স্থ আমাদের অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেলেন।

কমরেড চাউ বললেন, 'প্রশাসনের বাকি সদস্যরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষে এই একটু আগে মিটিঙে চলে গেলেন।'

সামনে পেছনে লম্বা লম্বা বারান্দা। বড় একটা হলঘর ছাড়াও তার সঙ্গে লাগাও ছোটো ছোটো কুঠুরি। কোনোটা দপ্তর, কোনো কোনোটা অতিথিদের থাকবার জায়গা। পেছনে কলাগাছে ঘেরা রান্নাঘর।

কমরেড চাউ তাঁদের জেলার ছোট একটা বিবরণ দিলেন।

মাই চো হলো উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের একটি জেলা। মোট পরিবারের সংখ্যা বেশি নয়। চার হাজারের কম। কিন্তু লোকসংখ্যা ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি। সুতরাং বোঝা যায়, পরিবারগুলো বহরে বড়।

এ অঞ্চলে বসবাস করে সাতটি জাতি উপজাতির মানুষ। থাই, মুয়ং, থ, মান, মেও, হোয়া আর কিন্ বা ভিয়েত।

এ অঞ্চলে প্রধান ফসল হলো ধান। বছরে দু বার হয়। মে মাসের ফসল হয় এক হাজার হেক্টরে। তেরো শো হেক্টরে হয় অক্টোবরের ধান। আট শো হেক্টর জমিতে হয় ভুট্টার চাষ। তেরো শো হেক্টরে হয় কন্দ। এ জেলায় লোকের অবস্থা খারাপ নয়। গত বছর নিজেরা খেয়েদেয়েও সমবায় থেকে বাড়তি ছ শো টন ধান সরকারকে বিক্রি করা হয়েছে।

ফরাসী আমল পর্যন্ত এ অঞ্চলে বলতে গেলে একজনেরও অক্ষরজ্ঞান ছিল না ; বিপ্লবের পর প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক আর মাধ্যমিক—এই তিন গ্রেডেরই ইস্কুল হয়েছে। প্রথম গ্রেডের ইস্কুলে এখন দু হাজার সাত শো পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র। শিক্ষকের সংখ্যা এক শো নয়। দ্বিতীয় গ্রেডে ছাত্র চার শো বাহান্ন জন আর শিক্ষকের সংখ্যা ছাব্বিশ। তৃতীয় গ্রেডে ছাত্র এক শো তিন আর শিক্ষক আট জন।

বিপ্লবের পর থেকেই পাহাড় এলাকায় সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে। নিম্ন এলাকার বড় বড় শহর থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে পাহাড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে ন বছর ধরে প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় তারা মুক্ত এলাকায়, গেরিলা যোদ্ধাদের অঞ্চলে এবং এমন কি শত্রু-অধিকৃত জায়গাতেও গোপনে জনশিক্ষার কাজ সমানে চালিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তারা পাহাড়জঙ্গলে এক জায়গায় একভাবে থেকেছে। তাদের উৎপাদনের কাজে অংশ নিয়েছে। সেইসঙ্গে তারা স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন শিখিয়েছে, পুরনো কুসংস্কার ছাড়িয়ে বিজ্ঞানের দিকে টেনে এনেছে এবং নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

কমরেড সু বললেন, 'মাই চো জেলায় নাচগানের আটান্নটি দল আছে। তার মধ্যে তেত্রিশটি বেশ ভালো দল। এইসব দলের সাংস্কৃতিক কর্মীর সংখ্যা আট শো সত্তর। বসন্ত উৎসবের সময় সারা উত্তর ভিয়েতনাম মিলিয়ে যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে আমাদের দল পেয়েছে দ্বিতীয় পুরস্কার।'

মাই চো জেলায় সমবায় আছে নব্বইটি। তার মধ্যে সতেরোটি অনেকাংশে যন্ত্রচালিত। তার মধ্যে পাঁচটি জলবিদ্যুৎশক্তিতে চলে।

এ জেলায় অনেক পাহাড়ী নদী। আগে কোনো কাজেই লাগত না। বরং ভয়েরই ছিল। মাঝে মাঝে এইসব নদীর কূলছাপানো বন্যায় পাহাড়তলীর ফসলের ক্ষেত, ঘরবাড়ি সব কিছু ছয়লাপ হতো। নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে এখন যে শুধু বন্যা আটকানো হয়েছে তাই নয়, তা থেকে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ।

দুপুরে ছিল রীতিমত চর্ব্যচোষ্যের ব্যবস্থা। শরীরটা সুবিধের নয় বলে আমি আর সেদিকে ঘেঁষিনি। আমার জন্যে এল পাকা পেঁপে আর চা।

বিকেলের দিকে গেলাম মেওদের দুটি গ্রাম দেখতে।

পাহাড়ের নিচে দিয়ে রাস্তা। পাহাড়ের গায়ে গা দিয়ে কয়েকটা চুনের ভাঁটি। ইতস্তত পড়ে রয়েছে চুনা পাথর।

রাস্তার এক পাশে পাহাড়ীদের বাড়ি। গাড়ির শব্দে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে এসে চোখ বড় বড় করে দেখছে।

গাড়ি যেখানে এসে থামল সেখানে সামনেই জলবিদ্যুতের ঘাঁটি। পাশের পাহাড় থেকে নুড়ির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে স্রোতোলি নদী। নদীতে বাঁধ দিয়ে জলের তোড়ে ঘোরানো হচ্ছে বিশাল চাকা। যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ থাকে, তখন নদীর জল ছোটবড় নালা দিয়ে চালান যায় হয় জলাধারে, নয় ক্ষেতে-খামারে।

একতলার ঘরে ধানভানার কল। আমরা থাকতে থাকতেই থলিতে বস্তায় ধান নিয়ে গ্রামের মেয়েরা এসে হাজির হলো। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িপাল্লা ঝোলানো। তাতে নিজেরাই সব মাপজোক করছে।

সন্ধ্যে নাগাদ বন্ধ হয়ে যাবে ধান ভানার কল। তখন এখান থেকে বিদ্যুৎশক্তি যাবে বাড়িতে বাড়িতে। আলোয় আলো হবে গ্রাম।

এরপর যে গ্রামটাতে এলাম, সেটা আরেকটু বড়। নদীতে বাঁধ দিয়ে এখানেও জলবিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। নালা বেয়ে যেখানে জল গিয়ে জমছে সেখানে চমৎকার মাছ চাষের ব্যবস্থা। বড় বড় মাছ থলবল করছে জলে। যাতে ছিটকে পালাতে না পারে, তার জন্যে চারপাশে জাল দেওয়া।

পাশেই মেওদের বাড়ি। একটি বাড়িতে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। পাহাড়ীদের বাড়ি যেমন হয়। তলায় থাকে গরুছাগল হাঁস-মুরগি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ঘর। প্রায় হল-ঘরের মতো। শোয়াবসা রান্নাবান্না সমস্তই সেই এক ঘরে।

মেঝের ওপর শপ পাতা। এক পাশে কাঠের সিন্দুক। ঘর-গেরস্থালির বেশির ভাগ জিনিসই শিকেয় টাঙানো।

ঘরের এক পাশে আগুন জ্বলছে। তার ওপর চায়ের কেটলি বসানো। বুঝলাম চা না খেয়ে এখান থেকে নড়া যাবে না।

ভেতরটা দেখাচ্ছে ছবির মতো। সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। আলো পড়ে এসেছে। ক্যামেরাতে হাত নিসপিস্ করছে। ঘরের মধ্যে বিনা আলোয় উঠবে না জেনেও সময় দিয়ে ক্লিক করলাম।

বাইরে তখনও খানিকটা আলো ছিল। চলে আসবার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখি এক স্বর্গীয় দৃশ্য। বুড়ি ঠাকুমার কোলে টুকটুকে নাতি। ক্যামেরাটা তাক না করে পারলাম না।

২০

হোয়াবিন ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে মনে পড়ল পূর্ব বাঙলার কথা। কলকাতায় ফেরার জন্য মন আনচান করছে। লড়াইয়ের কী অবস্থা কিছুই জানি না।

হোয়াবিনের হাট দেখার পর সদলবলে রওনা হলাম হানয়ের রাস্তায়। পথে শুধু একটা ইস্কুল দেখবার আছে।

আকাশে মেঘ থাকায় রোদে তেমন তেজ নেই। আবহাওয়া চমৎকার।

গাড়ি এসে থামল ফেরীঘাটে। সামনে কালো নদী। শীতের শেষ। কাজেই দু পাশে ধূ ধূ করছে চড়া। নদী পার হতে বেশি সময় লাগল না।

আমাদের গন্তব্যস্থল, ওপারের ঘাট থেকে বেশি দূরে নয়।

রাস্তার ধারেই পর্দা-টাঙানো একতলা ঘর। দেখে মনে হলো শিক্ষকদের একদল এখানে থাকেন। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিদ্যালয়ের এটাই বোধহয় দপ্তর।

কমরেড দিন্ হোয়াৎ এই ইস্কুলের সহ-পরিচালক। আপিস ঘরে বসে তিনি আমাদের সংক্ষেপে এই ইস্কুল সম্পর্কে বললেন :

'কেন এই ইস্কুল ?

'কমরেড হো চি মিন একবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বলেছিলেন তরুণদের জন্যে চাই এমন ইস্কুল যেখানে কাজ আর পড়া একই সঙ্গে হবে। আমাদের গরিব দেশ। কিন্তু শুধু কি সেই জন্যে তিনি এই ধরনের ইস্কুলের কথা ভেবেছিলেন ?

'না। আমাদের খুব বেশি করে দরকার শিক্ষিত নতুন যুবশক্তির। এ ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শো আটান্ন সালে। যে বছরে আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয়।

'আপনাকে আমাদের শুধু এই হোয়াবিন প্রদেশের কথাই বলছি। অর্থনীতি আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, তাকে রূপ দেওয়া ছিল খুবই কঠিন। পার্বত্য এলাকা বলেই সমস্যাটা ছিল বেশি দুরূহ। জাতীয় সংখ্যালঘুদের ঘরের ছেলেমেয়েদের আমরা কেমন করে শিক্ষিত করব? সমাজতন্ত্র গড়তে গেলে দরকার সমাজতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষ। অর্থনীতি আর সংস্কৃতির দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এ অঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চাই বৈজ্ঞানিক আর কারিগরী জ্ঞান আর সেই সঙ্গে সংস্কৃতিসম্পন্ন মন। তরুণদের এমনভাবে গড়তে হবে যাতে তারা পার্টির নীতিকে হাতেকলমে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

'উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলেও আমাদের তরুণদের ছিল শ্রমক্ষমতা আর সমাজচেতনা। তাদের যা বয়স তাতে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে নিছক ছাত্র হওয়া মুশকিল। বাড়ির অবস্থা তার অনুকূল নয়, সরকারেরও অত টাকা নেই। সুতরাং তৈরি হলো এই ধরনের ইস্কুল। ছেলেমেয়েরা এখানে একই সঙ্গে রোজগারও করে আবার লেখাপড়াও শেখে। কাজ আর শিক্ষা এখানে একটি আরেকটিকে সাহায্য করছে। কমরেড লে জুয়ান একবার এখানে এসে সেই কথাই বলেছিলেন। এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে এমন যাতে তারা পার্টি আর যুবলীগের কর্মসূচীকে জীবনের ব্রত করতে পারে। কমরেড হো বলেছিলেন, তরুণেরা যেন ভাবতে শেখে।

'একষট্টি সালে জরিপ করে দেখা হয় কতটা কাজ হয়েছে। প্রথম তিন বছরে রাস্তা তৈরি, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা—এই ধরনের অনেক কিছু হয়। পরের বছর থেকে জোর দেওয়া হলো উৎপাদনের ওপর—ধান, ম্যানিয়ক, ভুট্টা, আনারস, তৈলবীজ—আমরা এ পর্যন্ত এ সবের চাষ করেছি চার শো হেক্টর জমিতে। নদীর ধারে ধারে আর পাহাড়ে। এখন আমরা পালছি ছ শো গরু-মোষ, চার শো শুয়োর আর অসংখ্য হাঁস-মুরগি। যন্ত্রে ম্যানিয়ক গুঁড়ো করে তা দিয়ে তৈরি হয় একদিকে মদ আর অন্যদিকে নুড্‌ল্।

'তাছাড়া আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ছুতোর মিস্ত্রির কর্মশালা, গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ, চুনের ভাটি, মদের ভাটি, ইটখোলা। এখানকার সব কাজই করে এখানকার ছাত্ররা। শুধু রসুইঘরের জন্যে আছে বাইরের লোক। এখানে যত জমি দেখছেন সমস্তই সরকারের দেওয়া।'

লক্ষ্মী-সরস্বতীকে এক করে এখানে ছাত্রদের যে তপস্যা চলছে, তা দেখবার জন্যে হাঁটা পথে আমরা রওনা হলাম।

ইস্কুলের রাজনীতি-শিক্ষক কমরেড চিয়েম নদীর ধার থেকে পাহাড় অবধি বিরাট এলাকার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, 'এই যে দেখছেন বিরাট এলাকা—আগে এর সবটাই ছিল বনজঙ্গলে ঢাকা। এক সময়ে দিনের বেলাতেও এখানে বাঘ ডাকত।'

ঢালু গা বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে রাস্তা। ডানদিকে পাঁচিলে ঘেরা কারখানাবাড়ি। তার মধ্যে কলকব্জা লোহালক্কড় ভাটি আর চুল্লী। চারদিকে ফসলের ক্ষেত। ম্যানিয়কের চাষ। আনারসের বাগান। ঘরবাড়ি সমস্তই ছিটেবেড়ার। ছেঁচা বাঁশের ছাদ।

পাহাড়ের ওপর বিদ্যায়তন। তার আশপাশ জুড়ে রকমারি ফুলের বাগান। গাছের কেয়ারি করে লেখা নানা রকমের স্লোগান।

একটু নিচে নেমে ছেলেমেয়েদের দুটি ছাত্রাবাস। দরজা খোলা ছিল। ছাত্ররা তখন হয় ইস্কুলে নয় যে যার কাজে গেছে। আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম, সার সার তক্তাপোষের ওপর ছেঁচা বাঁশ। তার ওপর মাদুর। ব্যস্, বিছানা বলতে এই। জানলায় ঝোলানো নানা রঙের ফুলফোটা লতানো গাছ। শিয়রের কাছে দেয়ালে টাঙানো বাঁশের চোঙায় টুথব্রাশ। মাথার ওপর লম্বা তাক। তার ওপর যার যার কাঠের স্যুটকেস আর বই খাতা। দেয়ালে রঙীন ফুলের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। ঘরের একপাশে কয়েকটা তক্তায় টাঙানো চীনেমাটির বাটি। তার ভেতর যার যার নিজের চপস্টিক।

ছেলেদের ঘর তত পরিপাটি নয়। মাথার কাছে দেয়ালে রকমারি নীতি-বাক্য লেখা। মাথার ওপর হেৎনেয় টাঙানো জামাকাপড়।

কারখানা ছাড়াবার পর শুয়োরের বাথান। ভালো জাতের সাদা শুয়োর। আমরা যখন গিয়েছি তখন খেতে দেবার সময়। ওরা খায় ফ্যানভাত আর একরকমের জলজ গুল্মলতা। পরিষ্কার ধোয়ামোছা ঘর। শুয়োরদের জন্যে রান্নার ঘর আলাদা।

আরেকটু এগিয়ে ক্লাবঘর। সেখানে খেলাধুলোর আর গানবাজনার নানা সরঞ্জাম।

একটি চালাঘরে ক্লাস হচ্ছিল। কমরেড হোয়াৎ আমাদের ডেকে নিয়ে

গিয়ে ভেতরে বসালেন। বোর্ডের গায়ে উচ্চতর গণিতের অঙ্ক লেখা। আমরা কোথা থেকে এসেছি কে কী বৃত্তান্ত বোঝালেন কমরেড তো-হোয়াই। সস্তা কাঠের চেয়ার বেঞ্চি। ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে আগ্রহ আর উদ্দীপনা। দেখে কী ভালো যে লাগছিল।

গত তেরো বছরে এই ইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে তিন হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী। তাদেব তিন ভাগের দু ভাগ যে যার গ্রামে ফিরে গিয়েছে। বাকি একভাগের মধ্যে কেউ গিয়েছে দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার কাজে, কেউ কাজ করছে এ দেশেরই বিভিন্ন জায়গায়। আর তার একটা অংশ এখন এই ইস্কুলেই পড়ানো বা শেখানোর কাজে জড়িত।

সাধারণ শিক্ষার যাবতীয় বিষয়সূচী এখানকার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে: রাজনীতি—জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস আর ঐতিহ্য; শ্রম আর উৎপাদন। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান—যা অন্যান্য সব ইস্কুলেই পড়ানো হয়। বিদেশী ভাষা—বিশেষ করে, রুশ, চীনা, ফরাসী, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভাষা। উদ্ভিদ আর প্রাণিবিদ্যা সবিস্তারে পড়ানো হয়, বিশেষভাবে হোয়াবিন প্রদেশের বনসম্পদ আর প্রাণিসম্পদের বৃত্তান্ত সামনে রেখে। তাছাড়া সমবায়, যুবলীগ, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির কর্মপরিচালনা সম্পর্কেও বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়।

এতদিন এখানে মাত্র তিন গ্রেডের ইস্কুল ছিল। গত এক বছর থেকে যোগ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর। এই স্তরের ছাত্ররা পাঁচ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি), বনতত্ত্ব ইত্যাদি পড়ে নানা রকমের পেশায় নিযুক্ত হতে পারবে। উৎপাদন, শিক্ষণ, যুব সংগঠন আর মিলিশিয়া সংগঠন—এই চারটি লক্ষ্য সামনে রেখে এখানে ক্লাস চালানো হয়। এখানে এখন ছাত্রসংখ্যা নশো আর শিক্ষকের সংখ্যা একশো। এই ইস্কুল ছটি অংশে বিভক্ত। একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে সতেরো আঠারো কিলোমিটার।

কাজ আর পড়া মিলিয়ে এই ধরনের ছোট বড় ইস্কুল প্রতি প্রদেশে একটি এবং প্রতি জেলায় তিনটি। সারা উত্তর ভিয়েতনামে এখন এই রকম ইস্কুলের সংখ্যা একশো। এর ভেতর দিয়ে ছাত্ররা তো বটেই, সেই সঙ্গে

শিক্ষকেরাও লাভবান হন। হাতেকলমে কাজের ভেতর দিয়ে নতুন অনেক কিছু জানা যায়।

এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে অনেক ছাত্র এখন সৈন্যবাহিনীতে, কলকারখানায় আর ভূমিসংস্কারের কাজে আছে। ছাত্ররা এখানে কাজ করে শুধু নিজেদের জন্যে নয়, দেশকেও তারা সাহায্য করে—তারা দেশের সম্পদ বাড়ায়। রোজগার আর পড়াশুনা একই সঙ্গে করা যায় বলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বাড়ির লোকে এখন ঢের বেশি সজাগ হয়েছে। এই উপায়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুনো যায় সহজে আর তাড়াতাড়ি। সুতরাং শুধু দেশ গরিব বলেই যে এই ধরনের ইস্কুলের প্রয়োজন, তা নয়। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের খুব বেশি চাড় থাকে বলে এই ধরনের ইস্কুল থেকে পাশ করার হার সবচেয়ে বেশি।

পনেরো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে যাদের বয়স তারা এখানে পড়ে। পড়তে হয় পাঁচ বছরের কিছু বেশি। বছরে ক্লাস হয় পাঁচ থেকে সাত মাস।

কমরেড হোয়াং বললেন, 'এ বছর থেকে আর শুধু যুবকেরা নয়, শিশুরাও যোগ দিচ্ছে এবং অশক্ত আর বয়োবৃদ্ধেরাও স্থান পাবে। যত ছেলেমেয়ে এখানে দেখছেন সবাই জাতীয় সংখ্যালঘু পরিবারের। আমাদের ইস্কুল তার কৃতিত্বের জন্যে পেয়েছে প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতীয় শ্রমপুরস্কার। এটা আমাদের সকলেরই গর্বের বিষয়। আমাদের এখানে কাজ আর লেখাপড়া ছাড়াও আছে স্বাস্থ্য, শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চার নানা ব্যবস্থা।'

ফেরবার সময় শেষ বারের মতো একবার পেছনে তাকালাম। আকাশে মেঘ। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা। ইস্কুলবাড়ির সামনে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। ডানদিকে কারখানার চিমনি। বাঁদিকে আদিগন্ত ফসলের মাঠ।

আগে এই পুরো তল্লাট ছিল বনজঙ্গলে ঢাকা। ছিল বাঘের আস্তানা। সেখানে আজ স্পন্দমান নতুন জীবন। তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর।

যে নৌকোয় নদী পার হচ্ছিলাম, তাতে ছিল একটি মিষ্টিমতো মেয়ে। কমরেড তো-হোয়াই বললেন, 'দেখ, দেখ তোমাদের দেশী মেয়ে।'

পাড়ে নেমে ভালো করে দেখলাম। সত্যি, যে কোনো থাই মেয়েকে আমাদের দেশের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

ক্যামেরাটা সবে তাক করেছি, কমরেড তাই সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'কমরেড, এখানে ছবি তোলা বারণ।'

২১

কাল সন্ধ্যেবেলা হানয়ে ফিরেই গিয়েছিলাম ডক্টর শৈলভাস্করের বাড়িতে। সায়গন হয়ে কলকাতার যেসব কাগজ এসেছে, তা ছ সপ্তাহের পুরনো বাসি। বি বি সি ধরবার চেষ্টা করে শেষকালে হাল ছেড়ে দেওয়া হলো। মেরী খেতে বলায় আমি এক কথায় রাজী। শরীর পটকে যাওয়ায় কদিন খুব ধরকাটের মধ্যে থেকেছি। ভারতীয় রান্না হলে নিরামিষেও এখন আমার অরুচি নেই।

দেশে ফেরার জন্যে কিছুদিন আগে যে রকম অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম, এখন সে ভাবটা কমে এসেছে। কেননা আর দশটা দিন কোনো রকমে কাটাতে পারলেই দেশের মাটিতে পা দিতে পারব।

সকালে উঠতে আজ একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল। ব্রেকফাস্ট শেষ করে লাউঞ্জে আসতেই দেখি আমাদের গোটা দল অনেক আগেই হাজির।

গাড়ি চলল একেবারে সোজা দক্ষিণমুখো। যেদিক দিয়ে যেতে হয় লেখক সঙ্ঘের আপিসে।

মহিলা সমিতির যে বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল, সেটাও বাইরে থেকে অনেকটা লেখক সঙ্ঘের বাড়ির মতই দেখতে।

গেটের কাছে অপেক্ষা করছিলেন তিনজন। মাদাম হুয়ং, মাদাম হুয়ান আর মাদাম লে থু।

উঠে ডানদিকে বসবার ঘর। দেয়ালের গায়ে ঠেস-দেওয়া কাঁচের আলমারিতে নানা দেশ থেকে পাওয়া স্মারক আর উপহার সামগ্রী। ভিয়েতনামে এসে একটা লক্ষ্য করবার মতো জিনিস দেখছি—কোনো প্রতিনিধি বিদেশে গিয়ে যদি কোনো উপহার পায়, তাহলে ফিরে এসে সেই উপহার সে তার সংগঠনের হাতে তুলে দেয়।

মাদাম হুয়ঙের ছেলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে। মাদাম হুয়ানের বয়স হয়েছে। তাঁর তিন মেয়ে। তিনজনই দক্ষিণ ভিয়েতনামে।

জেনেভা চুক্তির ওপর ভরসা করে কোলেরটিকে এইটুকু অবস্থায় রেখে সেই যে তিনি উত্তর ভিয়েতনামে এসেছিলেন, তারপর আর ফিরতে পারেননি। তাঁর তিন মেয়েই আছে মুক্তিবাহিনীতে। ছোটটির বয়স এখন উনিশ। খুব ইচ্ছে করে তাদের দেখতে। মাদাম লে থুর চোখে মোটা চশমা। তাঁর বড় মেয়ের বয়স উনিশ। মেডিকেল পড়ছে। ছোটটির এগারো। একটি মাত্র ছেলে।

ভাঙা দেশকে আবার এক করার যে দুর্বার ইচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামের মানুষের মধ্যে দেখেছি, তার পেছনে জাতীয় চেতনা ছাড়াও আছে অসংখ্য ভাঙা পরিবারের এই রকমের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি।

মহিলা সমিতির তিন নেত্রী যা বললেন, মোটামুটিভাবে তা এই—

'একশো বছরের ফরাসী শাসনে ভিয়েতনামী মেয়েদের ছিল কুকুরের মতো জীবন। তারা ছিল পরাধীন দেশের ক্রীতদাস। পুরুষদের বাঁদী। তাদের আপন অধিকার বলে কিছু ছিল না। শতকরা নব্বই জন মেয়েই ছিল নিরক্ষর। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মেয়ে বলতে কেউ প্রায় ছিলই না।

'কষ্ট আর দুঃখ থেকে বাঁচার পথ মেয়েরা খুঁজে পেল যখন ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হলো। তারা বুঝতে পারল দেশ থেকে পরাধীনতা আর সামন্ততন্ত্র না গেলে মেয়েদের মুক্তি নেই। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে আপোষহীন লড়াই আর ছিন্নভিন্ন দেশকে আবার এক করা—ভিয়েতনামের লক্ষ লক্ষ মেয়ের জীবনের এই আজ মূলমন্ত্র।

'এ তো ভিয়েতনামের ইতিহাসে আজ নতুন নয়। হাজার বছর ধরে এই তো হয়ে আসছে। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পুরুষেরা গেছে লড়তে আর মেয়েরা রক্ষা করেছে ঘর। চীনের হান চু রাজাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে চিং নামের যে দুই বোন নেতৃত্ব দিয়েছিল, আমরা তাদের স্মরণ করি। আমরা স্মরণ করি মাদাম চিউকে, যাঁর জন্মস্থান থান হোয়া। জনগণতান্ত্রিক দেশ গড়ার কাজে আমরা স্ত্রীরা আমাদের স্বামীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। তাছাড়া পতিব্রতা হিসেবে, দেশভক্ত হিসেবে, সন্তান পালয়িত্রী হিসেবে আমাদের মেয়েদের রয়েছে বরাবরের সুনাম। আছে যোদ্ধা স্বামীর প্রতি প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর অবিচল আনুগত্যের ঐতিহ্য।

'ভিয়েতনামের মহিলা সমিতি পঁয়ষট্টি সালের উনিশে মার্চ থেকে তিনটি প্রধান কাজ হাতে নিয়েছে। নারী আন্দোলনের এখন তিন স্তম্ভ :

'এক, ক্ষেত-খামার আর কলকারখানার উৎপাদনে আর দেশের যাবতীয়

কাজে যুদ্ধরত পুরুষদের শূন্যস্থান পূরণ করা। দুই, ঘরসংসারের সমস্ত কাজ করে যুদ্ধরত স্বামী-পুত্রদের নিশ্চিন্ত করা আর লড়াইতে প্রেরণা দেওয়া। তিন, স্থানীয় দেশরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়ে দরকার হলে যুদ্ধ করা।'

পঁয়তাল্লিশ সালের অগস্ট বিপ্লবের ভেতর দিয়ে ভিয়েতনামের মেয়েরা পেয়েছে পুরুষের সমান অধিকার। নির্বাচনে তারা খুশিমত ভোট দিতে এবং দাঁড়াতে পারে। পেয়েছে সভাসমিতি আর ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার সমান অধিকার। মেয়েরা যাতে লিখতে পড়তে পারে তার জন্যে উত্তর ভিয়েতনাম সরকার বিশেষ সুযোগ দিয়েছে। তাছাড়া এখন তারা ইস্কুল কলেজে পড়ার নানা রকম সুযোগ সুবিধে পায়।

মেয়েদের উপযোগী যে কোনো কাজ তারা করতে পারে। মেয়েরা কী পারে না পারে সে সম্বন্ধে পুরনো ধারণাগুলো আজ বদলে যাচ্ছে। হানয়ের উত্তর-পশ্চিমের এক রাস্তায় আমার একবার হঠাৎ নজরে পড়েছিল প্রকাণ্ড একটা ভারবাহী ট্রাকে ড্রাইভারের আসনে বসে একজন ভিয়েতনামী মেয়ে। যে কোনো ক্ষেত্রে সমান কাজে মেয়ে-পুরুষের সমান মজুরি। কারখানায়, আপিসে সমবায়ে—যে কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা নেতৃত্বের পদ পেতে পারে।

সামাজিক ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সমান মর্যাদা—এখন এ হলো এ সমাজের সবচেয়ে বড় ভিত্তি।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বলপূর্বক বিয়ে—সারা দেশে আইন করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এসব কু-প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। আইনত বিবাহ-যোগ্য বয়স ধার্য হয়েছে ছেলেদের কুড়ি এবং মেয়েদের আঠারো। কিন্তু কার্যত ছেলেমেয়েরা সাধারণত এর অনেক পরে বিয়ে করে। যুব আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় তিনটি উপদেশ—এক, দেরিতে প্রেম ; দুই, দেরিতে বিয়ে : তিন, দেরিতে সন্তান। যাতে পড়াশুনোয় আর উৎপাদনে ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্যেই ছেলেমেয়েদের এই উপদেশ দেওয়া হয়

মেয়েদের এবং শিশুদের মারধর করা বা কষ্ট দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য।

মেয়েরা যাতে উৎপাদনে আর সামাজিক কাজে নির্বিঘ্নে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার জন্যে সরকার থেকে তাদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়।

কাজকর্মের ক্ষেত্রে মেয়েদের বিশেষ অধিকারগুলো নিখুঁতভাবে মেনে চলা হয়। কর্মরত অবস্থায় মায়েরা তাদের বাচ্চাদের স্তন্যপান করানোর অবসর পেতে পারে। প্রসূতিরা পায় চিকিৎসার সব রকম সুবিধে। মাতৃসদনের স্বাস্থ্যপরিদর্শকেরা সন্তানসম্ভবাদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে দেখে আসে। মায়েরা সন্তান হওয়ার আগেপরে পুরো মাইনেতে দু মাসের ছুটি পায়। শ্রমিক মায়েরা সন্তান পালনের জন্যে ভাতা পায়, সেইসঙ্গে তাদের রয়েছে বিনামূল্যে ওষুধ আর চিকিৎসার ব্যবস্থা। কারখানায় কারখানায় আছে ক্রেশে আর নার্সারি।

প্রত্যেক মন্ত্রীদপ্তরের -যেমন জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অন্তর্বাণিজ্য আর বহির্বাণিজ্য, আইন, শ্রম ইত্যাদি দপ্তরের—কর্মসূচীতে আলাদাভাবে নারীসম্পর্কিত নীতি নির্দিষ্ট করা হয়। সরকার এ ব্যাপারে যে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, তার প্রমাণ মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কমিটির সভাপতি হলেন স্বয়ং কমরেড ফাম ভান ডং।

উত্তর ভিয়েতনামের সমস্ত গ্রাম আর শহরে খামার আর কারখানায় আছে মহিলা সমিতির শাখা। সমবায়, কারখানা, আপিস আর কাজের জায়গা—এইসব হলো সমিতির গোড়াকার ইউনিট। গ্রাম থেকে জেলা, তারপর প্রদেশ আর কেন্দ্র—এইভাবে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সমবায়ে কৃষক মেয়েরা, কারখানায় শ্রমিক মেয়েরা আর আপিসে মেয়ে কর্মীরা এর সদস্য। সারা দেশের দু কোটি লোকসংখ্যার মধ্যে মহিলা সমিতির মোট সদস্যসংখ্যা ষাট লক্ষের ওপর।

মাদাম হুয়ং বললেন, 'মেয়েদের আমরা বোঝাই যে, নারীর মুক্তি পেতে গেলে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিতে হবে। ক্ষেতে খামারে খনিতে কলে উৎপাদন করতে হবে আর যুদ্ধের সময় বাহিনীতে যোগ দিয়ে দরকার হলে সরাসরি লড়তে হবে।

'আমরা বলি, মেয়েদের দু কাঁধে দুটো ভার। এক কাঁধে সরকার আর অন্য কাঁধে পরিবার। মেয়েদের স্ত্রীর আর মায়ের কর্তব্য করে যেতে হবে।'

মেয়েদের সচেতন করে কাজে নামায় মহিলা সমিতি। বিশ বছরের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সমাজে আজ মেয়েরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে শতকরা আঠারো জন এখন মেয়ে। জাতীয়

পরিষদের স্থায়ী কমিটির সহ-সভাপতি একজন মেয়ে। তাঁর নাম ঙুয়েন থি থাপ।

তাছাড়া শ্রম, অন্তর্বাণিজ্য, খাদ্য, হালকা শিল্প, জনস্বাস্থ্য—প্রত্যেকটি দপ্তরে আছেন একজন করে মেয়ে উপমন্ত্রী।

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মেয়েরা আছেন উচ্চতর দায়িত্বশীল পদে—যেমন, হোয়া বিনে। থাই বিনে শতাধিক গ্রাম্য প্রশাসনে সহ-সভানেত্রী মেয়েরা। গ্রামাঞ্চলে বহু সমবায়ের পরিচালক মেয়ে। '৮ই মার্চ বস্ত্রকলে'র ডিরেক্টর একজন মেয়ে। মেয়েরা এই রকম অনেক ফ্যাক্টরির পরিচালক এবং ওয়ার্কশপের প্রধান। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অন্তর্বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিভাগে প্রচুর মেয়ে কর্মী।

মাদাম লে থু বললেন, 'এখন মেয়েরা সব রকম কাজই শিখে নিয়ে করতে পারে। আমাদের দেশে গ্রামের মেয়েরা বরাবর করত বাড়ির কাজ আর ছেলেরা করত মাঠের কাজ। কিন্তু বিপ্লব আর যুদ্ধের ভেতর দিয়ে অবস্থা বদলে গেছে। এখন মাঠে লাঙল দেওয়া, মই দেওয়া, নিড়ানো, ধান রোয়া, ধান কাটা, ঘরামির কাজ—সমস্তই মেয়েরা করে। ছেলেদের লড়াইতে আর কলকারখানার কাজে পাঠিয়ে থাই বিনের তিরিশ হাজার মেয়ে চাষী এখন ছেলেদের জায়গা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, মেয়েরা এখন বড়াই করে বলে যে, চাষের ভার নিজেদের হাতে নিয়ে তারা এখন আগের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী ফসল ফলাচ্ছে।'

মেয়ে চাষীদের কাজের ব্যাপারে সরকারের আবার কিছু কিছু নিষেধ-বারণ আছে। কোনো কোনো ভারী কাজ তাদের করতে দেওয়া হয় না। মেয়েরা লাঙল দিতে পারে কেবল শুক্‌নো জমিতে। স্বাস্থ্যের হানি হতে পারে বলে জলা জমিতে তাদের লাঙল দিতে দেওয়া হয় না।

ধান হোয়ার দক্ষিণে হলো চতুর্থ অঞ্চল। সেখানকার মেয়েরা বিমানহানার মধ্যেও সমানে মাঠে ফসল ফলিয়েছে আর কারখানায় কাজ করেছে। যখন মাঠে কাজ করে তখনও তাদের কাঁধে থাকে বন্দুক। বুকের রক্তে মাটি ভিজেছে, তবু ধান বোনা বন্ধ হয়নি।

নাম হা প্রদেশের নান ডিং শহরের কাপড়কলে তাঁত ঘরে কাজ করেন দাও থি হাও। তিনি পেয়েছেন জাতীয় শ্রমবীরের খেতাব। পাঁচ বছরে তিনি বুনেছেন আটান্ন হাজার পাঁচ শো মিটার কাপড়। তাঁর তৈরি কাপড়

খুবই উঁচুদরের হয়। আর এই পাঁচ বছর সময়ের মধ্যেই তিন শো শ্রমিককে শিখিয়ে পড়িয়ে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করেছেন। তাছাড়া মিলিশিয়ারও তিনি একজন অগ্রণী সদস্য। নাম ডিং শহরে যতবার মার্কিন হানাদার বিমান এসেছে, ততবারই তার বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন।

উত্তর ভিয়েতনামে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এখন মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। দ্বিতীয় গ্রেডের পাশ-করাদের মধ্যে শতকরা তিরিশজন মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করাদের মধ্যে তেরো থেকে পনেরো শতাংশ মেয়ে। তারা কেউ গবেষক, কেউ শিক্ষক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করছে। বহু মেয়ে সমাজতান্ত্রিক নানা দেশের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে বা গবেষণা করতে গেছে। পুরনো আমলে এসব কিছুই ছিল না।

মাদাম হুয়ান বললেন :

'হা তে প্রদেশে একবার আমার এক অভিজ্ঞতার কথা বলি।

'একদিন আমি বাইরে বেরিয়েছি। এক মহিলার সঙ্গে দেখা। তাঁর বছর চল্লিশ বয়স। উনিশ বছর বয়সে তাঁর স্বামী ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে মারা যান। তাঁর কোলে তখন পাঁচ বছরের ছেলে। সেই ছেলে বড় হলো। আটষট্টি সালে সে উত্তর ভিয়েতনাম সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাল। ফ্রণ্টে যাবার আগে মাকে সে চিঠি লিখল : মা, আমাকে বাবার রাস্তাই নিতে হলো। আমি জানি, আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু তোমাকে সে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। মা, আমার জন্যে অপেক্ষা করো। দেশ এক হলে আবার আমাদের দেখা হবে।

'দু বছর অপেক্ষা করার পর সত্তর সালের নভেম্বর মাসে মার কাছে খবর এলো—তাঁর ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে।

'বিধবা মার কাছে একমাত্র ছেলের মৃত্যু যে কত বড় আঘাত. যে কেউ তা বুঝতে পারে। পাড়াপড়শীরা সবাই ভেবেছিল ছেলেটির মা এ শোক হয়তো সামলাতে পারবে না।

'আমার সঙ্গে তাঁর সেই সময় দেখা। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হলো যেন বিষাদের প্রতিমা। দু দুটো যুদ্ধ ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে তাঁর সংসার। কিন্তু দু একটা কথাতেই বুঝলাম তাঁকে আমার সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। তাঁর মনে দুর্জয় সাহস।

'আমাকে তিনি তাঁর ছেলের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লেখা চিঠির পর চিঠি আর

তার বাচ্চা বয়সে ইস্কুলে পড়ার সময়কার পোশাক দেখালেন। দেখালেন ছেলের কলম খাতা। উঠোনে নিয়ে গিয়ে দেখালেন একপাশে জড়ো করা বাড়ি তৈরির বাঁশ, নারকোল পাতা, দড়ি, কাঠ। এসব তিনি জমাচ্ছিলেন ঘর তৈরির জন্যে। তাঁর ইচ্ছে ছিল ছেলে ফিরে এলে ছেলের বিয়ে দেবেন। ছেলে বউয়ের জন্যে হবে আলাদা ঘর।

'পাড়ার লোকে জানতো রাতের পর রাত ছেলের জন্যে তাঁর চোখে ঘুম ছিল না। সেই ছেলে যখন মারা গেল, পাড়ার লোকে এসে বলল—কদিন তুমি বিশ্রাম নাও, কাজে যেও না। কিন্তু একটি দিনও মাঠে কাজে যাওয়া তাঁর বন্ধ হলো না। পাড়াপড়শীদের তিনি বললেন, যতক্ষণ আমার শরীরে শক্তি আছে, আমাকে কাজ করে যেতে হবে—আমার স্বামীপুত্রহন্তা শত্রুর বিরুদ্ধে এইভাবেই আমি প্রতিশোধ নেব।

'আবার অনেক জায়গায় এমনও দেখেছি যে, মা গেছে কারখানার কাজে। ফিরে এসে দেখে তার বাড়ি বোমায় ধুলিসাৎ। সামনে হাঁ করে আছে একটা শুধু প্রকাণ্ড গর্ত। বাচ্চা মরে গেছে। শেল্টারের আশে পাশে একটা দুটো ছেঁড়া চটি। লাল হয়ে আছে মাটি। এসব দেখে মায়েদের মনে দুঃখের চেয়েও ঢের বেশি ঘৃণার আগুন দাউ দাউ করে জলে ওঠে।

'কখনও কখনও কাজে যাবার সময় দেখি বাচ্চাদের কারো একটা হাত নেই। তারা তাদের ঠাকুমাকে জিগ্যেস করে, 'ঠাকুমা, কবে আমার হাত আবার গজাবে?' ঠাকুমারা তার কী উত্তর দেবে?

'এই বেদনাই আজ ভিয়েতনামের মেয়েদের সংগ্রামের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে।'

(আমার ডায়রিতে এই জায়গায় লেখা রয়েছে দেখছি : 'তিন জন মহিলারই চোখ ছল ছল, গলা ভারী। হুয়ং উঠে পর্দার আড়ালে গেলেন। চোখ মুছতে?)

মাদাম লে থু বললেন, 'দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেয়েদের লড়াই উত্তর ভিয়েতনামের মেয়েদের অসম্ভব প্রেরণা দেয়। পাঁচটি সন্তানের জননী উৎ টিক। উত্তর ভিয়েতনামের ঘরে ঘরে তাঁর নাম শুনবেন। গেরিলা বাহিনীর তিনি একজন নেতা। এই হলো আজকের ভিয়েতনাম।

'এখনও যে কোনো দিন আমাদের মাথার ওপর মার্কিনদের বোমা পড়তে পারে। দক্ষিণ হলো রণাঙ্গণ আর আমরা তার পশ্চাৎভূমি। আমাদের

সমিতির ওপর রয়েছে উৎপাদন আর উৎপাদনের তদারকিতে মেয়েদের উৎসাহিত করার ভার। যাতে রণাঙ্গনের সমস্ত প্রয়োজন পশ্চাৎভূমি মেটাতে পারে।

'মেয়েরা কাজ করে নানা ক্ষেত্রে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা একশো জনই মেয়ে-শিক্ষিকা। সাধারণ ইস্কুলগুলোতে যাঁরা পড়ান, তাঁদের মধ্যে শতকরা সাতচল্লিশ জন মেয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা তিপ্পান্ন জন মেয়ে শিক্ষিকা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে মেয়েরা শতকরা ছাপ্পান্ন জন। হাঁস-পাতালের রোগীদের জিগ্যেস করলে বলে—আমরা মেয়েদের কোমল হাতে যোগানো দুধ পছন্দ করি। মেয়েরা অন্তর্বাণিজ্যে শতকরা পঞ্চান্ন জন আর হালকা শিল্পে শতকরা ষাট জন।

'কয়েকটি ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজ করা বারণ। যেমন খনির নিচে। ইস্পাতের ঢালাই ঘরে। সিমেণ্ট তৈরির জায়গায়।

'শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশি মেয়ে কর্মী।

'লেখিকা হিসেবে নাম করেছেন মাদাম ভু. থি থুয়ং। মাদাম থুয়ং হলেন ভারততত্ত্বজ্ঞ কবি ভিয়েনের স্ত্রী এবং তাঁর লেখার প্রধান বিষয় হলো গ্রাম আর চাষীর জীবন। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই কবি আর কথাসাহিত্যিক। লেখাকে অনেকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

'মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ থিয়েটার, সিনেমা, প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

'আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আই লিয়েন আর সং কিম—দু জনেই খুব নামকরা অভিনেত্রী।

'মেয়েদের নানা কাজের উপযোগী করে তোলার জন্যে সরকারি শিক্ষণ-ব্যবস্থা আছে। সমিতিও আলাদাভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে।'

আলোচনাপ্রসঙ্গে বেশ্যাবৃত্তির কথা উঠল।

পৃথিবীর সব দেশের মতই উত্তর ভিয়েতনামেও বেশ্যাবৃত্তির সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল হাইফং বন্দর। দেশবিদেশের নাবিক আসত এই বন্দরে। এই বৃত্তির একটা অবশ্যম্ভাবী ফল হলো যৌনব্যাধি।

মাদাম লে থু বললেন :

'বিপ্লবের পর আমাদের প্রধান কাজ ছিল গণিকাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, প্রায় প্রত্যেকেই যৌন-ব্যাধিতে ভুগছে।

সবাইকে এক জায়গায় রেখে একদিকে আমরা তাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করি এবং অন্যদিকে নানা রকম বৃত্তি শেখাতে আরম্ভ করি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে মেয়েদের এই ঘৃণ্য জীবিকার পথে ঠেলে দেয়, এটা আমরা তাদের বুঝিয়ে দিই। তারা তাদের জীবন দিয়েই তা বোঝে।

'বছরের পর বছর ধরে এইভাবে চিকিৎসা করে রোগমুক্ত হয়ে এবং সেলাই, বোনা ইত্যাদি নানা রকম হাতের কাজ শিখে এখন তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। অনেকে বিয়ে করে সংসার করছে। গ্রামের মেয়েরা অনেকেই এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরে সুস্থ শরীরে মাথা উঁচু করে শহর ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে গেছে।'

বিকেলে দেখা হলো ভিয়েতনাম লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক কমরেড নুয়েন ডিন থিনের সঙ্গে। ভারি সুন্দর দেখতে। এতদিন ছিলেন হানয়ের বাইরে। ওঁর বাড়ি কুয়া বিন প্রদেশে।

চা খেতে খেতে কথা হলো।

কমরেড থিন ভারতের সঙ্গে ভিয়েতনামের অতীতের নিকট সম্পর্কের কথা তুললেন। বললেন:

'যত দক্ষিণে যাবেন ততই দেখবেন ভারতের সঙ্গে ভিয়েতনামের কি রকম মিল। বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়ে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছি। বৌদ্ধধর্মের একটা বড় কথা হলো বিশ্বপ্রেম। তা থেকে এসেছে আজকের বিশ্বভ্রাতৃত্ব। শুধু নেওয়া নয়। দেওয়া। শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি নয়। পরের ভালো করা। কমরেড লে সন কদিন আগে বৌদ্ধধর্মের মহান ঐতিহ্যের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে সংগ্রামের শক্তিকে মেলাতে হবে।

'ভিয়েতনামের যে লোকসাহিত্য, তার অনেক কিছুরই আদি উৎস হলো ভারত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সংস্কৃত আর পালি জানতেন। ফরাসী রাজত্বের আমলে শিক্ষার সেই ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। স্বাধীন উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম যখন আবার এক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তখন প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের মেলবন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আদর্শের ভিত্তিতে পরস্পরকে আমরা সমৃদ্ধ করব।

'ফরাসী আমলে আমাদের তরুণ লেখকেরা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া

ভারতের আর কোনো লেখকের কথা জানত না। বিপ্লবের পর আবার আমরা এ বিষয়ে মন দিতে শুরু করেছি। কমরেড সান অনুবাদ করেছেন কালিদাসের মেঘদূত। অন্যান্য লেখাও কিছুটা অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু এই অনুবাদের অবলম্বন এখনও ইংরেজি কিংবা ফরাসী। আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাষা থেকে সরাসরি ভিয়েতনামী ভাষায় এবং ভিয়েতনামী ভাষা থেকে সরাসরি ভারতীয় ভাষায় পারস্পরিক অনুবাদের কাজ আমরা সম্ভব করে তুলতে পারব। কিন্তু তার আগে লড়াই জিতে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। তখন আমাদের দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত আদানপ্রদান অনেক বাড়তে পারবে।'

কথাপ্রসঙ্গে কমরেড থি বললেন, 'রাজনৈতিক আর সামরিক লড়াই ছাড়াও আমাদের দেশের একটা বড় ব্যাপার হলো আমাদের সমাজে জাতীয় ধরনের লড়াই। জাতীয় সংস্কৃতি এবং সমাজের বিশেষ ধাঁচ বজায় রাখার লড়াই।'

ফরাসী আমলে ভিয়েতনামে এক সময় প্রচুর ভারতীয় ছিল। গল্প করতে করতে তাদের কথা উঠল।

দিল্লীতে কমরেড তো-হোয়াইয়ের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয়, তখনও একবার এ নিয়ে কথা হয়েছিল। তো-হোয়াইদের গ্রামে নাকি এক ভারতীয় পরিবার ছিল। সেই পরিবারের 'উধো সিং' ছিল তো-হোয়াইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু। তাদের ছিল দুধের ব্যবসা। চীনের মত ভিয়েতনামেও আগে দুধের চলন ছিল না। ভারতীয়রাই নাকি মোষ-গরু পুষে ওদেশে দুধ দই মাখনের প্রচলন করে। তো-হোয়াই শুনেছিলেন তাঁর বন্ধু উধো সিং নাকি পরে গেরিলাযোদ্ধা হয়েছিল। সঠিক খবর পাওয়া যায়নি। হানয়ে এসেই আমি তো হোয়াইকে জিগ্যেস করেছিলাম। কিন্তু তো-হোয়াই কোনো হদিশ করতে পারেননি। কোনো ভারতীয় বংশধর ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে, এ খবর ছবিসুদ্ধ দিতে পারলে যে কোনো ভারতীয় পাঠকের কাছে রীতিমত গর্বের বিষয় হতে পারত।

কমরেড থি বললেন, 'ফরাসী রাজত্বে যেসব ভারতীয়রা এদেশে এসেছিল তারা মোটামুটি তিন ধরনের কাজ করত। একদল গরুমোষ রেখে দুধ বিক্রি করত। একদল করত ফরাসী আপিসগুলোতে দারোয়ানির কাজ। আরেক-দলের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। এদের কাজকারবারে আর ব্যবহারে

ভিয়েতনামের মানুষ তিতিবিরক্ত হতো। ফরাসীদের আওতায় থেকে তারা অনেকে এদেশের মানুষকে নানাভাবে শোষণ করত। ফলে, ফরাসীরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদেরও আর এখানে টেঁকা সম্ভব হয়নি। যারা তাদের মধ্যে দীনদরিদ্র ছিল, বিয়ে থা করে তারা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশে গেছে। যুদ্ধের পর ফরাসীদের সহযোগী হয়ে এসেছিল ইংরেজের পল্টন। তাতে ছিল প্রচুর ভারতীয় গুর্খা সেপাই। ভিয়েতনামের মাটিকে তারা ভিয়েতনামীদের রক্তে রক্তাক্ত করেছে।

'কাজেই এইসব নানা কারণে একালে ভিয়েতনামী জনসাধারণের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক মধুর হওয়ার তেমন সুযোগ মেলেনি।

'এক জাতের বিরুদ্ধে অন্য জাতকে লড়িয়ে দেওয়া, জাতিতে জাতিতে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করা—এটা সাম্রাজ্যবাদের ধর্ম। দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীদের পদানত ছাব্বিশটি জাতি উপজাতির ঔপনিবেশিক বাহিনীর লোক ধরা পড়েছিল। ভিয়েতনামের মানুষদের দমন করার জন্যে ফরাসীরা আফ্রিকা থেকে ভাড়াটে সৈন্য আনাত। তেমনি তারা আবার আফ্রিকানদের টিট করত ভিয়েতনাম থেকে ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে গিয়ে। ফলে, ভিয়েতনামীরা যেমন আফ্রিকানদের তেমনি আফ্রিকানরাও ভিয়েতনামীদের ঘৃণা করত। এটা হলো সাম্রাজ্যবাদের একটা কৌশল।'

থি বললেন, 'জানেন তো, আজ রেডিওতে নিকসনের বক্তৃতা আছে। উনি এ বছরের মধ্যেই এক লক্ষ সৈন্য উঠিয়ে নেবেন এবং আমাদের বন্দী মার্কিন সৈন্যদের ছেড়ে দিতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, আগে কথা ছিল এই বক্তৃতা তিনি দেবেন পনেরোই এপ্রিল। কিন্তু তার সাত দিন আগে আজকেই তাঁকে সাত তাড়াতাড়ি এই বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে হচ্ছে। কেন? না, কম্বোজে আর লাওতে মার খেয়ে। তার ওপর, নিজের দেশের লোকদেরও আর তিনি সামাল দিতে পারছেন না। ভিয়েতনামের পক্ষে আন্দোলন সেখানে দিন দিন বাড়ছে।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে আগে ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ মার্কিন সৈন্য। ঠেলায় পড়ে দু লক্ষকে সরাতে হয়েছে। যতক্ষণ না ওরা ভিয়েতনামের জমি একেবারে খালি করে দিচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের লড়াই চলবে।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে সাক্ষীগোপাল বাহিনী, তার বড়কর্তারা এককেজন রীতিমত টাকার কুমির। কর্নেল থ' নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে, সংসার

চালাতে মাইনের টাকা তার দরকারই হয় না। নানা দিক থেকে তার বিস্তর রোজগার। লুটতরাজ ছাড়াও স্বনামে বেনামে নানান ব্যবসায় তার টাকা খাটছে। বিদেশের ব্যাঙ্কে তার প্রচুর টাকা জমানো আছে। কি-র বউ হাজার হাজার হেক্টর চাষীর জমি হাতিয়ে নিয়েছে। এক অফিসারের ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে কেক হয়েছিল চার মিটার সমান উঁচু।

'সামরিক কর্তাদের কাছে এই লড়াইটা হয়েছে দাঁও মারার বেশ ভালো ব্যবসা। তারা এ থেকে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে। কাজেই তারা চায় যুদ্ধ চলুক।

'বুর্জোয়াদের ব্যবসার ভিত্তি খুব নড়বড়ে। কাজেই তারা এতে খুশি নয়। দাপট বেশি জমিদারদের। মার্কিনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটা নতুন শ্রেণী গজাচ্ছে। এরা মার্কিনদের উচ্ছিষ্টভোগী।

'কফি-বাগান রবার-বাগিচা সমস্তই পাহাড়ের ওপর। ফরাসীরা তার মালিক। কিন্তু এখন সে মালিকানা শুধু নামে। মার্কিনরা এসে ফরাসীদের হটিয়ে দিয়েছে। এইসব ক্ষেতবাগিচা অঞ্চলে দেশপ্রেমিকদের আস্তানা। তাই মার্কিনরা বিষাক্ত বোমা ফেলে বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে গাছপালা লোপাট করে দিচ্ছে।

'জমিদারদের দখলে ধানক্ষেত আর চালকল। বিপ্লবের পর জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিল। চুয়ান্ন সালের পর আবার তারা যে যার গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। তারপর যখন গেরিলারা মাথা তুলে দাঁড়াল তখন আবার তারা সরে পড়ল শহরে। এখন আর তারা সাহস করে নিজেরা যায় না। গ্রামে খাজনা আদায় করতে এখন তারা পাইকপেয়াদা সঙ্গে দিয়ে দালালদের পাঠায়।

'বিপ্লবের পর দক্ষিণ ভিয়েতনামের যে কৃষকেরা জমি পেয়েছিল, তারা কিন্তু চুয়ান্ন সালের পরেও দখল ছাড়েনি। জমিদারের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন আর তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম তাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'আগে সায়গনের লোকসংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। সে জায়গায় এখন হয়েছে চল্লিশ লক্ষ। ঘরবাড়ি জমিজায়গা বোমার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় করেছে। তাছাড়া যেসব এলাকায় গেরিলাদের আস্তানা, সেইসব এলাকা থেকে গ্রামকে গ্রাম তাড়িয়ে শহরে আনা হয়েছে।

তারপর তাদের দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে পুতুল বাহিনী। আর তাদের লাগানো হয়েছে বেশ্যাবৃত্তিতে, জুয়োর আড্ডায়, চোরাকারবারে আর যত রকমের কুকর্মে। শহরের যা কিছু বিলাসব্যসন, সমস্তই মার্কিন টাকায়। আগে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাত্র তিন শতাংশ লোক শহরে থাকত। এখন শহরে থাকে চল্লিশ শতাংশ। এইভাবে গ্রাম উজাড় করে শহরে এনে ওরা সৈন্য বাহিনীতে লোক ভর্তি করছে। শহরের সবাই প্রায় মার্কিনদের দাক্ষিণ্যের ওপর ভরসা করে চালায়। তার ফলে, কিছুদিন আগে মার্কিন সৈন্যদের একাংশ যখন চলে গেল, তখন বহুলোক বেকার হয়ে পড়ল।

'দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনরা বোমা ফেলে ফেলে এমন অবস্থা করেছে যে সেখানকার কৃষিজীবী জনসংখ্যার শতকরা ষাট জন বোমার উপদ্রবে মাটির তলায় বাস করে। অন্ধকারে আর কম আলোয় বেশিক্ষণ থাকার দরুন তাদের মধ্যে চোখের অসুখ খুব বেশি। কোনো কোনো জায়গায় চাষীরা বোমারুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিরুপদ্রবে মাঠে চাষ করার জন্যে উলঙ্গ হয়ে নিজেদের আর মোষদের গায়ে মাটি মাখিয়ে নেয়।

'মার্কিন আক্রমণ দেখে দেখে তারা হদ্দ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে দেখেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সরকারের পর সরকারের পতন। কোথাও কোথাও সম্ভব নয় বলে তারা ওপর ওপর কোনো রকম বিদ্রোহের ভাব দেখায় না। আসলে তারা তলে তলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ রাখে। শহরে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া লোকেরা সুযোগ পেলেই পালিয়ে আবার গ্রামে চলে আসে।

'আবার অনেক জায়গায় ওপরে পুতুল সরকারের শাসনের কাঠামো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলেছে আদ্যোপান্ত বিপ্লবীদের ব্যবস্থা। আটষট্টি সালে সায়গনে যখন অন্তর্বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন সটান তার দ্বারদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিল মুক্তিবাহিনী। পরে পিছিয়ে এলেও মাঝে মাঝে হানা দেওয়া কখনও বন্ধ হয়নি। পুতুল বাহিনী তিন লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেও সাইগনে বিপ্লবীদের গতিবিধি আটকাতে পারেনি। তার কারণ, শহরের সাধারণ মানুষ আমাদের পক্ষে।

'আসলে কী জানেন, নিকসন নীতিতে মার্কিনদের পুরনো ধারা কিছু বদলায়নি। ওয়েস্টমোরের আমলে নীতি ছিল: মার্কিনরা সামনে আর সাক্ষীগোপালেরা পেছনে। নিকসনের নীতি হলো সাক্ষীগোপালেরা সামনে আর মার্কিনরা পেছনে। সামনে না থেকে পেছনে থাকা—ঐটুকুই যা বদল।'

সন্ধ্যেবেলা ছিল ভারতীয় কন্সালের বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন।

কূটনীতিকের চাকরির ওপর লোভ অনেকেরই। একে তো বিদেশে বাস করার সুযোগ। তার ওপর বিনা শুল্কে নানা জিনিস কেনার সুবিধে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সাহেব মেম বানাবার এত শস্তা উপায় আর দ্বিতীয় নেই।

কিন্তু হানয় বিদেশ হলেও একেবারে অন্য জাতের শহর। এখানে কূটনীতিকদের ভালো লাগার কথা নয়। তার ওপর আমাদের কন্সালের যখন বয়স কম।

আশ্চর্য! স্বামীস্ত্রী দু জনেই দেখলাম হানয়ের বেজায় ভক্ত। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভক্ত কন্সালের বৃদ্ধা মা। হানয়ের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ।

শুধু কি ভারতীয় বলে? তাহলে সুইডিশ মেয়ে লিলি হানয় বলতে অজ্ঞান কেন? হানয়ের জাদু আছে?

২২

সকালে গেলাম লাও বার্তা আপিসে। উঠোন পেরিয়ে ওপরে ওঠার ঘোরানো সিঁড়ি।

ঘরের মধ্যে দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড মানচিত্র।

আপিসের যিনি ভারপ্রাপ্ত, তিনি গোড়ায় লাওদেশের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। ভিয়েনতিয়ানের এয়ারপোর্টে দূর থেকে কিছু গাছপালা দেখা ছাড়া লাওদেশ সম্পর্কে এর আগে আমার বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ রায় কূটনীতিক কাজকর্মে কিছুকাল লাওতে ছিলেন। তাঁর কাছে সে দেশের কথা কিছু কিছু শুনেছিলাম।

ঢালা হচ্ছিল কাপের পর কাপ চা। লাওদেশের মুখপাত্র বলছিলেন লাও ভাষায়। তাঁর এক দোভাষী তা ভিয়েতনামী ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। আমাদের দোভাষী তার তর্জমা করছিলেন ইংরিজিতে। আর আমি আমার ডাইরিতে তা বাঙলায় নোট করছিলাম। শুনে যতটা ঘোরালো ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু ততটা ঘোরালো নয়।

আমরা কি ভাবতে পারি—দিল্লিতে বসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো মুখপাত্র বাঙলায় বলছেন, তার হিন্দি তর্জমা হচ্ছে এবং তারপর তা বিদেশী কোনো ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে? অথচ লাওয়ের চেয়ে ঢের ঢের বড় দেশ আমাদের ভারত।

যাই হোক, লাও সম্পর্কে হানয়ে বসে যতটুকু জানলাম নিজের ভাষায় বলছি।—

নানা দেশের মাঝখানে ছোট্ট দেশ লাও। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই গুণ হয়েও লোকসংখ্যায় কলকাতার অর্ধেকেরও অনেক কম। উঁচু পাহাড়, বিশাল মালভূমি আর উর্বর সমতল—এই নিয়ে লাওদেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণবাহী সবচেয়ে বড় নদী মেকং। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত থাকায় লাওয়ের নদীগুলো নাব্য নয়। ফরাসী রাজত্বে রেলপথ তো হয়ইনি, রাস্তাঘাটও খুব কম হয়েছে।

অথচ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে লাও খুবই সমৃদ্ধ। মাটির নিচে আছে টিন, লোহা, কয়লা, সিসা, তামা, সোনা, রুপো, গন্ধক, রসাঞ্জন এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু এ সত্ত্বেও টিন ছাড়া অন্য কোনো খনিজই এ পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়নি। বনসম্পদের মধ্যে বাঁশ, কাঠ, রঞ্জন, লাক্ষা ইত্যাদি ছাড়াও বাঘ, ভালুক, হাতি, হরিণ, বনশুয়োর, বানর, উল্লুক ইত্যাদি নানা ধরনের প্রচুর বন্যপ্রাণী আছে।

লাও মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লোক কৃষিজীবী। ধান ছাড়াও খাদ্য ফসলের মধ্যে হয় ভুট্টা, কন্দ, মিষ্টি আলু। ফলের মধ্যে হয় সমতলভূমিতে নারকোল, কমলালেবু, কলা, আম ইত্যাদি। অন্যান্য ফসল বলতে তুলো, তামাক, কফি, চা। আর আছে আফিম ফুলের চাষ। লাওয়ের গৃহপালিত পশুসম্পদ প্রচুর। কোনো কোনো অঞ্চলে ভালো জাতের ঘোড়া পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে আছে নানা রকমের কুটির শিল্প। সুতী আর রেশমের কাপড় ছাড়াও দড়ি, জাল, বেতের জিনিসপত্র কেনা হয়। চাষের যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, হাঁড়িকুড়ি, গয়নাগাঁটি, গাড়ি বানানো হয়। পঁয়তাল্লিশ সালের আগে পর্যন্ত সারা দেশে কারখানা বলতে ছিল শুধু পাঁচ থেকে বিশজন মজুর নিয়ে ধান ভানার গুটি দশেক কল, প্রদেশের শহরগুলোতে বিজলিকল আর জলকল, কিছু কাগজকল করাতকল বা বয়নকল। বড় দরের শিল্প বলতে ছিল একমাত্র টিনের খনি।

যারা বিদেশী—ফরাসী, ভারতীয়, ভিয়েতনামী, চীনা—তারাই মুঠোয় করে রেখেছিল শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য। গ্রামের দিকে টাকা পয়সার চলন ছিল না। লোকে প্রধানত জিনিসের বদলে জিনিস লেনদেন করত।

লাও ছোট হলেও বহু জাতির দেশ। প্রধানত তিনটি জনধারা এসে মিশেছে এখানকার মাটিতে। প্রত্যেকটির মধ্যে আবার নানা জাতি উপজাতি। সবার যোগাযোগ আর দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের লাও দেশের সম্মিলিত জাতীয় সংস্কৃতি।

লাও সরকারের মুখপাত্র আমাদের বলছিলেন, 'জাতি-উপজাতিতে আমাদের মধ্যে আটষট্টি রকমের ভাগ। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমাদের ঐক্য বৌদ্ধ ধর্মে। লাও দেশের শতকরা নব্বই জনই বৌদ্ধ। তার ফলে লোকে অমায়িক প্রকৃতির আর নরম স্বভাবের। লাও ভাষার আর লাও লিপির উদ্ভব পালি ভাষা থেকে।'

লাও দেশে সরকারি ক্ষমতার পাশাপাশি ওপর থেকে নিচে অবধি বিস্তৃত বৌদ্ধধর্মের সংগঠন। গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষুদের প্রবল প্রতিপত্তি। সাম্রাজ্যবাদ আর প্রতিক্রিয়া তাই বরাবর চেয়েছে দুর্নীতি ঢুকিয়ে বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডাদের হাত করতে এবং তাদের মধ্যে দালাল তৈরি করতে। মার্কিনরা মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে মঠে বিহারে থেকে গুপ্তচর বৃত্তি চালিয়েছে।

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে লাও দেশপ্রেমিক ফ্রণ্টের সঠিক নীতির ফলে তাদের সে ষড়যন্ত্র মোটের ওপর ব্যর্থ হয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ পুঁথিপুরাণ আর রামায়ণ থেকে বিষয় নিয়ে লাও ভাষায় অনেক গাথা কাব্য লেখা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী আর ইতিবৃত্ত। লাওয়ের লোকসাহিত্যও খুব সমৃদ্ধ।

লাওয়ের আরেক বৈশিষ্ট্য তার লোকগীতি আর লোকনৃত্য। আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকেই নাচ গান ভালবাসে। যে কোনো উৎসবে অবকাশে জ্যোৎস্না রাত্রে বিশেষ করে তরুণতরুণীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে দল বেঁধে নাচগান করে সারা রাত কাটিয়ে দেয়।

ফরাসীরা লাওদেশ দখল করে ১৮৯৩ সালে। তারপর থেকে লাওয়ের মানুষ পুরুষানুক্রমে আক্রমণকারী বিদেশীদের বিরুদ্ধে একের পর এক লড়াই করে চলেছে। ফরাসীরা এই দেশের ধনদৌলত লুট করে নিয়ে

গিয়ে নিজের দেশে জিনিস তৈরি করে এদেশে বেচেছে। লাওবাসীদের গলায় পা দিয়ে ছুতোয় নাতায় গরু, মোষ, হাতি, ঘোড়া, নৌকো বাবদ আদায় করেছে ট্যাক্স আর খাজনা। তাছাড়া ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জন্যে প্রত্যেক লাওবাসীকে বছরে প্রায় ষাট দিন বেগার খাটতে হতো। সেই সঙ্গে তারা এক জাতের বিরুদ্ধে অন্য জাতের সন্দেহ-সংশয় আর দ্বন্দ্ব-বিবাদের আগুন উস্কে দিয়ে তাদের আলাদা করে রাখত। ফরাসী রাজত্বে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হতো ফরাসী ভাষায়। লাও ভাষাকে গণ্য করা হতো বিদেশী ভাষা বলে। শতকরা পঁচানব্বইজন লাওবাসী ছিল নিরক্ষর। বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সারা লাওদেশে মাত্র পাঁচটি প্রাথমিক আর মাত্র একটি মাধ্যমিক ইস্কুল ছিল। লাও ভাষায় পুরনো কয়েকটি লোককথার সংকলন ছাড়া কোনো রকম বইপত্র বা খবরের কাগজ ছিল না। সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের না ছিল কোনো সুযোগ, না কোনো অধিকার। লাও সমাজে জুয়ো, মদ, আফিম, বেশ্যাবৃত্তি যাতে বেড়ে যায়, তার জন্যে উৎসাহ যোগাত ফরাসী ঔপনিবেশিকের দল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের তোড়ে শেষ পর্যন্ত ফরাসীরা ভেসে গেল। কিন্তু নতুন ঔপনিবেশিকতার শিকল হাতে নিয়ে এল মার্কিনের দল। সামনে রইল তাদের হাতের পুতুল একদল পেটোয়া লোক। স্থানীয় শিখণ্ডীদের সামনে খাড়া করে পেছন থেকে লড়াই চালানো—এই হলো নিকসনের নীতি।

কিন্তু মার্কিনরা লাওতে একের পর এক হারছে। যত হারছে ততই তারা যুদ্ধের ক্ষেত্র বাড়াচ্ছে। লাওয়ের মতন কম্বোজে আর দক্ষিণ ভিয়েত-নামেও তারা একই মতলব নিয়ে চলেছে। তাই লাওয়ের সঙ্গে এই দু দেশের গড়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ সংগ্রামী সম্পর্ক।

মার্কিনরা চেষ্টা করছে ঐ দুই দেশ থেকে লাওকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। লাও যাতে সক্রিয়তা থেকে নিষ্ক্রিয়তার স্তরে চলে যায়। সশস্ত্র সামরিক শক্তি নিয়ে লাওয়ের মুক্তাঞ্চলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা যত মার খাচ্ছে ততই পাগলা কুকুরের মতো দাঁত খিঁচোচ্ছে।

মুখে শান্তির কথা আর সৈন্য সরানোর কথা বলছে, অথচ সারা দেশে ডেকে আনছে ধ্বংসের বন্যা। আলোচনায় বসবার প্রস্তাব দিচ্ছে আর সে প্রস্তাবে রাজী হলে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের ওরা বড় বেশি চালাক ভাবে।

এরপর লাওয়ের মুক্তাঞ্চলের কথা উঠল। মুখপাত্রটি বললেন :

'লাওয়ের মোট এলাকার তিন ভাগের দু ভাগ এবং মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নিয়ে আজকের মুক্তাঞ্চল।

'মুক্তাঞ্চলের ওপর শত্রুরা বার বার হানা দেওয়া সত্ত্বেও সেখানকার সাধারণ জীবনযাত্রা আদৌ অচল হয়ে যায়নি। বরং যেসব এলাকায় ধ্বংসের মাত্রা কিছুটা কম, সেখানে লোকের জীবনযাত্রা আর শিক্ষা সংস্কৃতির মান আগের চেয়ে ঢের উন্নত হয়েছে। এই উন্নতি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে চাষের ক্ষেত্রে। মুক্তাঞ্চলের একটা বড় অংশ বন আর পাহাড়। আটষট্টি সালের পর দু বছরের মধ্যে চাষের এলাকা আর ফলন বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। সেইসঙ্গে বাঁধ দিয়ে আর নালা কেটে ছ শোর বেশি ছোট আর মাঝারি আকারের সেচ ব্যবস্থা হয়েছে। ধান ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। গ্রামের লোকে এখন কাজ পাচ্ছে আর সেই সঙ্গে নিজেরা যেমন পাচ্ছে তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদেরও খাদ্য যোগাতে পারছে।

'মৃতপ্রায় কুটিরশিল্প পেয়েছে নতুন জীবন। তাঁতীরা আবার কাপড় বুনছে। কামারশালায় আবার তৈরি হচ্ছে কৃষির যন্ত্রপাতি। বয়নযন্ত্র, ছাপাখানা, পটারি, চিনির রিফাইনারি, মেশিন সারাইয়ের ওয়ার্কশপ বসিয়ে ছোট আকারের শিল্পের পত্তন করা হয়েছে। বিমানহানার হাত এড়াবার জন্যে কলকারখানা সবই প্রায় গুহার মধ্যে।

'বনজ সম্পদ রপ্তানি করে কলে-তৈরি নিত্য প্রয়োজনের জিনিসপত্র আমদানি করা হয়। দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট সেই সব সামগ্রী মুক্তাঞ্চলের লোকদের কাছে যেমন বেচে, তেমনি তাদের কাছ থেকে কেনে কৃষিজাত আর বনজাত জিনিস আর সেই সঙ্গে তাদের শিকার করা বা ধরা পশু পাখি মাছ। বিলিব্যবস্থা ভালো হওয়ার ফলে লোকে নিয়মিত ভাবে পায় নুন, কাপড়, লেখার কাগজ, ওষুধপত্র। গৃহস্থালির জিনিস এবং নিত্য ব্যবহার্য সব কিছু।

'আগে যেখানে দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন লোকই ছিল নিরক্ষর এখন সেখানে মুক্তাঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা তিরিশেরও কম। লাও-সুং আর লাও-লুমদের গ্রামগুলোতে সবাই লিখতে পড়তে জানে। মুক্তাঞ্চলে এখন হাজার হাজার বিদ্যালয় আর পাঠশালা। তাছাড়া ডাক্তারি,

বনবিদ্যা, কৃষিতে জলশক্তির প্রয়োগ, শিক্ষক শিক্ষণ, ডাকবিভাগ আর যোগাযোগ সংক্রান্ত পেশাগত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা। সাহিত্য, ইতিহাস আর ভূগোল বিষয়ে আলাদা আলাদা পর্ষৎ আছে। লাও ভাষায় সব বিষয়ে বই লেখা হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের মৌখিক ভাষা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

'শত্রু অধিকৃত এলাকায় এর ঠিক উল্টো। সেখানে বেশির ভাগ লোক এখনও নিরক্ষর। ইস্কুলে এখনও বিদেশী ভাষার, বিশেষ করে ফরাসী ভাষার চল।

'মুক্তাঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া হয়। তার ফলে, মহামারীর ভয় ঘুচেছে। এটা সম্ভব হয়েছে তিন শুদ্ধির ব্রত প্রচার করে: শুদ্ধ খাদ্য, শুদ্ধ পানীয়, শুদ্ধ জীবনচর্যা। আগেকার আমলে সারা দেশে পাশ-করা ডাক্তার ছিল মাত্র একজন। এখন মুক্তাঞ্চলেই কুড়িজন স্ত্রী পুরুষ ডাক্তার। হাসপাতালে আগে যেখানে প্রতি দশ হাজার লোকের জন্যে বরাদ্দ ছিল একটি করে বেড, এখন মুক্তাঞ্চলে সেখানে প্রতি আড়াই শো জনের জন্যে একটি করে বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় আর প্রদেশে প্রদেশে আছে পাশ্চাত্য মতের পাশাপাশি দেশীয় মতে চিকিৎসা আর শুশ্রূষার ব্যবস্থা। অনুন্নত এলাকায় জনস্বাস্থ্য আর রোগব্যাধি সংক্রান্ত আলাদা কমিটি আছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা যত ব্যাপক আর উন্নত হচ্ছে, ততই তাবিজ-কবচ আর ঝাড়ফুঁকের ওপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে যাচ্ছে।

'লাওয়ের আটষট্টিটি জাতি উপজাতিকে একসূত্রে গাঁথার কাজে আমরা নিজেদের ঢেলে দিয়েছিলাম বলেই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদের আমরা রুখতে পেরেছি। তারা আজ লড়াইতে আর উৎপাদনে হাতে হাতে এই ঐক্যের ফল পাচ্ছে। একসঙ্গে লড়াই করার ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে এবং ভালবাসতে শিখেছে। উপজাতি বা গোষ্ঠীর যেসব সর্দার আগে মানুষকে শোষণ করত, তারা এখন নিজেদের শুধরেছে ; এখন তারা ফ্রন্টের কথা মতো সমানে উৎপাদন আর দেশরক্ষার কাজ স্বেচ্ছায় করে চলেছে। এদের শুধু একটা ছোট অংশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পয়সা দিয়ে দলে টানতে পেরেছে।'

মুখপাত্রটি বললেন: 'লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্যে দরকার যুক্ত জাতীয়

ফ্রণ্ট। মার্কসবাদ-লেনিনবাদী আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি হবে তার নেতা।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমাদের যে ফ্রণ্ট হয়, তার নাম ছিল 'নেও লাওই ইৎসালা'। গোড়ায় এটি ছিল গুপ্ত সংগঠন। 'নেও' মানে মুক্ত। এরপর পঞ্চান্ন সালে গড়ে ওঠে মার্কিন আর তার দালালদের বিরুদ্ধে দেশজোড়া নতুন ফ্রণ্ট—নেও লাও হাকসাত (লাও দেশপ্রেমিক ফ্রণ্ট)। এই ফ্রণ্টে যোগ দেয় শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত আর জাতীয় বুর্জোয়া সমেত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং দেশভক্ত ব্যক্তিবর্গ, সমস্ত ধর্মের আর জাতি উপজাতির মানুষ। ইৎসালার চেয়েও হাকসাতের ঐক্য আরও ব্যাপক হয়।

'ষাট সাল থেকে নতুন এক শক্তি হাকসাত ফ্রণ্টের সঙ্গে হাত মেলায়। এদের বলা হয় 'নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক শক্তি।' এদের মধ্যে আছে মধ্যবর্তী স্তরের মানুষ—বিশেষ করে, জাতীয় বুর্জোয়া। এদের মনোভাব মার্কিন হস্তক্ষেপ আর আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং এরা চায় দেশ শান্তি আর নিরপেক্ষতার পথে চলুক। কিন্তু মার্কিনদের কুচক্রান্তে এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়া আর মার্কিন সমর্থকদের কুসংসর্গে পড়ে এরা অনেকে বিপথগামী হয়। এটা একটা অস্থায়ী অবস্থা। প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে ভেতরের লড়াই যত জোরদার হবে এবং বাইরের অবস্থা যত অনুকূল হবে, ততই এই দলছুট অংশটি ক্রমাগত ভেঙে আমাদের সঙ্গে একজোট হবে। এদের ব্যাপকতর অংশ আমাদের সঙ্গে আসায় বিপ্লবের শক্তি ঢের বেড়ে গেছে। এদের আলাদা সংগঠন এবং আলাদা সৈন্যবাহিনী। কিন্তু লড়াই পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের আছে সংযুক্ত সেনাপতিমণ্ডলী। মধ্যবর্তী স্তরের এই লোকজনেরা লড়াই আর কাজের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, এরা সত্যিকার দেশভক্ত।

'আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মার্কিনদের দালাল, দেশী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী। অর্থনীতিতে এদের দৃঢ় ভিত্তি নেই। এরা টি'কে আছে মার্কিনদের দয়ায়।

'আমাদের দেশে জমিদাররা প্রায় কেউই খুব বড় নয়। বেশির ভাগই ছোট ছোট জমিদার। দেশে জমি প্রচুর অথচ লোক কম। সাম নেউয়া এলাকায় সমস্তই এজমালি জমি। কিন্তু দেশের সেরা জমিগুলো জমিদারদের হাতে। চাষীরা ফসল ফলালে জমিদাররা তা থেকে মোটা অংশ

হাতিয়ে নেয়। জমি বেশি বলে জমিদারদের বাড়তি জমির দরকার হয় না। তারা চায় চাষ করার জন্যে লোক। ছোট জমিদাররা তাদের দরকারের সব কিছুই চাষীদের ঘাড় ভেঙে আদায় করে। বিপ্লবের পর আমরা পুরনো ব্যবস্থা পাল্টে দিই।

'আমাদের প্রধান শত্রু আগে ছিল ফরাসী আর এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের প্রধান কাজ হলো দেশের সমস্ত শ্রেণী আর স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করা।

'আমরা জয়ী হচ্ছি পার্টি আর ফ্রন্টের নির্ভুল নীতির জন্যে।

'আমাদের বারো-দফা কর্মসূচীতে রাজাকে স্বীকার করার কথা আছে। আমাদের মুক্তাঞ্চলে আছেন দুজন প্রিন্স। একজন হলেন চাও সুভোংসাক আর অন্যজন হলে সুভোনুভোম। চাও মানে ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স। রাজ-পরিবারের সঙ্গে এঁদের ভালো সম্পর্ক। আমাদের ফ্রন্টের সভাপতি প্রিন্স সুভোনুভোম আর তিন জন সভাপতি: লাও লুম জনগোষ্ঠীর কায়সন ফমবিহম, লাও থং জনগোষ্ঠীর সিথন কমাডাম আর লাও সুং জনগোষ্ঠীর ফে ডাং।'

বেলা তিনটেয় মেডিকেল দপ্তরের উপমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উত্তর ভিয়েতনামে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন।

এই বিবরণ পড়তে কেমন লাগবে আমি জানি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতন। অনাড়ম্বর ঘরের মধ্যে মিতভাষী এক নেতার মৃদু কণ্ঠে আমাদের চোখে ভেসে উঠেছিল এক মুক্তিকামী জাতির আশ্চর্য জাগরণের রোমাঞ্চকর ছবি।

তিনি বলছিলেন:

'ফরাসী আমলে রোগ শোক ছিল দেশ জুড়ে। বছর বছর মহামারীর আকারে দেখা দিত বসন্ত আর কলেরা। আর সেই সঙ্গে আমাশা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, চোখের রোগ। সিফিলিস, গনোরিয়ার ছিল ব্যাপক প্রকোপ। মৃত্যুহার ছিল হাজার করা ছাব্বিশ। শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে তিন চার শো।

'সারা দেশে হাসপাতাল ছিল মোট সাতচল্লিশটি এবং মাতৃসদন মাত্র ন'টি। তাও সবই প্রায় শুধুই শহরে। এক লক্ষ আশি হাজার লোক পিছু ছিল

মাত্র একজন ডাক্তার। গ্রামের লোকে ডাক্তার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত।

'ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কুড়িদিন যেতে না যেতেই এল ফরাসি আক্রমণ। তারপর সারা দেশ জুড়ে জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন। ন বছরের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা সমানে চেষ্টা করেছি চিকিৎসাব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি ঘটাতে। চুয়ান্ন সালের শেষে উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ যখন মিটল, তখন সদ্যমুক্ত এলাকাগুলোর ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষদের নিয়ে আমরা খুব সমস্যায় পড়লাম। হাসপাতালগুলোতে এসে তারা ভিড় করতে লাগল। বিপ্লবের পর আমাদের তখন বেডের সংখ্যা মাত্র চার হাজার, ডাক্তার শতখানেকও নয়, সরকারি চিকিৎসক শ' দুই এবং নার্স হাজারখানেক। এখন আমাদের যে কোনো বড় প্রদেশে এর চেয়ে বেশি ডাক্তার, নার্স আর বেড।

'সেই সময় পার্টি থেকে কয়েকটি নির্দেশ জারি করা হলো। সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামী চিকিৎসাব্যবস্থার কাজ খেটে-খাওয়া মানুষ, জননী আর শিশু-সন্তানদের সেবা করা। রোগ নিবারণ হবে প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে চাই অসুখের চিকিৎসা আর ব্যাপকভাবে ঔষধালয়। খণ্ডিতভাবে রোগের চিকিৎসা নয়, পূর্ণাঙ্গভাবে রোগীর যত্ন নিতে হবে, লৌকিক প্রথাসিদ্ধ দ্রব্যগুণ আর ভেষজবিদ্যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে সম্বন্ধে গবেষণা করতে হবে। জনশক্তির ওপর নির্ভর করে এবং তার আঁতে আর স্বার্থে ঘা না দিয়ে এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেলে নেব। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম আর মিতব্যয়ের জোরে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াব।

'ফরাসি দখলদার সৈন্যরা যখন এদেশ ছেড়ে চলে গেল তখন বড় বড় শহরগুলোর সে যে কী অবস্থা তা ধারণা করতে পারবেন না। চারিদিকে শুধু স্তূপীকৃত জঞ্জাল আর খাটা পায়খানার দুর্গন্ধ। সৈন্যদের কাছ থেকে ছড়ানো যৌনরোগ। রাস্তায় রাস্তায় ছড়ানো কুষ্ঠরোগ।

'গ্রামের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। পাতা-পচা ডোবার জল। তারই মধ্যে মোষ গা ডোবাচ্ছে, ছেলেবুড়ো সবাই স্নান করছে, কাপড় কাচা আর চাল তরকারি ধোয়া হচ্ছে। বহুক্ষেত্রে ডোবা-পুকুরের ঐ দূষিত জলই লোকে খেত। এঁদো স্যাঁৎসেঁতে ঘর। মশা, মাছি, ছারপোকা, ডাঁশ। চোরের ভয়ে মোষ আর মানুষ রাত্রে এক ঘরে শুত। মশারি ছিল না। কেউই জল

ফুটিয়ে খেত না। লোকে খেত কাঁচা আনাজ, কাঁচা পচা মাংস, শুয়োরের মাংস, কাঁচা মাছ। খেতে বসত মাটিতে। তোয়ালে, সাবান, টুথব্রাশের বালাই ছিল না।

'গত দশ বছরের চেষ্টায় গ্রামের চেহারা বিলকুল বদলে গেছে। উত্তর ভিয়েতনামের গ্রাম বলতে এখন আর আদ্যিকালের বাঁশবনে ঢাকা কূপমণ্ডুক গ্রাম নয়। এখন সেখানে দু-পাশে সারিবদ্ধ রকমারি গাছ-লাগানো রাস্তা-ঘাট আর খালনালার ছড়াছড়ি। এখন বেশির ভাগই খোলামেলা ইঁটের ঘরবাড়ি। গ্রামের লোকে মশারি খাটিয়ে শোয়। প্রত্যেকের আলাদা তোয়ালে, টুথব্রাশ আর মাজন। জল ফুটিয়ে খাওয়া এখন প্রায় সকলের অভ্যেস হয়ে গেছে। বাগানের প্রান্তে সাদা দেয়ালে ঘেরা উঁচু সেপ্টিক পায়খানা। বালি দিয়ে জল পরিস্রুত করা বাঁকওয়ালা ইঁদারা। সাধারণের স্নানঘর।

'প্রতি গ্রামে ক্লিনিক আর মাতৃসদন। ক্লিনিকের কাজ লোকজনদের স্বাস্থ্যবিধি পালন করানো, মহামারী ঠেকানো আর রোগের চিকিৎসা করা। মাতৃসদন মেয়েদের স্বাস্থ্যপালন, সন্তানসম্ভবাদের পরিদর্শন আর শিশুপালনের ভার নেয়। মাধ্যমিক বৃত্তি বিদ্যালয়ে পাশকরা সহকারী ডাক্তার আছে প্রত্যেক ক্লিনিকে। সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা অনুপাতে আছে উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষিত ধাত্রী আর নার্স। তারা সবাই কৃষকের ঘরের ছেলেমেয়ে। গ্রামে থেকেই তারা স্থানীয় লোকের সেবা করে। এই কাজে মেডিকেল কাউন্সিলের কাছ থেকে তারা সমানে সাহায্য পায়। ওষুধের জন্যে গ্রামের বাইরে ছুটতে হয় না। গ্রামের মধ্যেই ওষুধের দোকান আছে। ফলে এই গ্রাম্য ক্লিনিকগুলো মানুষের জীবনে বড় রকমের আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিমান আক্রমণ হলে লোকে সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট-এড পায়। প্রতি গ্রামে গড়ে তিন হাজার লোকের বাস। কম ওষুধ নিয়েও আমরা গ্রামবাসীদের জন্যে ঢের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

'প্রতি জেলায় গড়ে দু লক্ষ লোকের বাস। জেলা হাসপাতালগুলোতে পঞ্চাশ থেকে একশো বেড আছে। গ্রাম্য ক্লিনিক থেকে দরকারমতো রোগীদের জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। শতকরা চল্লিশটি থাকে অপারেশনের কেস। জেলা হাসপাতালে মহামারী প্রতিবিধান আর স্বাস্থ্যপালন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে আছে প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসা এবং

নানারকম ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা। জেলা সদরে ওষুধের দোকান আছে। প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে থাকে এক থেকে তিন জন করে এম্‌-বি পাশকরা ডাক্তার।

'প্রত্যেক প্রাদেশিক হাসপাতাল দশ থেকে বিশ লক্ষ লোকের দেখাশুনো করে। পলিক্লিনিক ছাড়াও প্রাদেশিক হাসপাতালের নানা বিভাগ আছে। বেড সংখ্যা তিনশো থেকে পাঁচশো। যাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার তাদের ভর্তি করে নেওয়া হয়। খুব কঠিন রোগ হলে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যবিধি পালন, মহামারী প্রতিবিধান, যক্ষ্মানিরোধ—এ সবের জন্যে স্বতন্ত্র দপ্তর আছে। প্রত্যেক প্রদেশে সংক্রামক রোগীদের জন্য আছে ত্রিশ বেডের আলাদা ওয়ার্ড। প্রসূতি আর শিশুদের জন্যে আলাদা হাসপাতাল। চর্মরোগ আর যৌনরোগের জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। যেখানে যৌনরোগ কম, সেখানে বিশেষভাবে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা হয়। প্রত্যেক প্রদেশে ওষুধের বড় দোকান আর সেইসঙ্গে ওষুধ তৈরির কারখানা আছে।

'হানয় শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে চিকিৎসার সব রকম সর্বাধুনিক ব্যবস্থা আছে। গুরুতর আর দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্যে গ্রাম, জেলা আর প্রদেশ থেকে সেখানে রোগীদের পাঠানো হয়।

'আমরা বিশেষ নজর দিই যাতে কিছুতেই বড় আকারের মহামারী দেশের কোথাও দেখা না দেয়। তার ফলে, পনেরো ষোল বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তাদের মধ্যে এমন একজনকেও আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মুখে কিংবা গায়ে বসন্তের দাগ আছে। কলেরাও প্রায় হয় না বললেই হয়। গত বছর অবশ্য কোনো কোনো এলাকায় কলেরা রোগ দেখা দিয়েছিল। মুশকিল হয়, রোগগুলো যখন বাইরে থেকে আসে। বিশেষ করে আসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংলগ্ন শত্রুঅধিকৃত এলাকাগুলো থেকে।

'প্লেগ আটকানো গেছে। টিকে দেওয়ার ফলে পোলিও রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এখন নামমাত্রে এসে ঠেকেছে। উনসত্তর সালের হিসেবে দেখা গেছে যে, পোলিও হয়েছে লক্ষে ০˙০৭ জনের, টাইফয়েড লক্ষে ১˙১২ জনের, ডিপথিরিয়া ০˙৬৯ জনের। ভ্যাকসিন এখন আমরা এদেশেই তৈরি করছি। এসব রোগ আর একেবারেই থাকবে না যখন আমরা দেশের সবাইকে সমানভাবে শিক্ষিত করতে পারব। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দিকাশি, হাম—এসব রোগের প্রতিরোধ এখনও ভালভাবে করা যায়নি।

'ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক টিকে এবং ভ্যাকসিন দেওয়া ছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যাপারে জনচেতনা বেড়ে যাওয়ার ফলেই উত্তর ভিয়েতনামে এখন রোগব্যাধি অনেক কমে এসেছে।

'মাঠেঘাটে খোলা জায়গায় প্রাতঃকৃত্য করা—কৃষিপ্রধান দেশের একটা বড় সমস্যা। তার ফলে সহজেই রোগজীবাণু ছড়ায়। উত্তর ভিয়েতনামে তাই গ্রামে গ্রামে ব্যাপকভাবে নতুন ধাঁচের পায়খানা তৈরি করা হয়েছে। এই পায়খানা উঁচু করে তৈরি করা হয়। নিচে থাকে পাশাপাশি দুটি চৌবাচ্চা। তার ঠিক ওপরে থাকে ডাণ্ডা-লাগানো চাকতি দিয়ে বন্ধ করা দুটি ফুটো আর তার সংলগ্ন মূত্র নিকাশের নালী। নালীটি পেছনে নিচের তৃতীয় একটি চৌবাচ্চার সঙ্গে যুক্ত। ওপরে এককোণে আরেকটি ছোট্ট চৌবাচ্চায় জমানো থাকে উনুনের ছাইপাঁশ। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর ফুটোর ভেতর দিয়ে খানিকটা করে ছাই ফেলে তারপর চাকতি দিয়ে ফুটোটা ঢাকতে হবে। তাতে দুর্গন্ধ রোধ করা যাবে। প্রথমটি ভরে গেলে তার মধ্যে চুন আর গাছের পাতা দিয়ে চৌবাচ্চাটি তিন মাসের জন্যে বন্ধ করে রেখে দ্বিতীয় চৌবাচ্চাটি ব্যবহার করতে হবে। তিন মাস পর চৌবাচ্চার দরজা খুলে দেখা যাবে গোটা জিনিসটা সারে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তৃতীয় চৌবাচ্চায় সংগৃহীত প্রস্রাব অ্যামোনিয়া হিসেবে প্রতিদিন বাগানের গাছগাছালির গোড়ায় দেওয়া হবে।'

এরপর সহকারী মন্ত্রীমশাই একটা কাণ্ড করে বসলেন। আমাদের হাত পাততে বলে হাতের মধ্যে কালচে একটা বস্তু দিয়ে বললেন—'দেখুন তো কোনো গন্ধ পান কি না?'

যাকে সার বলে অবিকল তাই। নাকের কাছে ধরে দেখলাম মানুষের মলের একটুও গন্ধ নেই।

বললেন, 'চাষের জন্যে আমাদের যে সার দরকার, তার একটা মোটা অংশ আমরা পাচ্ছি এই উপায়ে। তাছাড়া সরকার ভালো দরে এই সার কেনে। ফলে, গ্রামে গ্রামে লোকে আগ্রহ করে এখন এই ধরনের পায়খানা বানাচ্ছে।

'দ্বিতীয় হলো স্নানের জল আর রান্নার জল। গ্রামে প্রতি দু তিনটি পরিবার পিছু আছে একটি করে কুয়ো। পাহাড় এলাকায় লোকে ঝর্ণা আর বৃষ্টির জল ধরে। সমতলের গ্রামে গ্রামে এখন বাঁধানো ইঁদারার ব্যবস্থা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় নিচু ইঁদারা খুঁড়ে সংলগ্ন এলাকার বিলের জল বালি ভর্তি গর্তের ভেতর দিয়ে পরিস্রুত করে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

'সামাজিক রোগব্যাধি—অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, চর্মরোগ, যৌনব্যাধি—এসব ঠেকানো গেছে। উত্তর ভিয়েতনামে গনোরিয়া বা সিফিলিস এত কম যে তরুণ ডাক্তারদের এখন ছবি দেখিয়ে এই রোগের কথা বোঝাতে হয়। তার কারণ, বেশ্যাবৃত্তি আর নাইটক্লাব না থাকায় এ রোগ ছড়াতে পারে না।

'উত্তর ভিয়েতনাম হলো সমাজতন্ত্রের পথের পথিক গরিব দেশ। আমাদের পক্ষে তাই দেশের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। যাতে কম খরচে ঢের বেশি লোকের চিকিৎসা করা যায়, তার জন্যে আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে মেলানো হয় দেশীমতে চিকিৎসার পদ্ধতি। যক্ষ্মার চিকিৎসায় এইভাবে আমরা খরচ ছ গুণ কমিয়েছি কিন্তু ফল পাওয়া গেছে প্রায় সমান। যক্ষ্মা প্রতিষেধক টিকে দেওয়া হয় সরকারি খরচে। চিকিৎসার প্রায় সব খরচই যোগায় যার যার ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায়। একষট্টি সাল থেকে যক্ষ্মা-বিরোধী অভিযান চালানোর ফলে পঁয়ষট্টি সালের মধ্যে রোগীর সংখ্যা ১'০৪ শতাংশ থেকে কমে ০'৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। এখন এই সংখ্যা আরও কম।

'ম্যালেরিয়ার সব চেয়ে বেশি প্রকোপ ছিল পাহাড় আর বন এলাকায়। আটান্ন সালে শুরু হয় ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। সাত-আট বছরের চেষ্টায় ম্যালেরিয়াকে প্রায় দেশছাড়া করা গেছে। কীটনাশক ব্যবহার করা ছাড়াও ডোবাপুকুরে মাছের চাষ করার ফলে মশার ডিমগুলো মাছেরা খেয়ে নেয়। বাড়ির চারপাশে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়। গোয়ালঘর আর শুয়োর রাখার জায়গা বসতবাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে করা হয়। সেই সঙ্গে ঘরে ঘরে নেটের মশারি। ম্যালেরিয়ানিরোধক ওষুধপত্র আর কীটনাশক লোকে বিনামূল্যে পায়।

'এদেশে আগে ব্যাপকভাবে দেখা দিত চোখ-ফোলা অসুখ ট্র্যাকোমা। বিশেষ করে সমতলের শতকরা আশি-নব্বই জন এই রোগে ভুগত। তার মধ্যে এই অসুখে শতকরা এক থেকে চার জন অন্ধ হয়ে যেত। পনেরো বছরের একটানা অভিযানের ফলে ট্র্যাকোমা রোগের হার এখন অর্ধেক।

'উত্তর ভিয়েতনামে হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা মোট বারো হাজার। তার মধ্যে দু হাজার সংক্রামক। দেশের পক্ষে এ এক মহা সমস্যা ছিল। নে আন প্রদেশের কুইন লাপ জেলায় আমরা তিন হাজার

বেডের একটা বড় হাসপাতাল করেছি। পঁয়ষট্টি সালে মার্কিন বোমায় এই হাসপাতাল মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তবু আমাদের কাজ বন্ধ হয়নি। এই দশ বছরে বিভিন্ন হাসপাতালে ছ হাজার রোগীকে সারিয়েছি। যাদের কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক নয়, তাদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে।

'উত্তর ভিয়েতনামের সব গ্রামেই মাতৃসদন আছে। শতকরা আশি জন সন্তানসম্ভবা মাতৃসদনে প্রসবের জন্যে আসে। কোথাও কোথাও শতকরা নব্বই জন। ফলে প্রসূতির মৃত্যুহার ক্রমশ কমছে। ফরাসি আমলে ছিল হাজারকরা কুড়ি; আটষট্টি সালে তা কমে হয়েছে হাজারকরা •'৮। ফরাসি আমলে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে তিন-চার শো; এখন হাজারে বত্রিশ। বয়স্কদের মৃত্যুহার এখন হাজারে সাত-আট এবং জন্মহার হাজারে ত্রিশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার কমানোর জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে এখন নজর দেওয়া হচ্ছে।

'নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও আমরা নিজেরা নিজেদের ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছি। যুদ্ধের সময় আমরা বাইরের সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের ভেষজ শিল্প তৈরি করার দিকে আমরা নজর দিয়েছি। কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের এখন তিনটি ওষুধ তৈরির কারখানা আছে। তাছাড়া প্রদেশে প্রদেশে আছে দেশীয় ভেষজ তৈরির ছোট ছোট কারখানা। সব কারখানাই রাষ্ট্রের। তাই তার উদ্দেশ্য লাভ করা নয়—লোকের ভালো করা। রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী যতটুকু দরকার শুধু সেই পরিমাণ ওষুধই বাইরে থেকে আমদানি করা হয়। সুতরাং বাজার নিয়ে আমাদের দেশে ওষুধের কারবারীদের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। আমাদের ভেষজ শিল্প এখনও খুব বিকশিত হয়নি। গাছগাছড়া সংগ্রহ করে অভাবপূরণের চেষ্টা হচ্ছে সেই সঙ্গে রাসায়নিক ওষুধ তৈরিরও চেষ্টা চলছে।

অগস্ট বিপ্লবের আগে সারা ভিয়েতনামে ডাক্তারের মোট সংখ্যা ছিল একান্ন। তাও অধিকাংশই ছিল ফরাসি ডাক্তার। সহকারী চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল একশো বাহান্ন। পঞ্চাশ জন ছিল ফার্মাসিস্ট, বারো শো নার্স আর দু শো জন ধাত্রী। কাজেই বিপ্লবের পর চিকিৎসাকর্মী গড়ে তোলার জন্যে বিশেষ জোর দেওয়া হলো। কর্মী শিক্ষণের জন্যে উত্তর ভিয়েতনামে এখন রয়েছে তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। তার একটি তৈরি হয়েছে পঞ্চাশ

সাল নাগাদ। অন্য দুটির পত্তন হয়েছে সাতষট্টি সালে। তাছাড়া ফার্মাসিস্টদের জন্যে আছে আরেকটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়।

'আর প্রত্যেকটি প্রদেশে আছে একটি করে বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক মেডিকেল স্কুল। এখানে সহকারী ডাক্তার, নার্স, ধাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তার ফলে, ষাট সাল থেকে উনসত্তর সালের মধ্যে ডাক্তার আট গুণ, সরকারী ডাক্তার চার গুণ, ফার্মাসিস্ট চার গুণ বেড়েছে। এখন প্রত্যেক গ্রামে একজন করে সহকারী ডাক্তার আছে। আটষট্টি সালের শেষাশেষি, ডাক্তার আর সহকারী ডাক্তার মিলিয়ে চিকিৎসকের হার দাঁড়ায় প্রতি দশ হাজারে ৭·৬ জন। এই মেডিকেল কর্মীদের শতকরা নব্বই জনের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম এবং শতকরা নব্বই জনের অভিজ্ঞতা এক থেকে দশ বছরের। ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা কুড়িজন এবং ফার্মাসিস্টদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ জন মেয়ে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা আগামী কয়েক বছরে পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ হবে।

'চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে দশটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিকেল প্রতিষ্ঠানেও গবেষণা হয়ে থাকে। মূল সমস্যা সমাধানে আমরা হাত দিয়েছি। এটি তার প্রথম পদক্ষেপ।

'চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো হয় একমাত্র ভিয়েতনামী ভাষায়। পরিভাষা সংগ্রহের কাজ আমরা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। বিপ্লবের পর থেকেই এ কাজে আমরা হাত দিই। তাছাড়া বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা ছাত্রদের উৎসাহ দিয়ে থাকি। এম-বি পাশ করার পর প্রত্যেককে একটি করে বিদেশী ভাষা শিখতে হয়—রুশ, ইংরেজি, ফরাসি বা চীনা। বৈজ্ঞানিক গবেষকদের শিখতে হয় অন্তত দুটি করে বিদেশী ভাষা। কাজটা খুব শক্ত। কেননা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এসব ভাষার দরকার হয় না। গবেষণার সমস্ত কাজ ভিয়েতনামী ভাষাতেই হয়ে থাকে। বিদেশে ছাত্ররা যায়, তবে তার সংখ্যা বেশি নয়। শুধু কিছু কিছু পাশ-করা বা কর্মী গবেষককেই বিদেশে পাঠানো হয়।'

মন্ত্রীমশাই আমাদের কয়েকটা পাঠ্যবই আর পরিভাষাকোষ দেখালেন। বইগুলোতে দরকার মতো ভিয়েতনামি শব্দের পাশে আন্তর্জাতিক পরিভাষাগুলো দেওয়া আছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি পরিভাষাকোষে পাশাপাশি

ইংরেজি, ফরাসি আর ভিয়েতনামি শব্দ এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে ছাত্রদের পক্ষে শব্দগুলো চেনা হয়ে যায়।

তারপর বললেন, 'আমাদের দেশে আপিসের কর্মী আর কারখানার মজুররা বিনামূল্যে চিকিৎসার স্থবিধে পান। রোগীরা হাসপাতালে পথ্য আর ওষুধের জন্যে আংশিকভাবে সামান্য খরচ দেন। সকলেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিনামূল্যে হয়। ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রপশন নিয়ে তারা ওষুধপত্র কেনে। সরকারের লক্ষ্য হলো ক্রমশ প্রত্যেকের সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ওষুধের দিক থেকে আমাদের দেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে চাহিদা এখন অনেকাংশে মিটছে।

'সাবেকী ওষুধপত্র নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে। বিশেষ করে নানা রকমের গাছ-গাছড়া আর প্রাণিদেহের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে কিভাবে দেশীয় প্রথায় রোগ সারানো যায়। দেশী ভেসজ নিয়ে গবেষণা করার একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। আমাদের দেশের চিকিৎসকদের পক্ষে রোগ সারাবার আধুনিক আর পুরনো দু রকম পদ্ধতিই জানতে হয়।

'আমাদের দেশে তুলনায় দেশী ওষুধের দাম অনেক কম। আমাশা সারাবার বিদেশী এমিটিনের দাম যেখানে সাত ডং, সেখানে দেশী ভেসজের দাম মাত্র কুড়ি স্থ কিংবা খুব বেশি হলে পঞ্চাশ সু (এক শো সু-তে এক ডং)। পেনিলিসিন, ভিটামিন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। মাল্টিভিটামিনের একশো বড়ির দাম দু ডং। হাসপাতালে অপারেশনের কোনো খরচ নেই।'

হানয়ে থাকতে কিছু কিছু ডকুমেণ্টারি ছবিতে দেখেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের ভেতর কেরোসিনের আলোয় অস্ত্রোপচারের ছবি। যন্ত্রপাতিগুলো কোনোটা বাঁশের, কোনোটা ভাঙা রেল লাইনের ইস্পাত থেকে তৈরি করে নেওয়া। যাকে আমরা টোটকা, হেকিমি, কবরেজি বলে তুচ্ছ জ্ঞান করি, ভিয়েতনামের মানুষ সেই হাজার হাজার বছরের প্রথাগত দেশী চিকিৎসা বিদ্যাকেও বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করে আধুনিক ভেষজের পাশে সসম্মানে স্থান দিয়েছে।

অগস্ট বিপ্লব আর সমাজতন্ত্রের ভেতর দিয়ে ভিয়েতনামের মানুষ শুধু ভবিষ্যতের নয়, নিজেদের গৌরবময় অতীতেরও সন্ধান পেয়েছে।

২৩

১০ এপ্রিল সকালে উঠে আমার ডায়রিতে লিখেছিলাম :

'আর এক সপ্তাহ আছে। তিন সপ্তাহে যা দেখেছি আর শুনেছি, তার তুলনা নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সারা দুনিয়ার চেহারা বদলে দেবে। কিন্তু সারাক্ষণ মনের মধ্যে খচ খচ করছে—ভারতবর্ষের কী হবে? পার্টিকে টুকরো টুকরো করে নতুন সমাজ আনা যাবে না। যদি বিপ্লব আনতে হয়, তাহলে সমস্ত কমিউনিস্টকেই শুধু নয়, সব ভালো লোককে লাল ঝাণ্ডার নিচে মেলাতে হবে।

'কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো, তারা হানয়-সায়গনে আসা-যাওয়া করে। বলছিল দুটো দু শহর। একটা শহরে শান্তি আর স্থৈর্য। অন্য শহরে অস্থিরতা আর গোলমাল। এক শহরে মোটর বাইক। এক জায়গায় জীবনের ধ্রুব আদর্শ, অন্য জায়গায় শুধু আত্মসুখ আর আদর্শহীনতা। সবাই একবাক্যে জানাল যে হানয়ের তুলনা হয় না। মার্কিন সৈন্যরা সপ্তাহে সায়গনে ফুর্তি করতে আসে। হোটেলে মেয়ে আনে। তারা কোনো রকমে দিন গুজরান করে দেশে পালাতে চায়। তারা লড়ছে স্বেচ্ছায় নয়। জোর করে তাদের ধরে এনে লড়ানো হচ্ছে। টাকা পাচ্ছে প্রচুর। কিন্তু ফিরে গিয়ে? বেকার শুধু নয়, নিরপরাধ মানুষ মারার গ্লানি।

'মনটা পড়ে রয়েছে দেশের মাটিতে। বিশেষ করে পূর্ববাঙলার ঘটনার জন্যে। অন্য দেশে গেলে যে ভাবেই হোক পত্রপাঠ ফিরে যেতাম। কিন্তু ভারি দোটানায় পড়েছি! এখানে অনেক কিছু শেখবার আছে। সংগ্রামের শুধু প্রেরণা নয়, সংগঠনেরও পথ পাওয়া যায়।

'যারা বাইরে থেকে আসে তাদের সকলের মুখেই এক কথা—এরা অসাধারণ কর্মঠ। রাত্রেও কাজের কামাই নেই।

'হানয়ে যত রাতই হোক, এমন কি মেয়েরাও একা একা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে যেতে পারে। চোর-বদমায়েশ নেই। অথচ এমন নয় যে, রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ আছে। বরং পুলিশ খুব কমই দেখা যাবে। যাও বা আছে,

দেখে ভয় পাবার মতো নয়। এখন পর্যন্ত পুলিস দেখে ভয় পেতে কাউকে দেখিনি। পুলিসের পোশাকগুলোও একেবারে ভীতিপ্রদ নয়। হাতে ছড়িলাঠি নেই।'

ভিয়েতনামে মার্কিন নৃশংসতা সংক্রান্ত যে তদন্ত কমিটি আছে, সেই কমিটির দপ্তরে কর্নেল হা ভান লাউয়ের সঙ্গে আমাদের একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

কর্নেল লাউ আমাদের যা বললেন, সংক্ষেপে তা এই—

ফরাসিরা থাকতে এদেশে তাদের যে সামরিক শক্তি ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি শক্তি নিয়োগ করেছে মার্কিনরা। মার্কিনদের পদাতিক বাহিনী ফরাসিদের দ্বিগুণ। বিমানশক্তিতে তাদের সঙ্গে ফরাসিদের কোনো তুলনাই হয় না। তার ওপর সমুদ্রে মোতায়েন তাদের সপ্তম নৌবহর এবং সেই সঙ্গে অংশত ষষ্ঠ ফ্লীট। কোরিয়ার যুদ্ধের চেয়েও তারা ঢের বহুগুণ বেশি টন বোমা ফেলেছে ভিয়েতনামে। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, গত দশ বছরে তারা এক কোটি টনেরও বেশি বোমা ফেলেছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা ইওরোপে বোমা পড়েছিল কুড়ি লক্ষ টন।

ভিয়েতনামে মার্কিন নিষ্ঠুরতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। দফায় দফায় তারা চেয়েছে যুদ্ধের এলাকা ছড়িয়ে দিতে। সামরিক জয়ের ভেতর দিয়ে তারা চেয়েছে শান্তি আলোচনায় নিজের কোলে ঝোল টানতে। রাজনৈতিক আর নৈতিক দিক থেকে বার বার হেরে গিয়েও গোঁয়ারের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানকে তারা লাগাচ্ছে মানুষ মারার কাজে। বিজ্ঞান আর কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে কেবলি শান দিয়ে চলেছে মারণাস্ত্রে।

ভিয়েতনামকে নতুন ধরনের উপনিবেশ বানাবার জন্যেই তারা লড়ছে। তারা শুধু সামরিক শক্তিকে আঘাত করছে না, দেশের তামাম মানুষকে ধ্বংস করতে চাইছে। তার ফলে, গোটা জাত, দেশের সমস্ত মানুষ এক হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সৈন্যরা ভিয়েতনামীদের যেন মানুষ বলেই মনে করে না। আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে তারা মারছে। গণহত্যায় এ যুদ্ধে তারা মত্ত।

মার্কিনরা ভিয়েতনামকে করেছে তাদের অস্ত্র এবং সামরিক রণনীতি আর রণকৌশলের পরীক্ষাক্ষেত্র। তাদের 'বিশেষ যুদ্ধ' নীতি পরাস্ত হলে তারা ধরেছে 'স্থানিক যুদ্ধ' নীতি। কখনও আইজেনহাওয়ারের এক নীতি, কখনও

কেনেডির এক নীতি। দক্ষিণ ভিয়েতনাম হয়েছে তাদের জেট প্লেন, মাইন, বিষাক্ত রাসায়নিকের পরীক্ষাক্ষেত্র। গেরিলা বাহিনী দমন করতে তারা পাঠিয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে হেলিকপ্টার। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে মানুষদের তারা খোঁয়াড়ের ভেতর একত্র করেছে।

এদেশের মাটি আর মানুষ হয়েছে তাদের অস্ত্র আর রণনীতিকৌশলের পরীক্ষাক্ষেত্র।

কর্নেল লাউ বললেন, 'শুধু আমরা নই, পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকেরা এবং মার্কিন হোমড়া-চোমড়াদেরও কেউ কেউ এর নিন্দে করেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধফেরত মার্কিন সৈন্যেরা পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

'উত্তর ভিয়েতনামে তাদের এই ধ্বংসের পালা শুরু হয় পঁয়ষট্টির ফেব্রুয়ারি থেকে। তারা চেয়েছিল আমাদের সামরিক প্রতিরক্ষা আর অর্থনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করতে। যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমাদের সাহায্য পাঠানো বন্ধ হয় এবং যাতে তারা আমাদের মার দিয়ে দক্ষিণে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমানবহর পাঠিয়েছে উত্তর ভিয়েতনামের ক্ষেত-খামার, কলকারখানা, সমবায়, শিল্প, বন, ব্রিজ, রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা —এক কথায়, আমাদের সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে। লোকবল ধ্বংস করার জন্যে ঘনবসতিপূর্ণ ছোট বড় জায়গাগুলোতে তারা নির্বিচারে বোমা ফেলেছে। গির্জা, প্যাগোডা, ইস্কুল, হাসপাতাল, লোকালয়—কিছুই তারা বাদ দেয়নি। এসব তারা প্ল্যান করে করেছে। নিজেদের রাজনীতি হাসিল করার জন্যে তারা আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ঠিক করেছে।'

উত্তর ভিয়েতনামের ছটি শহরে হামলা করে থাই নুয়েন, ভিয়েত চি আর ভিন্—এই শহর তিনটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। নাম দিন্ শহরের ষাট শতাংশ বাড়ি ধ্বংস করেছে। হাই ফং বন্দরের লোকালয়ে বার বার বোমা আর গোলা ছুঁড়েছে। হানয়ের কেন্দ্রস্থলে সুবিধে করতে না পেরে উপকণ্ঠে বোমা ফেলেছে। তিরিশটি টাউনশিপের মধ্যে তেইশটি বোমাবিধ্বস্ত এবং তার মধ্যে নটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। শতকরা পঞ্চাশটি জেলা সদর, শত শত শিল্প এলাকা, প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র, হাই ফঙের সিমেন্ট কারখানা, থাই নুয়েনের লোহা ইস্পাত কমপ্লেক্স, নাম দিনের কাপড় কল, ভিয়েত চি-র হাল্কা শিল্প, এক হাজার সেতু, সাড়ে ছশোর ওপর বাঁধ, দেড় হাজারের ওপর

জলাধার বিধ্বস্ত হয়েছে। বন্যার ঠিক আগে বাঁধগুলো তারা ইচ্ছে করে নষ্ট করেছে। গরমের সময় তারা আক্রমণ করেছে সেচব্যবস্থায় আর জলাধারে।

কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানুষকে তারা অনাহারে মারতে চেয়েছে। গরুমোষের পালের ওপর তারা বোমা ফেলেছে। উত্তর ভিয়েতনামের আটষট্টিটি সরকারি খামারের মধ্যে ছেষট্টিটি খামারেই তারা বোমা ফেলেছে। কোনো কোনো সরকারি খামারে—যেমন, কোয়াং বিন, ভিন্ লিন্ আর স্বুয়ান মাইতে—হাজার হাজার বোমা ফেলে।

তারা কারখানায় বোমা ফেলেছে শিফ্ট্ বদল হওয়ার মুখে—ঠিক যে সময়টাতে সবচেয়ে বেশি লোক থাকে।

বাঁধ আর রাস্তা সারাবার সময় মার্কিন এরোপ্লেন এসে নাপাম বোমা আর স্টীল পেলেট বোমা ফেলেছে।

তারা বোমা ফেলেছে এক শো হাসপাতালে আর পাঁচ শো আরোগ্য সদনে। যাতে লোকে বিনা চিকিৎসায় মরে এবং যাতে মহামারী আর সংক্রামক রোগ ছড়ায়। থান হুয়াতে মার্কিনরা বোমা মেরে টি বি হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম কুষ্ঠ হাসপাতাল ছিল কুইং লাপে। দু হাজার বেডের এই হাসপাতালে কুষ্ঠ রোগ সারানো নিয়ে গবেষণা হত। প্রথমবারের হামলার পর সরকার থেকে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও মার্কিনরা এই হাসপাতালের ওপর উনচল্লিশ বার আক্রমণ চালায়। তিন শো-র বেশি রোগী আর চিকিৎসক হতাহত হয়।

বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছে দেড় হাজারের বেশি বিদ্যায়তন। ছাত্রদের ভিড় যখন সবচেয়ে বেশি, তখনই তারা বোমা ফেলেছে। গায়ে স্টীল পেলেট বিঁধে শত শত ছাত্রছাত্রী মারা গেছে। পৌনে পাঁচ শো বিধ্বস্ত গির্জায়, প্রায় সাড়ে চার শো বিধ্বস্ত প্যাগোডায় শত শত ধর্মযাজক পুরোহিত আর ধর্মপ্রাণ মানুষ মারা গেছে।

মার্কিনরা লোক মারার জন্যে ধাপে ধাপে মারণাস্ত্রের উন্নতি ঘটিয়েছে। স্টীল পেলেট বোমা এর আগে আর কোনো যুদ্ধে ব্যবহার হয়নি। এই বোমায় ৫'৫৬ মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত ইস্পাতের অসংখ্য ছররা থাকে। তার ফলে, একসঙ্গে এত বেশি শরীরে ঢুকে যায় যে বার করা সম্ভব হয় না।

সেই সঙ্গে আছে নাপাম আর ফসফরাস বোমা। গোড়ায় গোড়ায় এই সব বোমা আট শো থেকে এক হাজার সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি তাপ দিয়ে ঝলসে দিত। এখন তারা ছাড়ছে নাপাম 'বি' টারমাইট, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম বোমা। তাতে হয় তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি তাপ। কারো গায়ে যদি সাদা ফসফরাস বোমার ছিটে লাগে, তাহলে তার জ্বলুনি কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। একটানা এক সপ্তাহ ধরে ভেতরে পুড়তে থাকে।

উত্তর ভিয়েতনামে যখন এই, তখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনদের নৃশংসতা যে কী সাংঘাতিক ধরনের হবে তা আঁচ করতে কষ্ট হয় না।

মুক্তাঞ্চলে এমনভাবে তারা বোমা ফেলে যাতে কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকার জায়গা না পায়। চাষের ক্ষেতে, বাতাসে, জলে তারা বিষ ছিটিয়ে দেয়। যাতে গ্রাম ছেড়ে তারা বন্দীনিবাসে চলে যেতে বাধ্য হয়। যারা তবু থেকে যাবে, প্যারাসুট বাহিনী নামিয়ে তাদের শেষ করা হবে। একের পর এক জায়গায় বছরের পর বছর ধরে এই কাণ্ড তারা করে চলেছে। বন্দীনিবাসে যারা থাকে তাদের অবর্ণনীয় দুর্গতি। পচা চাল। গ্রীষ্মকালে মাথাপিছু দৈনিক আধ লিটার জল। কেউ বাইরে যেতে পারে না। কাঁটাতারের বেড়া, গড়খাই আর সশস্ত্র পাহারা। নরকতুল্য জায়গা। এইভাবে তারা পুরুষদের বাধ্য করে সরকারি সৈন্যদলে ভর্তি হতে। মেয়েদের ওপর বলাৎকার করে। তারা তখন নিরুপায় হয়ে আত্মবিক্রয় করে। এইসব বন্দীনিবাসে হাজার হাজার লোক রোগে অনাহারে অত্যাচারে মারা গেছে। তারা বিদ্রোহ করে। তখন তাদের ওপর এরোপ্লেন থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়। একেকবারের বিমান হামলায় তিন শো থেকে পাঁচ শো লোক মারা যায়। কং তুমের এক বন্দী-নিবাসে এইভাবে দশ হাজার অবরুদ্ধ লোকের মধ্যে সাড়ে তিন শো জন খুন হয়। সন্‌মিতে খুন হয় পাঁচ শো লোক। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্যে বিচারে ক্যালিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু করুণার অবতার প্রেসিডেন্ট নিকসনের দয়ায় সে ছাড়া পেয়ে গেছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে এমন কোনো প্রদেশ বা শহর নেই যা বোমা বা গুলি-গোলায় ঝাঁজরা হয়নি। বেন চে প্রদেশে শত্রুপক্ষ ছ হাজার বার আক্রমণ চালিয়ে বেসামরিক লোকদের মধ্যে চার হাজার জনকে খুন এবং সাড়ে তিন হাজার জনকে জখম করেছে। জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে প্রায় চার

হাজার লোককে। পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে প্রায় পুরো চার হাজার ঘর বাড়ি। প্রদেশের পর প্রদেশ জুড়ে এই একই চিত্র।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট বারো হাজার গ্রামের মধ্যে ষোলো শো গ্রামকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। শতকরা চোদ্দটি গ্রাম ভীষণ-ভাবে বিধ্বস্ত।

রাসায়নিক যুদ্ধের কবলে পড়েছে মানুষ, গাছপালা আর পশুপাখি। জলে স্থলে ছড়ানো বিষে মানুষ মরেছে, ক্ষেতের ফসল জ্বলে গেছে। বিনষ্ট বনজঙ্গলের পুনরুদ্ধার হতে কমপক্ষে বিশ-তিরিশ বছর লেগে যাবে। মাটি শক্ত হয়ে ফুটি-ফাটা হবে। লোকে অন্নাভাবে মারা যাবে। ঘরে ঘরে জন্ম নেবে বিকলাঙ্গ শিশু।

যারা এর প্রতিরোধ করবে তাদের জন্যে বানানো হয়েছে 'টাইগার কেজ' —বাঘের খাঁচা। সেখানে অত্যাচার চলে মধ্যযুগীয় নারকীয় প্রথায়।

গ্রামে আর শহরে অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। যুবক, ছাত্র, বৌদ্ধ—কারো রেহাই নেই। নিজেদের আহত আর পঙ্গু সৈন্যরা প্রতিবাদ করলে তাদেরও গর্দান যাচ্ছে, খবরের কাগজগুলো টুঁ শব্দ করলে হয় বন্ধ করে দিচ্ছে, নয় জরিমানা করছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, শান্তি নিরপেক্ষতার কথা বলা যাবে না। যাদের আত্মীয়স্বজনেরা উত্তরে আছে তাদের ওপর নানাভাবে পীড়ন চলছে।

কিন্তু তাতেও মানুষকে দমানো যাচ্ছে না। সামরিক আর রাজনৈতিক দুদিক থেকেই শত্রুপক্ষ হেরেছে।

ভিয়েতনামের এই যুদ্ধে মার্কিনদের মুখোস খুলে পড়েছে। নিজের দেশের তরুণদের তারা খুনীর দলে পরিণত করছে। তারা আর মানুষ থাকছে না। এই নরাধমদের অপরাধ শুধু অবর্ণনীয় নয়, কল্পনারও অতীত। এদের অপরাধের পুরো বিবরণ এখনও জানা নেই। মার্কিন যুদ্ধবন্দীরা নিজে থেকে যেসব জবাববন্দী দিচ্ছে তা পড়ে যে কারো গা শিউরে উঠবে।

এরপর হুয়েন থে লুই মার্কিনদের ব্যবহার করা রকমারি অস্ত্রশস্ত্রের একটা সচিত্র বিবরণ দিলেন।

বিকেলে তাঁর কথাগুলো চোখের ওপর আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে। প্রদর্শনী দেখে বেরোবার পর কিছুক্ষণ আমাদের কারো মুখে কোনো কথা ছিল না।

মার্কিনরা একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়া ভিয়েতনামে আর কোনো অস্ত্র ব্যবহার করতেই পিছপাও হয়নি।

৯ নং সড়কে কিছুদিন আগে তারা ফেলেছিল পনেরো হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা।

বাঁধের ওপর তাদের বরাদ্দ দু হাজার, এক হাজার, পাঁচ শো, আড়াই শো পাউণ্ডের বোমা।

নইলে এমনিতে যে বোমা তারা সাধারণত লোকালয়ে ফেলে থাকে তার ওজন তিন হাজার পাউণ্ড। মাটিতে পড়ে যে গর্তের সৃষ্টি করে, তার ব্যাসার্ধ হয় আঠারো থেকে চল্লিশ মিটার। বোমা ফেলার পর যখন ত্রাণকর্মীর দল ছুটে আসে, তখন তাদের লক্ষ্য করে বিমান থেকে রকেট ছোঁড়া হয়।

এক রকমের হুঙ্কার-ছাড়া রকেট আছে যা দশ হাজার বর্গ ফুট জায়গা জুড়ে ফাটে। হানয়ে এই ধরনের রকেট ছোঁড়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কণ্ট্রোল কমিশনের হুকুমচাঁদ এই রকেটের টুকরো লেগে খুন হন।

এক ধরনের বোমা আছে, যা ধান ক্ষেতে ফেলা হয় এবং যা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাটে না। লোহা কাছেপিঠে এলে তবে ফাটে। কৃষকেরা কাস্তে নিয়ে কাছে গেলে বোমা ফেটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম ব্যবহার হয়েছিল আনারস আকারের স্টীল পেলেট বোমা। প্রত্যেকটিতে আছে উনিশটি করে টিউব। প্রত্যেক টিউবে থাকে পনেরো থেকে আঠারোটি করে ছোট ছোট বোমা। পরের দিকে এই বোমাগুলো হয় গোলাকার এবং কমলালেবু আকারের। মানুষের শরীরের পক্ষে এই বোমাগুলো আরো বেশি মারাত্মক হয়।

নুয়েন থে লুই একজন শিক্ষিকার কথা বললেন। তাঁর নাম মিসেস থিয়েম। বিমান আক্রমণের সময় তিনি একটি শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শেল্টারে থেকেও তিনি রক্ষা পাননি। ঘাড়ে গলায় আর পাছায় বোমার টুকরো এসে লাগে। লুই সেই মহিলার এক্স-রে প্লেট আমাদের দেখালেন। স্নায়ুতন্ত্রে চোট লাগার ফলে তাঁর অবস্থা এমন হয়েছে যে, আঙুল দিয়ে একটু ছুঁলেই তার সারা শরীর ব্যথায় টনটন করে ওঠে। বোমার টুকরোগুলো এত ভেতরে ঢুকে আছে যে অপারেশন করে বার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সে চেষ্টায় অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও ভয় আছে।

পরে আরও সব মারাত্মক বোমা তৈরি হয়েছে। চরকির মত পাক খেতে

খেতে নামে। একেকটির মধ্যে থাকে পাঁচ শো চল্লিশ থেকে ছ শো ছোট ছোট বোমার ঝাঁক। তা থেকে ঠিকরানো পেলেটে শুধু নয়, ধারালো, সামান্য ছিটে লাগলেও তা প্রাণান্তক হয়।

এই ধরনের ছোট ছোট বোমার ঝাঁকওয়ালা আছে ফসফরাস বোমা। ফাটার পর তার আগুনের ঝলকা ওঠে আঠারো মিটার উঁচু হয়ে। ঘরবাড়ি, গরুমোষ আর মানুষ পুড়ে ছাই হয়।

কমলালেবু আকারের ষ্টীল পেলেট বোমার পেটের মধ্যে থাকে পাঁচ শো ছোট ছোট বোমার ঝাঁক।

এছাড়া আছে ঁইই বোমা। ফাটার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট ছুঁচ শরীরে বিঁধে যায়।

নাপাম বোমা নানা আকারের। তাতে বাদামী বা গোলাপী রঙের তেল থাকে। পুড়ে গেলে অসহ্য ব্যথা হয়। অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। প্রায় পনেরো মিনিট অবধি। জ্বলবার সময় তার তাপের মাত্রা হয় ন শো থেকে দেড় হাজার সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি। আঠার মত আটকে থাকে। জ্বলবার সময় কার্বন অ্যাসিডের ধোঁয়া বেরোয়। এর দাহক্রিয়া যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। এসব কেসের চিকিৎসা করা শক্ত। শরীর বিষিয়ে যায় এবং নিস্তেজ করে। তার ওপর এর শক্ মারাত্মক ধরনের। হাত পা মুখ—বিশেষ করে শরীরের খোলা জায়গায় লাগে। ঘা শুকোতে চায় না। একবার যারা এতে জখম হয়, সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে থাকে।

এর চেয়েও বেশি আঠালো এবং বেশি ডিগ্রি তাপের বোমা হলো ফরফরাস বোমা। শরীরের মধ্যে এর জ্বলুনি থামে না। মার্কিনরা এখন শুধু বোমায় নয়, কামানের গোলায়, বুলেটে, হাতবোমায় ফসফরাস জুড়েছে।

চাষের ক্ষেতে আর মাঠে ঘাটে ওরা নানারকমের মাইন ছড়িয়ে দেয়। কোনোটা ব্যাগ, কোনোটা কলম, কোনোটা গাছের পাতা, কোনোটা প্রজাপতি, কোনোটা মাকড়সা, কোনোটা সাইকেলের পার্টস-এর মতন দেখতে। কোনোটার রং পাতার, কোনোটার মাটির। এই ধরনের মাইন ধানক্ষেতে আর মাঠে ঘাটে হাজার হাজার ছাড়ে। মাকড়সা বোমায় লম্বা সুতো লাগানো থাকে। ছোঁয়ামাত্র ফাটে।

বুলেটের মধ্যে ভরা থাকে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে তীর। বুলেট ফাটা মাত্র তীরগুলো ছুটে যায়। দমদম বুলেট লেগে কত জনের যে আঙুলের ডগা উড়ে

গেছে ইয়ত্তা নেই। এতে নার্ভের অসহ্য যন্ত্রণা হয়। অস্ত্রোপচার করেও টুকরোগুলো বার করা যায় না।

এছাড়া আছে বৈদ্যুতিক মাইন।

সবচেয়ে মারাত্মক হলো সপ্তদশ অক্ষরেখার কাছে বিমান আর কামানযোগে গ্যাসের মুখোস পরে মার্কিনদের ছড়ানো বিষাক্ত রাসায়নিক। এই সব রাসায়নিক লেগে পেঁপে, কলা, শাক, কচুপাতা বিষাক্ত হয়ে যায়। হাঁস-মুরগির ওপরও এর বিষক্রিয়া হয়। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র আর ফুসফুস বিকল হয়ে পড়ে। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়।

মুয়েন থে লুই এইসব অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলেন আর সেই সঙ্গে ফটোর পর ফটো দেখিয়ে তার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলেন।

বলা শেষ করে তাঁর এক সহযোগীকে তিনি কি যেন বললেন।

ভেতর থেকে ধরে ধরে এনে ন বছরের একটি মেয়েকে আমাদের সামনে হাজির করা হলো। তার নাম হোয়াং থি থে। কোয়াং বিন প্রদেশের কোয়াং চাই জেলায় তার বাড়ি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সে পড়ত। আটষট্টি সালের ১০ সেপ্টেম্বর সকাল নটায় যখন সে তার সহপাঠীদের সঙ্গে দল বেঁধে ইস্কুলে আসছিল, সেই সময় মার্কিন বিমান থেকে নাপাম বোমা আর স্টীল পেলেট বোমা ফেলা হয়। পাঁচ জন ছাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। অনেকে আহত হয়। প্রথমে জেলা হাসপাতালে এবং তারপর প্রাদেশিক হাসপাতালে অনেকদিন ধরে তাদের চিকিৎসা হয়। থে-র বাঁ পায়ের হাড়সুদ্ধ পুড়ে গেছে। অনেক চিকিৎসা করেও তার ঘা কিছুতেই শুকোচ্ছে না।

থে চলে যেতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল—পশুর অধম মানুষগুলোকে কি করে পৃথিবীতে আজও আমরা বরদাস্ত করে চলেছি?

থে চলে যেতে যে এল, তার নাম বুই ভান ভাৎ। তার বাড়ি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিয়েন ভান জেলায়। বছর কুড়ি বয়স। সত্তর সালের ৪ মার্চ মাঠে কাজে গিয়েছিল। হঠাৎ শত্রুপক্ষের ছটি বিমান আসে। কৃষকেরা ছুটে শেল্টারে যাবার আগেই তারা বোমা ফেলে। সাদা ফসফরাস বোমা। ভাৎ তাতে জখম হয়। পুরো ডান হাত, ডান পিঠে আর ডান পায়ের পেছনদিক পুড়ে যায়। সংকটজনক অবস্থায় তাকে ধরাধরি করে দা নাঙের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। রাস্তায় মার্কিন সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তাদের

চারজনকে গুলি করে মারে। একজন সৈন্য ছুরি দিয়ে যখন ভান ভাৎ-এর মাথা কাটতে যাচ্ছিল, তখন পেছন থেকে আরেকজন তাকে লাথি মারে। ভাৎ উল্টে পড়ে গেলে একজন সৈন্য তার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়। তারপর তাকে মৃত মনে করে তারা চলে যায়। রাত্রে গ্রামের লোকে তাকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পাঠায় মুক্তাঞ্চলে। মুক্তাঞ্চল থেকে আনা হয় উত্তর ভিয়েতনামে চিকিৎসার জন্যে। তার চামড়ার শতকরা তিরিশ ভাগ পুড়ে গেছে। ডান হাতের দুটো আঙুল একসঙ্গে জুড়ে গেছে। গলায় ছোরার ঘা। ঘাড়ের পেছনে ছোরার গভীর ক্ষত।

হিংস্র বাঘের মুখে পড়লেও বোধহয় মানুষের এমন চেহারা হয় না।

২৪

কাল ছিল জাতীয় লোকসভার নির্বাচন। কোনো হৈচৈ নেই।

আমাদের হোটেলের পেছনে যে রাস্তা বরাবর এগোলে পৌরভবন, সেখানে ভোট দেবার একটা বুথ।

আকাশটা ছিল মেঘলা মেঘলা। রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেশ আরাম।

বড় বড় নিশান আর ফেস্টুন দিয়ে চারদিক সাজানো। গ্রামের দিকে এ দৃশ্য বলতে গেলে প্রায় এসে অবধি দেখছি। গোড়ায় ভেবেছিলাম সামনে উৎসব আছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো পোস্টার কিংবা জনসভা একদিনও নজরে পড়েনি। থান হোয়াতে গিয়ে এই নির্বাচনের কথা প্রথম জানতে পারি। নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন শুধু ফ্রন্টের প্রার্থীই নয়—সেইসঙ্গে নির্দলীয় প্রার্থীরাও দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়।

বুথের সামনে রীতিমত ভিড়। যাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে তারাও সহজে নড়ছে না।

পৌরভবনে আমরা যেতেই আপ্যায়ন করে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভোট দেওয়ার গোটা ব্যবস্থা দেখানো হলো। প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে। কে কাকে ভোট দিচ্ছে জানবার কোনো উপায় নেই।

ঘুরে ঘুরে আমরা চারটে বুথ দেখলাম। যে বুথে কমরেড ফাম ভান ডং

অন্যতম প্রার্থী ছিলেন, সেই বুথ শহরের এক ঘিঞ্জি এলাকায়। সেখানে যেতে গিয়ে বোমাবিধ্বস্ত বেশ কয়েকটা বাড়ির ভগ্নস্তূপ হানয়ে এই প্রথম নজরে পড়ল। ·

একটা বুথে গিয়ে দেখি আমাদের লেখক বন্ধু তো-হোয়াই সেখানকার পাণ্ডা। কমরেড তো-হোয়াই ঐ অঞ্চলের একজন সর্বজনপ্রিয় পার্টি নেতা। আমরা তো-হোয়াইয়ের বন্ধু। সুতরাং চা-বিস্কুট না খাইয়ে কেউ আমাদের ছাড়বে না।

বড় লেকের ধারে প্যাগোডায় ছিল আরেকটি বুথ। আমরা যখন গেলাম লাউডস্পীকারে তখন পলিট ব্যুরোর সদস্য কবি তো-হুর লেখা গান হচ্ছিল। হো চি মিনের স্মৃতিতে লেখা এই গান উত্তর ভিয়েতনামে অসম্ভব জনপ্রিয়। বাগানের মধ্যে যারা বসেছিল দেখলাম গানের সঙ্গে তাদের সকলেরই ঠোঁট নড়ছে।

ফিরে গিয়ে কয়েকটি ফিল্ম দেখলাম। একটা ফিল্মে দেখলাম মজার ব্যাপার। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গড়া হয়েছে মৌমাছিদের একটি বাহিনী। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে তাদের শেখানো হয়েছে। গোড়ায় গোড়ায় তারা দু পক্ষকেই হুল ফোটাত। কিন্তু পরে উন্নত ধরনের শিক্ষার ফলে এখন তারা শুধু মার্কিন দালাল পক্ষকেই কামড়ায়।

আজ এসেছি হাইফং ছাড়িয়ে আরও উত্তরে হা-লং উপসাগরস্থ শহরে। 'হা' মানে 'অবতরণরত' আর 'লং' মানে 'ড্রাগন।' হা-লং হলো স্বর্গ থেকে নেমে আসা ড্রাগন। ডানাওয়ালা কাল্পনিক সরীসৃপ ড্রাগন, যার নিশ্বাসে আগুন ঝরে।

অথচ হা-লং এক আশ্চর্য সুন্দর শহর। পাহাড়ের ওপর একটি ভারি চমৎকার অতিথিশালায় এসে আমরা কয়েকজন উঠলাম। আর সেই সঙ্গে কয়েকজন ভিয়েতনামি ছাত্রছাত্রীসহ একজন সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদ্ অধ্যাপক।

নিচে বাগান। সেই সঙ্গে রেস্তোরাঁ। সামনে ধু ধু করছে সমুদ্র। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে গাছের ছায়া-ঢাকা চমৎকার বেড়াবার জায়গা।

সন্ধ্যের সময় এলেন কমরেড নুয়েন সি বিন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত।

কমরেড বিন বলেছিলেন :

'কোয়াং নিন্ প্রদেশের মধ্যে দশ লক্ষ লোকের এই অঞ্চল। যেদিকেই

যান পাহাড়ের পর পাহাড়। সাত হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে প্রায় পুরোটাই এর শিল্প এলাকা। এ অঞ্চলে বাস করে তেরোটি সংখ্যালঘু জাতি। এক লক্ষ লোক কয়লাখনির মজুর। কয়লা ছাড়াও রয়েছে বিদ্যুৎ আর যন্ত্রশিল্পের কারখানা। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর মাছ আর বনজ সম্পদ। তা ছাড়া আছে নানা রকমের আঞ্চলিক শিল্প। যেমন—ইটখোলা, সিলিকেট ব্রিক. নুন তৈরি, বাঁশ আর বেতের আসবাবপত্র তৈরি, চা-বাগান, বালি থেকে কাচ তৈরি, মাছের সস্ তৈরি (বছরে পঞ্চাশ হাজার লিটার), গুটিপোকা আর মৌমাছির চাষ।'

সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিম ধার বরাবর যে পাহাড়, সেই দিকে হাত দেখিয়ে কমরেড বললেন, 'ওটা হলো মাই-থো পাহাড়। ওর নামের মানে হলো 'একটি কবিতা'। দশ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওখানে এসে আস্তানা গাড়ে এবং কবিতা রচনা করে।

'আর তো ক-দিন পরেই পয়লা মে। সেদিন এলে দেখবেন পাহাড়ের মাথায় পৎ পৎ করে উড়ছে লাল নিশান। তিরিশ সালে পার্টির তিনজন নেতা ঐ জায়গাতেই প্রথম লাল ঝাণ্ডার পত্তন করেন। সেই থেকে প্রতি বছর পয়লা মে পাহাড়ের ওপর লাল নিশান ওড়ানো হয়। ওটা এ অঞ্চলের খুব একটা গর্বের ব্যাপার। কেননা এখানে শ্রমিক আন্দোলন আর সেই সঙ্গে পার্টির গোড়াপত্তন হয় আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। উনিশ শো ছত্রিশ সালে ফরাসিদের বিরুদ্ধে তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে।

'সারা ইন্দোচীনের মধ্যে এখানকার কয়লাখনি হলো সবচেয়ে বড়। এখানে পাওয়া যায় খুব উচ্চ মানের পাতলা কয়লা। প্রতি কিলোগ্রামে এই কয়লা থেকে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে থাকে সাত থেকে আট হাজার ক্যালরি। বেশির ভাগ খনিই উপরের স্তরে। খনির কাছেই বন্দর থাকায় রপ্তানি করার পক্ষে খুব সুবিধে। তা ছাড়া নানা দেশের জাহাজ আসে বলে আন্তর্জাতিক সংহতি খুব সহজেই গড়ে ওঠে।

'জাপানি, ফরাসি এবং এখন মার্কিনদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে এ অঞ্চলের সমস্ত সংখ্যালঘু জাতি বরাবর এক মন এক প্রাণ হয়ে লড়েছে। ভিয়েতনামে প্রথম মার্কিন প্লেন মাটিতে ফেলা হয় এই কোয়াং নিন্ আর সেই সঙ্গে থান হোয়া প্রদেশে। এটাও আমাদের একটা গর্ব।

'চৌষট্টি সালের ৫ অগস্ট আমাদের পদাতিকবাহিনী তিনটি মার্কিন প্লেন

গুলি করে নামায়। একজন মার্কিন পাইলট—লেঃ অ্যানভারেস এভারেট—ধরা পড়ে। লোকটা ঠিক আগের মতোই দুর্বিনীত। তারপর আটষট্টির ৩১ মে-র মধ্যে মোট এক শো আশিটি প্লেন আমরা নামিয়েছি। তার মধ্যে একচল্লিশটি প্লেন সমুদ্রের জলে ডুবেছে।

'তিরিশ আর ছত্রিশ সালের পর এখানে অনেক বড় বড় ধর্মঘট হয় মজুরি বৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ এবং ওপরওয়ালাদের অত্যাচার রদ করার জন্যে। সেই লড়াইতে ফরাসিদের রাজত্ব কেঁপে ওঠে। এরপর ছেচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন অবধি ন বছর ধরে এখনে চলে ফরাসিবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম। বাহান্ন সালের জুন মাসে এখানকার গেরিলাবাহিনী মার্কিন কমাণ্ডার-ইন-চীফ রোভের প্লেন গুলি করে নামায়। আগুন লেগে প্লেনটা পুড়ে যায়।

'পুরনো দিনের একটা ঘটনা এখনো মনে আছে। ছেচল্লিশের ৩ মার্চ। তখন সবে আমাদের বিপ্লব জয়ী হয়েছে। ফরাসিরা চুক্তি সই করে ভিয়েতনামকে স্বাধীন দেশ বলে মেনে নিয়েছে। আমাদের হাতে তখন অস্ত্র বলতে কিছু লাঠি আর বন্দুক। ফরাসিরা ঐদিন এখানে তাদের নৌ, পদাতিক আর বিমানবহরের এক কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করে কমরেড হো-কে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা চেয়েছিল নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে। কমরেড হো হেসে বলেছিলেন—জাপান আর ব্রিটেনের নৌ, পদাতিক আর বিমানবহরের শক্তি আমার দেখা আছে; ওরা তো তোমাদের চেয়েও বলবান।

'কমরেড হো চি মিনের খুব পছন্দ ছিল হা-লং উপসাগর। তিনি ন বার এখানে এসে থেকেছেন। এখানকার কয়লা শিল্পকে আধুনিক করে তোলা—এটা ছিল তাঁর স্বপ্ন।

'বারো শো আঠাশ থেকে বারো শো তিপ্পান্ন—এর মধ্যে তিন তিনবার এদেশে আক্রমণ করে পরাস্ত হয়েছিল চেঙ্গিজ খাঁ। তার বংশধররা পঞ্চাশটা দেশ, এক হাজার শহর আর দুর্গ এবং সেই সঙ্গে মস্কো-পিকিং শহরকে পদানত করেছিল। সেই মঙ্গোলদের আমরা তিন তিনবার হারিয়েছি।'

২৫

সকালে গিয়েছিলাম মোটরলঞ্চে বেড়াতে। দূরে কুয়াশার ভাব। সমুদ্রে হু-হু করছে হাওয়া। উপসাগর হলেও দেখায় ঠিক শান্ত সরোবরের মতো।

কমরেড বিন এই উপসাগরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, দেখলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। হা-লং উপসাগর দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ কিলোমিটার আর প্রস্থে তিরিশ কিলোমিটার। জলের মধ্যে মাথা তুলে আছে কত যে পাহাড়, উপকূল থেকে তা ধারণাই করা যায় না। পনেরো শো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই উপসাগরে সবসুদ্ধ তিন হাজার চুনাপাথরের পাহাড় আছে। তার মধ্যে নামকরণ করা হয়েছে এক হাজার পাহাড়ের। যার যেমন আকৃতি তার তেমন নাম। মোরগঝুঁটি, শুয়োরছানা, অন্নকূট, ডালা পাহাড়—এই রকম কত কী।

বছরভর এর শান্ত ঢেউ। নীল নির্মল রং। কমরেড বিন বলেছিলেন, যেন কোনো অষ্টাদশী ভিয়েতনামি মেয়ের অপাপবিদ্ধ চপল চরণ। পাহাড়ের গা-ময় গুহাগুম্ফা। সেদিকে যেতে যেতে মনে হবে কেউ যেন বুনে চলেছে গালচে। কাছে গেলে দেখা যাবে গালচেটা নেই। কখনও মনে হবে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে পাহাড়, গুহার মধ্যে গুহা। মিনিটে মিনিটে পালটাচ্ছে জলের রং। কখনও মনে হবে যেন যবনিকাহীন রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নৃত্যগীত। পাহাড়গুলো যেন স্টেজের উইংস।

হা-লং উপসাগরে ঘোরার মতো শরীর মন আচ্ছন্ন করা সৌন্দর্যের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা জীবনে আমার কখনও হয়নি। অনেক বিদেশী কবি এই উপসাগর দেখে কবিতা লিখেছেন। আমি তাঁদের কবিতা পড়িনি। যতক্ষণ সমুদ্রে ছিলাম শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমাকে পেয়ে বসেছিল, যা কোনোদিন আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

ফেরার পথে একটি পাহাড়ের ধারে দেখলাম গিজগিজ করছে এক গাদা নৌকো। জিগ্যেস করে জানলাম, ওরা হলো একদল চীনা যাযাবর। সমুদ্রে মাছ ধরে। ওরা সারা জীবন নৌকোতেই থাকে। এখন ওরা ভিয়েতনামের বাসিন্দা। ওদের সমবায় আছে। নৌকোর মধ্যেই ওদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমবায়-পরিচালিত ইস্কুল বসে। ডাঙা থেকে আলাদা নৌকো এসে ওদের রসদ, নিত্যপ্রয়োজনের জিনিস এবং খাবার জল যোগায়। শুনলাম ডাঙার জীবনে ওদের খুব বেশি টান নেই। জলে থাকতেই ওরা ভালবাসে। নৌকোয় জন্ম, নৌকোতেই ওদের মৃত্যু।

সমুদ্র থেকে ফিরে আমরা দুপুরে রওনা হলাম হাতু-র কয়লাখনি এলাকা দেখতে। সঙ্গে গেলেন স্থানীয় কমরেড চান স্বয়ান নুয়েন।

হা-লং থেকে খেয়া পেরিয়ে হোং-গাই। বন্দর হিসেবে হোং-গাইয়ের নামডাক আছে। এ শহরে ছ লক্ষ লোকের বাস। মার্কিনরা কম করে পঞ্চাশ বার এখানে বোমা ফেলেছে। শহরের ভেতর দিয়ে যেতে আসতে প্রচুর বোমাবিধ্বস্ত বাড়ি দেখলাম। বোমা পড়ে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গিয়েছিল শহরের পাওয়ার হাউস। বোমা পড়েছিল এখানকার হাসপাতালে আর পাহাড়ের মাথার ওপর গির্জায়। ফেরার সময় মজুরদের বসতি দেখলাম। ফরাসি আমলে আগে সেখানে থাকত খনির কেরানি-মুন্সী গোছের লোকজন। আর মজুরদের থাকতে হত পাহাড়ের ওপর কুঁড়েঘরে। কোলিয়ারির সাহেবদের জন্যে ছিল শৌখিন বাংলো।

হোং-গাই শহরের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বাড়ি। কমরেড নুয়েন বললেন, ওটা ছিল ফরাসিদের কুখ্যাত জেলখানা। পার্টির আর খনি মজুরদের বহু নেতা ঐ জেলে থেকেছেন। লোকে এখনও ঐ বাড়িটাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

বোমা পড়ার সময়টাতে লোকে হয় পাহাড়তলীতে, নয় পাহাড়ের গুহার মধ্যে থাকত। শহরে এখনও অনেক কুঁড়েঘর আর পুরনো বাড়ি। নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে না বোমা পড়ার ভয়ে।

হোং-গাই থেকে হা-তু মাত্র দশ কিলোমিটার রাস্তা। দৈর্ঘ্যে এক শো আশি কিলোমিটার আর প্রস্থে তিরিশ কিলোমিটার—এই নিয়ে কয়লার খনি অঞ্চল।

যেতে যেতে চোখে পড়ল বাঁদিকে প্রকাণ্ড হ্রদ। আসলে এক সময়ে ও

জায়গা খুঁড়ে ফরাসিরা কয়লা তুলেছিল, বৃষ্টির জলে এখন সেখানে হ্রদ দাঁড়িয়ে গেছে। ডানদিকে পাহাড়ের মাথায় ফরাসিদের পরিত্যক্ত সৈন্য-ব্যারাক। কয়লাবাহী মালগাড়ির লাইন। অদূরে হা-লং শৈলশ্রেণী আর সমুদ্র। পাহাড় আর সমুদ্রের তলদেশেও রয়েছে কয়লার স্তর।

আমরা প্রথমে গেলাম হা-তু কয়লাখনির আপিসে। ওপরে টালি দেওয়া লাইনবন্দী ছাঁচা বাঁশের ঘর। প্রত্যেক ঘরেই টাইপরাইটার আর ক্যালকুলেটর মেশিনের খটাখট শব্দ।

কয়লাখনির ডিরেক্টর জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন। আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন সহকারী ডিরেক্টর কমরেড লে বিন্।

সেখান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম পাহাড়ের ওপর, যেখানে বড় বড় যন্ত্রে পাহাড়ের গা কেটে কয়লা তোলা হচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখাতে দেখাতে কমরেড লে বিন্ বললেন:

'কোয়াং নিন্ প্রদেশে তিনটি খোলা কয়লাখনি আছে। তার মধ্যে হা-তু একটি। এখানে বছরে পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ কিউবিক মিটার মাটি সরাতে হয়। মার্কিন হামলার আগে অবধি আমাদের এই খনির খুব নামডাক ছিল। আমরা উৎপাদনের নিশানা ছাপিয়ে যেতাম। কিন্তু বোমা পড়ার বছরগুলোতে নানা বাধাবিপত্তি দেখা দেয়। গত বছর থেকে আবার আমরা এগোতে শুরু করেছি। এ বছরের প্রথম তিন মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ছত্রিশ ভাগ বেশি কয়লা আমরা উৎপাদন করেছি। বাহাদুর ৯ নং সড়কের নামে আমরা উৎপাদন বাড়াবার ডাক দিয়েছি।

'মার্কিনরা বোমা ফেলে আর গোলা ছুঁড়ে হা-তুকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। আমরাও তার জবাব দিয়েছি। আমরা প্রথম গুলি করে মার্কিন বিমান নামাই। আমাদের রক্ষীবাহিনীতে আছে এক হাজার মেয়ে পুরুষ। আমরা তৈরি। এবার ওরা এলে কড়া শিক্ষা পাবে।

'আমাদের এখানে খনি মজুরদের নাচ-গান, লেখা-আঁকা, সঙ্গীত-অভিনয় শেখানোর ভালো ব্যবস্থা আছে। আমাদের নাচগানের নিজস্ব দল আছে। মজুরদের মধ্যে তারা কাজের উৎসাহ জাগায়। সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটি দেয়াল-পত্রিকা।

'এখানে খনিমজুর আছে তিন হাজার। তার মধ্যে তিন ভাগের এক

ভাগ মেয়ে শ্রমিক। তিন শিফটে কাজ হয়। যন্ত্রে কাজ হয় বলে মজুরির হার এখানে বেশি। ফরাসি আমলে আগে যেখানে মজুরি ছিল বিশ থেকে তিরিশ ডং, এখন সেখানে একজন খনিমজুর সত্তর ডঙেরও বেশি পায়। আট ঘণ্টার বেশি কিংবা রাত্রে কাজ করলে তারা বাড়তি সুবিধে পায় টাকায় নয়—জিনিসে। অসুখ করলে বিনাখরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা। বেশিরকমের অসুখ করলে স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠানো হয়। সন্তান হলে, বাচ্চার অসুখ করলে আর দুধ খাওয়ানো বাবদ মেয়েরা বছরে চার মাস ছুটি পায়। শ্রমিকেরা যাতে দরকার মতো শিক্ষা পুরো করতে পারে তার জন্যে সপ্তাহে দু দিন তিন শিফটে ক্লাস হয়। যারা কারিগরি ট্রেনিং নিতে চায়, তাদের জন্যে সপ্তাহে দু দিনের ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা তাদের ট্রেনিং দেন। উচ্চতর ট্রেনিঙের জন্যে সমাজতান্ত্রিক নানা দেশে শিক্ষার্থীদের পাঠানো হয়। গত বছর পঁচিশ জন খনি শ্রমিক বিদেশে গেছে।

'এখন আমরা কয়লা তুলি বছরে পাঁচ লক্ষ টন। বছর দুয়েক পরে আমরা এর তিনগুণ পরিমাণ কয়লা তুলতে পারব। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের এখন সবচেয়ে বড় মুশকিল হলো গৃহ সমস্যা।

'এখানকার খনি শ্রমিকেরা বেশির ভাগই এখন থাকে হয় হোং-গাইতে নয় হা-লঙে যে যার নিজের বাড়িতে। খনির ট্রাকে করে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা।

'তবু কিন্তু আগেকার আমলের সঙ্গে এখানকার আমলের আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে আমলে ভোঁ বাজলে লোকে বলত, নরকের বাঁশী বাজছে। দিনে ছিল তেরো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটুনি। খনির ধারে নোংরা কুঁড়ে ঘরে ছিল থাকার ব্যবস্থা। লেখাপড়ার কোনো কথাই উঠত না। মজুররা এত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এত দেরিতে ফিরত যে লোকে বলত—ছেলেরা তাদের বাপের মুখ আর কুকুররা তাদের মনিবদের মুখ দেখতে পায় না। দলে দলে যখন খনি শ্রমিকরা কাজ শেষ করে ট্রাকে করে ফিরছিল তখন তাদের দেখে আমি যে কী অবাক হয়েছিলাম বলার নয়। অবাক হওয়ার কারণ তাদের চোখ মুখ আর তাদের পোশাক। কাজের পর খনি মজুরের চোখে মুখে যে এমন একটা হাসিখুসি প্রসন্ন ভাব ফুটে থাকতে পারে, পোশাক পরিচ্ছদ এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারে—এ আমার ধারণার বাইরে ছিল। এতক্ষণে যা কানে শুনেছিলাম চোখের সামনে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পেয়ে গেলাম।

হা-লঙের অতিথিশালায় ফিরে চা খেতে খেতে প্রাদেশিক প্রশাসনের সহ-সভাপতি কমরেড চান কুয়োক লান বলছিলেন তাঁর জীবনের গল্প :

'আমি যখন বিপ্লবে যোগ দিই তখন আমার বছর সতেরো বয়স। হানয়ে তখন পড়াশুনো করছি। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হলো সটান লড়াইয়ের ময়দানে। কিছুদিন হাই হুনে থাকবার পর পার্টির নির্দেশে হোং-গাইতে চলে এলাম। আমি ছিলাম টেকনিক্যালের ছাত্র। পার্টি তাই আমাকে এই শিল্পাঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। তারপর থেকে একটানা পঁচিশ বছর ধরে আমি এখানে।

'সাতচল্লিশ সালে ফরাসিবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় শহরতলীতে আমার ওপর কাজের ভার পড়ে। আমি তখন জেলা পার্টির সেক্রেটারি। ভারি কষ্টের মধ্যে তখন কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে আদর্শের আগুন থাকায় কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয়নি। ফরাসিরা সে সময়ে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ চালায়। লাখ আড়াই লোকের মধ্যে ফরাসিদের হাতে ছিল দু হাজার সশস্ত্র পুলিস আর সশস্ত্র সিভিক গার্ড। তবু আমরা ডরাইনি। সমানে আমাদের কাজ করে গিয়েছি। তার কারণ, শহরবাসীর অধিকাংশই ছিল শ্রমিক।

'আমাদের সংগঠনের কাজে জেলেদের ওপর আমরা জোর দিয়েছিলাম। কারণ, খনি এলাকা আর সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যে ওরাই ছিল যোগসূত্র। আমি হোং-গাইতে আত্মগোপন করে থাকতাম। শ্রমিকদের সংগঠিত করা ছাড়াও শত্রুপক্ষের বেতনভুক ভিয়েতনামি সৈন্য এবং সেই সঙ্গে ভাড়াটে ইওরোপীয় আর আফ্রিকান সৈন্যদের মধ্যেও আমরা প্রচার কাজ চালাতাম। তার ফলে পাহারার ব্যাপারে ওদের মধ্যে গা-ছাড়া ভাব দেখা দেয়। আমরাও তার সুযোগ নিই।

'চুয়ান্ন সালের ২৪ এপ্রিল আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী কমরেডদের নিয়ে ঐদিন আমি হোং-গাইয়ের দখল নিতে আসি। শহরের লোকে, বিশেষ করে খনিমজুররা কাতারে কাতারে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। মজুররা সেদিন এমন সাজগোজ করেছিল যে, তাদের দেখে আমি তো অবাক। আমাদের কোনো কোনো নেতা আমাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'মজুরদের দেখছি না কেন?' আমি বললাম, 'ওরাই তো।' তখন আমি কয়েকজন চেনা মজুরকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমরা

এত সেজেছ কেন ?' তারা বলল, 'বা রে, আজ যে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন।' একমাস আগে থেকে তারা এই দিনটির জন্যে তৈরি হয়েছিল।

'আমার জীবনের প্রথম আনন্দের দিন ছিল যেদিন আমি বাড়ি ছাড়ি। দ্বিতীয় আনন্দের দিন, যেদিন আমরা হোং-গাইয়ের দখল নিই।

'এরপর পার্টি থেকে আমার ওপর সংস্কৃতি আর ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে কাজের ভার পড়ে। মাঝে মধ্যে এটা-সেটা করতে হলেও আজও আমি পার্টির শিক্ষা আর প্রচার সংক্রান্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তার জন্যে আমাকে খনি শ্রমিকদের মন ভালোভাবে বুঝতে হয়েছে। এই নিয়ে একটানা দশ বছর ধরে গবেষণা করে তবে আমি সফল। আমার বিপ্লবী জীবনের এই হল তৃতীয় পরম আনন্দ।

'এটা দেখেছি যে, শিল্প সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যা বলা যায়, তা খুব সহজেই এখানকার শ্রমিকদের মর্মগ্রাহী হয়। এটা লক্ষ্য করার পর এখান-কার স্থানীয় শিল্পসংস্কৃতির উন্নতির দিকে আমরা বিশেষভাবে নজর দিই। গত বছর সারা প্রদেশ জুড়ে আমরা নাচগানের প্রতিযোগিতা করি। গত দশ বছরে আমরা দু শো গীত রচয়িতা যোগাড় করেছি। তাছাড়া ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ার ব্যাপারটাও এখানে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু তবু বলব, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যতটা এগিয়েছি ততটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগোতে পারিনি। শুনেছি আপনাদের দেশে আপনাদের পার্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক কিছু করেছে। আমরা সে সব জানতে চাই।

'পার্টি আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল। এ জায়গা শিল্পশ্রমিক আর সুন্দর নিসর্গের জন্যে বিখ্যাত। এটা টুরিস্টদের খুব ভালো বেড়াবার জায়গা হতে পারে। এখানে দেশ বিদেশের মানুষ আসতে পারে। আমি এখানে পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছি। আমি পার্টির স্ট্যানডিং কমিটি আর প্রাদেশিক প্রশাসন কমিটির সদস্য। আমার কোনো বিলাসিতা নেই। তবু মাস শেষ হতেই মাইনে ফুরিয়ে যায়।

'শুনেছি ভারতে এবার ভাল ফসল হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার প্রথম পাঁচ বছরে ফসল ভাল হয়নি। কিন্তু তবু লড়াইয়ের বছরগুলোতেও কেউ না খেয়ে থাকেনি। আমাদের এটা গর্বের বিষয়। আমাদের ছোট শিল্পগুলো সব সময় খুব কষ্টে চলেছে। আমাদের দেশের মানুষকে আরও অনেকদিন

কষ্ট করে যেতে হবে। পেটে কাপড় বেঁধে উৎপাদনের কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু শত কষ্টের মধ্যেও লোকের চোখেমুখে দেখবেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। এই আনন্দকে তারা কাজের ভেতর ফুটিয়ে তুলছে। খনিমজুররা গত বছর ছ মাসে যে কাজ করেছে, সেই কাজ এ বছরে মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে করেছে। থে-সান লড়াইয়ের বিজয়-উৎসব পালন করার জন্যে তারা পাঁচ ভাগের এক ভাগ উৎপাদন বাড়াবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে।

২৬

ফিরেছিলাম হাইফং হয়ে। রাস্তায় এখনও অতীতের ভগ্নদূত হয়ে দাঁড়িয়ে ফরাসিদের পিলবক্স। রঙীন কাগজে সাজানো শবাধার নিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে মাঠ ভেঙে চলেছিল গ্রাম দেশের একদল মানুষ। খালের ধারে কেউ কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। মাঠের মধ্যে একটি ছেলে ওড়াচ্ছিল এরোপ্লেন আকারের একটা ঘুড়ি।

ফেরিতে পেরোতে হয়েছিল বাক ডাং নদী। তখন ভাঁটার সময়। কমরেড তাই আমাদের মনে করিয়ে দিলেন দূর অতীতের কথা। জাতীয় বীর চান হুং ডাও যে নদীর মধ্যে কাঠের গুঁড়ি পুঁতে বহিঃশত্রুদের রুখেছিলেন, সেই নদী হলো এই বাক ডাং। চারদিকে থিক থিক করছে কাদা।

এর ঠিক পরেরটাই হলো লাল নদী। হাইফঙের ঠিক গায়ে। আমাদের গাড়ি এবার শহরে ঢুকল। বেশিক্ষণের জন্যে নয়। একটা করে বীয়ার শেষ করতে যেটুকু সময়।

রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি যতটুকু চোখে পড়ল, তাতে বোঝা যায় ফরাসি আমলে হাইফং ছিল রীতিমতো ফুর্তির শহর। হানয়ের চেয়েও দেখতে ঢের বেশি জমকালো।

আমরা তো সামান্যই দেখেছি। কিন্তু দুপাশে লোকালয়ের পর লোকালয় এখন শুধু ভগ্নস্তূপ। ভাঙা ঘরবাড়িতে এখনও অগুন্তি লোক মাথা গুঁজে রয়েছে।

হাতে সময় ছিল না বলে হাইফং শহরটা ভালো করে দেখা হল না।

আজ গিয়েছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তরে। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রায় সামনাসামনি।

সিঁড়ির কাছে নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কমরেড তো-হিউ। শুধু নামকরা কবি নন, তিনি পলিটব্যুরোর সদস্য এবং ভাবাদর্শ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নেতা।

নেতা বলতে মনে মনে যে শ্রদ্ধামেশানো ভয় ছিল, তো-হিউকে দেখা মাত্র সেই ভয় কেটে গেল। আমাদের দুজনকে দু হাতে তিনি জড়িয়ে ধরে ওপরে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। চা, টফি, ফলমূল এলো। সাদামাঠা পোশাকের হাসিখুশি দিলখোলা মানুষ তো-হিউ। কোনোরকম দেমাক নেই।

কমরেড তো-হিউয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এটা আগে জানতাম না। জানলে অনেক কিছু জিগ্যেস করবার জন্যে ভেবে চিন্তে আগে থেকে তৈরি হতে পারতাম। অবশ্য দো-ভাষীর সাহায্যে কথা বলার অনেক মুশকিল। তর্জমায় সব প্রশ্ন বা সব উত্তর ঠিক মতো ফোটে না।

এক ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। বান্নেভাই নানা ভাবে তো-হিউকে তাঁর নিজের লেখার প্রসঙ্গে টানবার চেষ্টা করলেন। তো-হিউ বার বার সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে অন্য কথায় চলে গেলেন।

কমরেড তো-হিউয়ের একটা কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। লড়াইয়ের প্রসঙ্গ তুলে উনি বলেছিলেন : দেখ, আমরা জান দিয়ে লড়ছি বটে, —কিন্তু সত্যি বিশ্বাস করো, আমরা কাউকে ঘৃণা করি না। একবার একজন বন্দী মার্কিন পাইলটকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম—আচ্ছা, তোমরা কি আমাদের ঘৃণা করো ? তার উত্তরে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তারপর বলেছিল—কই, না তো। আমরা তো আকাশে উঠে শুধু দাগানো ম্যাপ দেখে দেখে বোতাম টিপি। ওদের ঐ বোতাম টেপার পরেকার দৃশ্যগুলো যখন আমরা ওদের চোখের সামনে তুলে ধরি, তখন ওদের ভিরমি লাগার দশা হয়। কিন্তু জানো যারা আমাদের সত্যিই ঘৃণা করে তারা হলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিনদের হাতের পুতুল। এই ঘৃণা হলো শ্রেণীগত ঘৃণা।

বিদায় নিয়ে আসার সময় ইংরেজি অনুবাদে পড়া কমরেড তো-হিউয়ের একটি কবিতা আমার বার বার মনে পড়ছিল :

দেশের মানুষেরা হলো সমুদ্র,
শিল্প হচ্ছে নৌকো।
নৌকো তোলপাড় করছে ঢেউ,
ঢেউগুলো নৌকোকে ঠেলে দিচ্ছে
সামনে।
নৌকো পৌঁছে যায় উন্মুক্ত সমুদ্রে,
বিরাট পাল ছড়িয়ে যাচ্ছে
হাওয়ায়।
কাজ হলো পাল
আর আমাদের পার্টি হচ্ছে
হাওয়া।

তো-হিউয়ের কথা বলার ধরনটাও তাঁর কবিতারই মতো। প্রত্যেকটা কথা যেন তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকে। হাত বাড়ালেই যেন ধরা-ছোঁয়া যায়।

২৭

বিকেলের দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই মুক্তিযোদ্ধা তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আমাদের হোটেলের নিচের তলায় আলাপ হলো। দুজনেই বীরত্বের জন্যে জাতীয় সম্মান পেয়েছে।

লে ভান থং উনত্রিশ বছরের যুবক। কোয়াং চি প্রদেশের চেউ ফং জেলায় তার বাড়ি। জেলা আত্মরক্ষাবাহিনীর প্রধান। শৌর্য পুরস্কার পেয়েছে আটবার। তাছাড়া পেয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের মুক্তি মর্যাদা। লে ভান শত্রুপক্ষের তিন শো তেইশজনকে খতম করেছে—তার মধ্যে তিনশোজন জি-আই অর্থাৎ মার্কিন সৈন্য।

মুয়েন থি মই তেইশ বছরের তরুণী। কোয়াং ভা প্রদেশের জিয়েন বান জেলায় তার বাড়ি। গ্রাম গেরিলাবাহিনীর সে সহনেত্রী। তিনবার সে শৌর্য পুরস্কার পেয়েছে। পঁয়তাল্লিশজন জি-আই সহ মোট ষাটজন শত্রুসৈন্যকে সে খতম করেছে।

দুজনেই বহুবার লড়াইতে জখম হয়েছে। দুজনেরই শরীরে গুলি আর অস্ত্রোপ্রচারের ক্ষতবিক্ষত দাগ। মুয়েন-থির একটা পা যে নকল, হঠাৎ বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না।

লে-ভানের যখন ষোল-সতেরো বছর বয়স, তখন আত্মগোপনকারী কমরেডদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার ওপর পড়ে। বছর পাঁচেক ধরে সেই কাজ করার পর লে-ভান তার গ্রামে ফিরে গিয়ে বন্দুক হাতে লড়াই করার অনুমতি পায়। এ পর্যন্ত সে ছোট বড় দু শোর বেশি লড়াইতে অংশ নিয়েছে।

আমাদের কাছে সে তার একদিনের এক লড়াইয়ের গল্প বলল।

'আমাদের অঞ্চলটাতে ছিল চার চারটি ব্রিজ। একদিকে রেলপথ, অন্যদিকে সড়ক। রেলরাস্তার কাছাকাছি যে এলাকা, তার দখল নিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমাদের অনবরত লড়াই হতো। এই এলাকার শত্রুপক্ষের কমাণ্ডার ছিল ডা। লোকটা ছিল পাজীর পাঝাড়া। তার অধীনে ছিল তিন প্লেটুন সিভিক গার্ড। গ্রামের লোকজনেরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। চাল, চিনি, মাছ, দুধ, খাবারদাবার—যার কাছে যা পেত সব সে লুট করে নিত। মুন পেলে নদীর জলে ফেলে দিত। গ্রামের লোকে চাইছিল ওর শাস্তি হোক। আমার ওপর তার ভার পড়ল। পার্টিতে বসে আলোচনা করে দেখা গেল, রাত্তিরে ওকে বাগে পাওয়া অসম্ভব। কাজেই বেলাবেলি ওকে সাবাড় করতে হবে।

'এই সময় একটা সুযোগও জুটে গেল।

'এলাকার কাছাকাছি একটি বাড়ি ছিল। সে বাড়ির একজন ছেলে অন্য কোথাও শত্রুপক্ষের কমাণ্ডার ছিল। শয়তানির জন্যে সে খুন হয়। ঠিক হয়, আশেপাশের সমস্ত কমাণ্ডার তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকবে। গ্রামের দু শো লোক খবর দিয়ে তারা জড়ো করেছিল।

'জানতে পেরে ছজন সঙ্গী নিয়ে কমাণ্ডারের পোশাক পরে আমি তৈরি হয়ে গেলাম। মাঝখানে শত্রুপক্ষের দুটো ফাঁড়ি। আমার পরনে কমাণ্ডারের

পোশাক। সুতরাং শান্ত্রীরা কেউ আটকালো না। যেখানে লোক জড়ো হয়েছিল, তার চারদিকে চারটি গেট। আমার সঙ্গের ছদ্মবেশী কমরেডরা চারটি গেটে দাঁড়িয়ে গেল। কমাণ্ডার ডা-র সঙ্গে আমি যেন হ্যাণ্ডশেক করতে যাচ্ছি, এমনি ভাব করে এগিয়ে যেতেই দুপাশের লোকজন সরে গিয়ে আমাকে জায়গা করে দিল। হ্যাণ্ডশেক করে ডা তার আসনে বসামাত্র আমার হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। বাকি পাঁচজন কমাণ্ডার ছুটে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে গেটের কাছে লুটিয়ে পড়ল। জায়গাটা ছিল শত্রু-ঘাঁটির কাছাকাছি। উপস্থিত লোকজনদের আমরা বললাম কেউ যেন এখন বাইরে না যায়। তারপর তাদের কাছে আমরা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি তুলে ধরলাম। কেননা আমরা জানতাম এরপরই শত্রুপক্ষ এসে ওদের ওপর অত্যাচার করবে। তখন ওরা যেন বলে যে খুনীর দল পালিয়ে গেছে। তারপর দিনের আলোয় আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে রেললাইনের কাছে এসে একবার ডানদিক, একবার বাঁদিক এবং তারপর সামনের দিক লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলির আওয়াজ করে ছুটতে ছুটতে চলে গেলাম ছ শো মিটার দূরের মুক্তাঞ্চলে। আশপাশে ছিল শত্রুদের চারটি ঘাঁটি। তারা গুলির আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে বন্দুক চালাতে শুরু করে দিল। কিন্তু পরস্পরের সেই গুলিতে ওরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত খুন জখম হলো।

'গ্রামের লোকে খুশি হয়ে আমাদের একটা গরু আর একটা শুয়োর উপহার পাঠাল। গরুটাকে আমরা রেখে দিলাম দুধের জন্যে আর শুয়োরটাকে মেরে খাওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম অন্যান্য গেরিলাবাহিনীর কাছে।

'শেষবারের লড়াইতে যখন আমি আহত হয়ে চলে আসি, তখন আমার জায়গায় দলের দায়িত্ব নেয় আমার খুড়তুতো বোন। আমি চাষীর ঘরের ছেলে। আমার বাবা-মা আছেন মুক্তাঞ্চলের গ্রামে। আমরা দু ভাই, দু বোন। আমিই হলাম সকলের বড়।'

এরপর হুয়েন থি মই তার নিজের কাহিনী বলল:

'আমি গরিব চাষী পরিবারের মেয়ে। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছি যখন আমার চোদ্দ বছর বয়স। সতেরো বছর বয়সে গেরিলা-বাহিনীতে ঢুকি। এ পর্যন্ত আমি শতখানেক লড়াই লড়েছি।

'ডা-নাং থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে আমাদের এলাকা। হাজার-খানেক লোকের বসবাস আমাদের অঞ্চলে। পঁয়ষট্টি সালে মার্কিনরা আমাদের

অঞ্চলটাকে নিষ্কণ্টক করার প্ল্যান নেয়। এ ব্যাপারে পালের গোদা ছিল স্ট্যানলি টেলর। ও-অঞ্চলে রাস্তা বানিয়ে পাঁচ শো মিটার দূরে দূরে চারটি ঘাঁটি বসায়। আমি সে সময়ে পার্টির নির্দেশে আইনসঙ্গত কাজকর্ম করছি। মার্কিনদের আঞ্চলিক শিবিরে তখন দু শো সৈন্য সব সময় মোতায়েন। চারটি ডি-কে ৫৭ কামান বসিয়ে তাদের দুটো সাঁজোয়া গাড়ি সারাক্ষণ টহল দেয়। দিনের বেলা সেখানে হানা দেওয়া অসম্ভব।

'আমরা মেয়ের দল একদিন ঠিক করলাম দিনের বেলাতেই ওদের ওপর হামলা করব। দুটো খালি সেল যোগাড় করে তার মধ্যে আমরা বারুদ ঠেসে নিলাম। তার ওপর খড়ের আঁটি সাজিয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে গ্রামের সাধারণ চাষী মেয়েদের মতো রাস্তা দিয়ে আমরা এগোতে থাকি। ওদের ঘাঁটির কাছে যখন পৌঁচেছি তখন বেলা তিনটে। পাহারাদাররা আমাদের আটকালো না। রাস্তা দিয়ে আরও খানিকটা এগোতেই একটা মার্কিন জিপ এসে আমাদের সামনে থামল। জিগ্যেস করল, কাঁধে করে কী নিয়ে যাচ্ছ ? আমরা একটুও না ঘাবড়ে বললাম, 'খড় নিয়ে যাচ্ছি আলু গাছ ঢাকব বলে।" শুনে ওরা চলে গেল।

'কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে বসানো ছিল আমাদের একজোড়া অ্যাক্-অ্যাক্ কামান। ওটা ছিল আমাদের শত্রুর মহড়া নেবার জায়গা। ঘড়িতে যখন তিনটে পঞ্চাশ, তখন দূর থেকে দেখা গেল পেট্রোলে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে জি-আইদের একটা প্লেটুন। রাস্তার দুধারে দু-সারে তারা দাঁড়িয়ে। মাঝখানে সাঁজোয়া গাড়ি। আশি মিলিমিটারের শেল একটা কমরেড হোয়ার কাছে আর একটা আমার কাছে। বনের মধ্যে আমাদের দুজন সহকর্মী তৈরি।

'পাঁচটা নাগাদ জি-আইয়ের দল যখন জঙ্গলের কাছাকাছি জায়গাটায় এসে গেছে তখন আমি মাইনের বোতাম টিপলাম। সাঁজোয়া গাড়ির দুজন সঙ্গে সঙ্গে খতম। দ্বিতীয় মাইনটা ফাটবার আগেই সাঁজোয়া গাড়িটা এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে, আর কেউ মারা গেল না—শুধু কয়েক জন জখম হলো।

'দুটো আওয়াজের পরই ওরা যেদিকে পারে ছিটিয়ে পড়ল। আমরা ওদের 'ভি-সি', 'ভি-সি' (অর্থাৎ 'ভিয়েতকং', 'ভিয়েতকং') বলে চিৎকার করতে শুনলাম। সেই শুনে ওদের দলবল ছুটে আসছিল। সেই সময় তাদের

ওপর অ্যাক্-অ্যাক্ কামান চালিয়ে আমাদের সহকর্মীরা আমাদের পালাবার সুযোগ করে দিল। ছ-জনকে খতম আর পাঁচজনকে জখম করে ওরাও জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে গেল। পরে গ্রামের রাখালদের কাছে শুনলাম যে, জি-আইরা নাকি বলেছে—আশ্চর্য, ভিয়েতকংরা দিনের বেলায় ফাঁড়ির এত কাছে চড়াও হবে ভাবা যায়নি।

'পরদিন তারা গ্রামে এসে লোকজনদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করল। আমিও তা মধ্যে ছিলাম। ভিয়েতকংদের খবর জিগ্যেস করায় আমরা বললাম—আমরা এতদিন আছি, ভিয়েতকং কী জিনিস কখনও দেখিনি।

'ঘটনার দিন আমাদের ওরা ছুটে যেতে দেখলেও গ্রামে এসে আমাদের দেখে চিনতে পারেনি। তার কারণ আমরা পরতাম দু-রকমের পোশাক। একটা থাকত ওপরে। সাদা বা ফিকে রঙের আইনী পোশাক। তার নীচে থাকত বেআইনী পোশাক—গাঢ় সবুজ হাত কাটা জামা আর হাফ প্যাণ্ট। ঘটনার দিন এই বে-আইনী পোশাকে আমাদের ছুটতে দেখেছিল বলেই পরে আর আমাদের দেখে চিনতে পারেনি।'

গুয়েন থি মই এবার তার গলার বাঁদিকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বলল, 'এটা আমার উনসত্তরের লড়াইয়ের চিহ্ন। আমি সেবার লড়াইতে স্কাউটের কাজ করছিলাম। মাথায় তরকারির ঝুড়ি নিয়ে নদী পেরিয়ে শত্রু-পক্ষের ঘাঁটির খবর নিতে যাচ্ছিলাম। একটা বাড়িতে শত্রুরা লুকিয়ে ছিল। বুঝতে না পেরে আমি তাঁদের ফাঁদে পড়ে যাই। তারা আক্রমণ করে। গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাবার পর তরকারির ঝুড়ি থেকে দুটো গ্রেনেড বার করে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারি। ওদের একজন খুন এবং একজন জখম হয়। আমি তখন কোনো রকমে পালিয়ে মুক্তাঞ্চলে চলে আসি। তারপর সেখান থেকে আমাকে উত্তর ভিয়েতনামে নিয়ে আসে। আমার একটা পা কেটে ফেলতে হয়। এই যে দেখছেন, এটা আমার নকল পা। গত বছর আমি হাঙ্গেরিতে গিয়ে পাঁচ মাস ছিলাম। ওদেরই দেওয়া নকল পায়ে এখন আমি দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। নকল পা নিয়েই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি।'

২৮

আমাদের দেশে ফেরার প্লেন কাল সকালে। এতদিন কেবলই দিন গুনেছি। এখন ভিয়েতনামকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে। কমরেড তাই, কমরেড তে হান, কমরেড শান, কমরেড তো হোয়াই—আবার কবে এদের সঙ্গে দেখা হবে কে জানে? অনেক কিছু দেখা হলো না, অনেক কিছু জানা হলো না। যেটুকু দেখেছি, শুনেছি তাও কি আমার দেশের মানুষকে সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে বলতে পারব? অথচ বলা দরকার খুব।

আজ সকালে গিয়েছিলাম যুব-সংগঠনের দপ্তরে। যুব ফেডারেশনের সম্পাদক লে তাম আর হো চি মিন যুব-শ্রমিক সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা লে থি সু আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। দুজনেই ভারি বিনীত এবং নম্র।

ওদের কাছে যা শুনলাম, সংক্ষেপে ওদের জবানীতেই তা বলি:

'ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তনের শুরু থেকেই যুব-আন্দোলন গুরুত্ব পায়। অবশ্য যুবকদের সংগঠন তার আগেও ছিল। একদিক থেকে বলা যায় যুব আন্দোলনের ভেতর দিয়েই ভিয়েতনামে পার্টির জন্ম। একত্রিশ সালের মার্চ মাসে পার্টির সাক্ষাৎ নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট যুবলীগ। আমরা মনে করি, যুবকেরা বিপ্লবে সামনের সারির সৈনিক। যুবলীগ হলো কমিউ-নিজমের ইস্কুল।

'আটজন সদস্য নিয়ে যুবলীগের প্রথম পত্তন হয়। উত্তর ভিয়েতনামে এখন এর সদস্যসংখ্যা ছাব্বিশ লক্ষ। অর্থাৎ পনেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মোট যুবসংখ্যার শতকরা পঁয়ষট্টি জন। লীগের শাখা পাহাড়ে, সমবায়ে, কারখানায়, স্কুল, কলেজে সর্বত্র। গত বছর জানুয়ারি মাসের পর থেকে যুব-লীগের নতুন নাম হয়েছে হো চি মিন যুবশ্রমিক সংস্থা। নয় থেকে চোদ্দ বছর যাদের বয়স, তাদের সংগঠন হলো কিশোর বাহিনী। এই দুই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা হলো ষাট লক্ষ।' যুব ফেডারেশনের মধ্যে যুবলীগ ছাড়াও আছে অন্যান্য যুবকের দল। মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়বে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে—যুব ফ্রণ্টে যোগ দেবার এই একটি মাত্র শর্ত।

'আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথা আপনাদের বলি। দিয়েন বিয়েন ফুর ঘটনার পর যুবকদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে পার্টি বিশেষভাবে জোর দেয়। একদিকে উৎপাদন আর অন্যদিকে শত্রু সম্পর্কে সজাগ থাকা। চৌষট্টি সালে শুরু হয় মার্কিনদের বিমান হামলা। ওরা এই বলে শাসায় যে, বোমা মেরে ভিয়েতনামের মানুষদের ওরা প্রস্তর যুগে ফেরত পাঠাবে। বোমা পড়ার ফল হলো উল্টো। সারা দেশ সিংহবিক্রমে রুখে দাঁড়াল। ওরা ভাবতে পারেনি শহরের ছেলেরা এভাবে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়বে।

'চৌষট্টি সালে যুবলীগ 'তিনটেতেই তৈরি'র কর্মসূচী নিল। এই তিনের মধ্যে এক হলো লড়াই। নিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী, গেরিলা আর আত্মরক্ষা বাহিনী—এর মধ্যে যখন যেটাতেই ডাক পড়বে যুবকেরা যাবে। যুবকদের এক হাতে থাকবে হয় লাঙল, নয় হাতুড়ি, নয় কলম—আর অন্য হাতে থাকবে বন্দুক। দুই হলো উৎপাদন, অধ্যয়ন আর গড়ার কাজ। বোমা আর গুলিগোলার মধ্যে যুব শ্রমিকেরা উৎপাদন চালিয়ে গেছে। হাম রুং ব্রিজের ঠিক পাশেই যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, সেখানে বোমা পড়ার সময়ও সদলবলে সমানে কাজ করেছে যুবলীগের ফাম ভান লাক। সে এখন উত্তর ভিয়েতনাম জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। ভিয়েতনামি ছাত্ররা শহর থেকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রামের দিকে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে চলে গেছে। নিজেরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছে ভারী ভারী বোঝা। ফরাসি আমলে সারা ইন্দোচীনে মোট যুবকবয়সের ছাত্র সংখ্যা ছিল পাঁচ শো। চৌষট্টির পর শুধু উত্তর ভিয়েতনামে যুবক বয়সের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে হয় পঁচিশ হাজার! এ বছর সেটা হয়েছে আশি হাজার। এছাড়া আরও একটা ব্যাপারে যুবকেরা নিজেদের তৈরি রাখে। সেটা হলো সমাজতন্ত্র গড়ার ব্যাপারে।

'আমাদের যুবকদের দৈনন্দিন জীবনে যুদ্ধকালীন অনেক অভ্যাস রপ্ত হয়ে গেছে। বোমার আওয়াজকে তারা ডুবিয়ে দেয় গানের আওয়াজে। যখন যে কাজে এবং যখন যেখানে ডাক পড়বে তারা যাবে—তা সে দক্ষিণ ভিয়েতনামেই হোক কিংবা ইন্দোচীনের যেকোনো জায়গাতেই হোক।

'যুবকেরা সকলেই যে গোড়াতেই এসব ব্যাপারে সচেতন ছিল তা নয়। আন্দোলন করে তাদের জাগাতে হয়েছে। সৈন্য হওয়া যেমন শক্ত, তেমনি আক্রমণের মুখে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়াও শক্ত কাজ। গোড়ায় একটা ঝোঁক

দেখা গিয়েছিল রক্ত দিয়ে শপথ লেখার। আমরা বলেছি এভাবে রক্ত অপচয় করা ঠিক নয়। কিন্তু নিজের রক্ত দিয়ে নাম সই করার রেওয়াজ এখনও আছে। যাদের বয়স কম তারাও বলে, যুদ্ধে যাব। যখন তাদের বলা হয় আগে বড় হও তারপর যাবে, তার উত্তরে তারা বলে, বড় হতে গেলে দেরি হয়ে যাবে—ততদিন মার্কিনরা থাকবে না।

'ঙুয়েন ফুয়ক তুয়ান বলে একটি ছেলে একদিন রিক্রুটিং আপিসে এসে হাজির। তার বয়স সতেরো বছর। ফলে, তার সৈন্য হওয়ার আবেদন নাকচ হয়। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বলে, আমি স্বেচ্ছাসেবক—আমার বয়স হিসেব করো না। সারা দেশ লড়ছে, আমরাই বা কেন বাদ যাব? ফলে, তাকে নিতে হয়। তখন সে পাইওনিয়ারের গলার স্কার্ফ খুলে ফেলে মহানন্দে বন্দুক ঘাড়ে করল। বয়স আঠারো হয়ে যাওয়ায় এখন সে গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিক হয়ে লড়ছে। অনেকে আবার বয়স লুকোয়। জুতোর তলায় মোটা হিল লাগিয়ে হাইট বাড়ায়। ওজন বাড়াবার জন্যে পকেটে পাথর রাখে।

'মুশকিল হয় ছোট মেয়েদের নিয়ে। তারা চায় ছেলেদের সমান অধিকার। শারীরিক শক্তিতে খাটো হলেও মনের জোরে তারা কারো চেয়ে কম নয়। রেশনের চেয়ে ইস্পাতের দিকে তাদের বেশি ঝোঁক। যে সময়ে সৈন্যবাহিনীতে মেয়েদের নেওয়া হতো না, সেই সময় ঙুয়েন নামে একটি মেয়ে সৈন্যবাহিনীতে ছেলে সেজে ঢোকার চেষ্টা করে। যেদিন মেডিকেল পরীক্ষা সেইদিন হলো তার মুশকিল। ছেলেদের চুল ছাঁটতে সে রাজী নয়। তখন তার এক ছেলে বন্ধু, তার নামও ঙুয়েন—

তাকে সে রাজী করাল তার হয়ে মেডিকেল পরীক্ষা দিতে। ছেলেটি মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করে মেয়েটিকে কলা দেখিয়ে নিজেই আর্মিতে ঢুকে পড়ল। দুজনের একই নাম হওয়ায়, তার পক্ষে নাম ভাঁড়াতে কোনোই অসুবিধে হল না। মেয়ে ঙুয়েন তার বন্ধুর ওপর বেজায় রেগে গেল। অবশ্য পরের বছরই নিয়ম হয়ে গেল যে, মেয়েরা মেডিকেল কোরে ঢুকতে পারবে। মেয়ে ঙুয়েন তৎক্ষণাৎ নার্স হয়ে মেডিকেল কোরে ঢুকে পড়ল।

'যুবলীগের একটি সংগঠন আছে, তার নাম—মার্কিনবিরোধী জাতীয় মুক্তির যুব স্বেচ্ছাসেনা। তদের কথা হলো: 'হৃদস্পন্দন বন্ধ হলেও দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হবে না।' এদের হাজার হাজার সদস্য।

'এই যুব স্বেচ্ছাসেনাদের ৭৫৯ নং ইউনিট একটানা আঠারো মাস ধরে রাস্তা তৈরির কাজ করেছে। তাদের ওপর মার্কিন বিমানের হামলা হয় মোট ছ শো তেত্রিশ বার। স্টীল পেলেট বোমা, রকেট আর শেল ছাড়াও মোট পাঁচ শো আশিটি বোমা পড়ে। সাধারণ বোমা ছাড়াও ডিলেড অ্যাকশন বোমা পড়েছে মাথা পিছু চল্লিশটা করে। বোমা পড়ামাত্র দলের ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে এমনভাবে সেগুলো নষ্ট করত যাতে রাস্তার কোনো ক্ষতি না হয়। পরস্পরে পাল্লা দিয়ে বোমাগুলো হাত দিয়ে ধরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিত। তাতে বোমাগুলো শূন্যে ফাটত। এই কায়দায় যে মেয়েটি প্রথম বোমা ফাটায় তার নাম নুয়েন থি লিউ। ছোঁড়বার আগে সে বন্ধুদের বলেছিল, 'আমি মরলে বনফুলের একটা তোড়া দিও।' লিউ আর তার বন্ধুরা প্রত্যেকে এমনিভাবে ডজন ডজন বোমা ফাটিয়েছে। তার ওপর কবিতাও লেখা হয়েছে: 'তোমাকে কি আমি বলতে পারি ডাক্তার? কেননা তুমি যোগাযোগের শিরা উপশিরা থেকে বিনষ্ট করেছ জীবাণু।' এইসব ইউনিটের ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে পাহাড়ে রাস্তা বানিয়েছে। পাঁচ ছ বছর ধরে তারা থেকেছে এমন জায়গায় যেখানে সারাক্ষণ মেঘ থাকে বলে কাপড় জামা কিছুতেই শুকোয় না। থেকেছে এমন জায়গায় যেখানে কোনো লোকালয় নেই, যেখানে কখনও বাচ্চা ছেলের কান্না শোনা যায় না।

'সেই সঙ্গে শিক্ষার স্তর উন্নত করা বিজ্ঞান আর কারিগরি জ্ঞান অর্জন করা এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বাবধানের কাজ শেখা—এর সব কিছুকেই আমরা সংগ্রামের অঙ্গ বলে মনে করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার আর মাধ্যমিক স্তরের স্নাতকের সংখ্যা দু-লক্ষ। এখনও প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা অনেক কম। ফরাসিরা আমাদের কিছুই দিয়ে যায়নি—শিক্ষা তো নয়ই। আমরা যা করেছি সমস্তই বিপ্লবের পর।

'যে উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা গবেষণা করছে, তারাও আমাদের সংগ্রামের শরিক। উনসত্তর সালে তারা বিজ্ঞান বিভাগের নানা শাখায় প্রায় এক হাজার থিসিস পেশ করেছে। বিষয়ের কয়েকটা নমুনা দিলেই বুঝতে পারবেন, আমাদের দেশের গবেষকেরাও আমাদের সংগ্রামের সৈনিক। ব্রিজ ভেঙে গেলে কিভাবে নদী পার হওয়া যাবে—ভিয়েতনামী কায়দায় তার পন্থা বাৎলে একজন তার গবেষণাপত্র লিখেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শক প্রতিবিধান

এবং অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত গবেষণাপত্র লিখেছে বেশ কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র। অনেকে লিখেছে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির নানা উপায় নিয়ে।

'আমাদের ছাত্ররা ক্লাসে বসেও মুক্তিযুদ্ধের কথা এক মুহূর্তও ভোলে না। সকলেরই লক্ষ্য এক—যুদ্ধে জয়ী হওয়া। এবং তার চেয়েও বড় কথা। জীবনে আদর্শ কমিউনিস্ট হওয়া।'

এর এক বর্ণও যে বানানো নয়। উত্তর ভিয়েতনামে একমাস থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা হলফ করে বলতে পারি।